শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ও তিরুমালা মাহাত্ম্য

সূচিপত্র



কৃষ্ণ কৃপামূর্তি

শ্রী শ্রীমদ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

সংগঠন: আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সমিতি



বারো আলবার (ভক্ত) (পৃষ্ঠা   )



শ্রী অনন্তচার্য
(পৃষ্ঠা   )



শ্রী রামানুজাচার্য
(পৃষ্ঠা   )



শ্রী অন্নমাচার্য
(পৃষ্ঠা   )



অনন্তাচার্য এই শাবল দিয়ে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী প্রহার কিরে ছিলেন । এখন এই শাবলটি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের প্রথম গোপুরে ডান দিকের দেওয়াল এ দেখা যায়। (পৃষ্ঠা   )

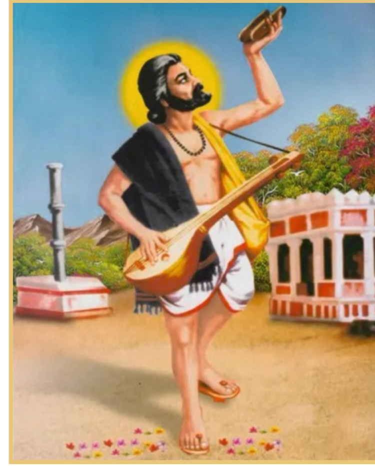




সুবর্ণ মুখারী (স্বর্ণ মুখারী) নদী (পৃষ্ঠা)



শ্রী ব্যাস তীর্থ (পৃষ্ঠা)



শ্রী কনকদাস (পৃষ্ঠা)



শ্রী গোবিন্দরাজ স্বামী (পৃষ্ঠা)



স্বামী পুষ্করিণী (পৃষ্ঠা)



ইসকন তিরুপতিতে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জী (পৃষ্ঠা)



তিরুপতিতে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী (মূল বিগ্রহ) (পৃষ্ঠা)



তিরুচানূরে স্থিত পদ্মাবতী দেবী (পৃষ্ঠা)



বরাহ স্বামী (পৃষ্ঠা)



বরাহ স্বামী মন্দির (পৃষ্ঠা)



আলিপিরির শ্রী বারি পাদালু (ভেঙ্কটের স্বামী পাদ চিহ্ন) (পৃষ্ঠা)



সীতারাম লক্ষ্মণের উৎসব বিগ্রহ (পৃষ্ঠা)



তুম্বুরু (গোনা) তীর্থ (পৃষ্ঠা)



পাপনাশন তীর্থ (পৃষ্ঠা)



বাম দিকে তিরুমলানম্বি মন্দির (বাড়ি) (পৃষ্ঠা)
ডান দিকে বেদান্ত দেশিক – শ্রী বৈষ্ণব আচার্য, তিনিই ঘণ্টার অবতার। (পৃষ্ঠা)



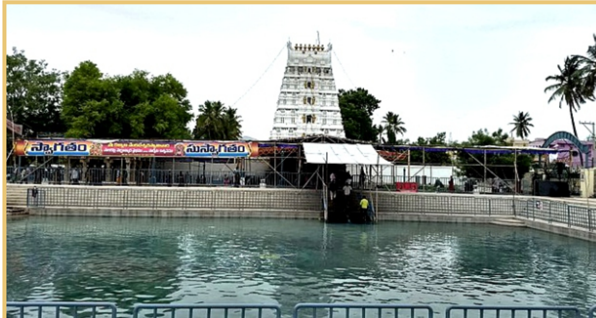
কপিল তীর্থে স্থিত কপিলেশ্বর (পৃষ্ঠা)



তিরুপতির কোদণ্ড
রাম স্বামী মন্দির ও
সীতারাম লক্ষ্মণ(পৃষ্ঠা)







শ্রীনিবাস
মঙ্গাপুরমের
কল্যাণ
ভেঙ্কটেশ্বর
স্বামী মন্দির
(পৃষ্ঠা)



শ্রীদেবী ভূদেবী সহ শ্রী মলয়প্প স্বামী (পৃষ্ঠা)



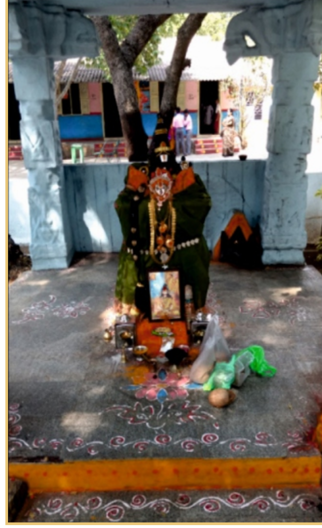
অনন্তাচার্যের বৃন্দাবন (সমাধি) (পৃষ্ঠা)



উপরে বাম পাশে
হাতিরাম বাবাজির
বৃন্দাবন (সমাধি)
(পৃষ্ঠা)



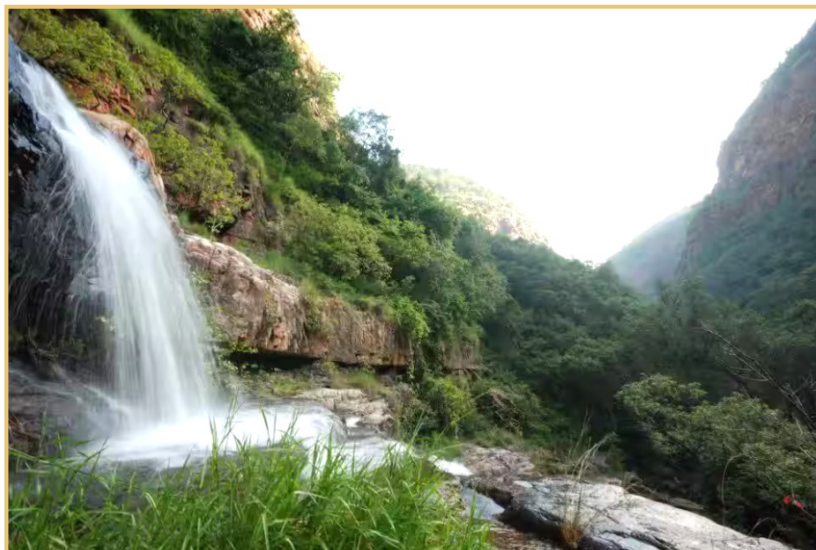
রামকৃষ্ণ তীর্থ (পৃষ্ঠা)



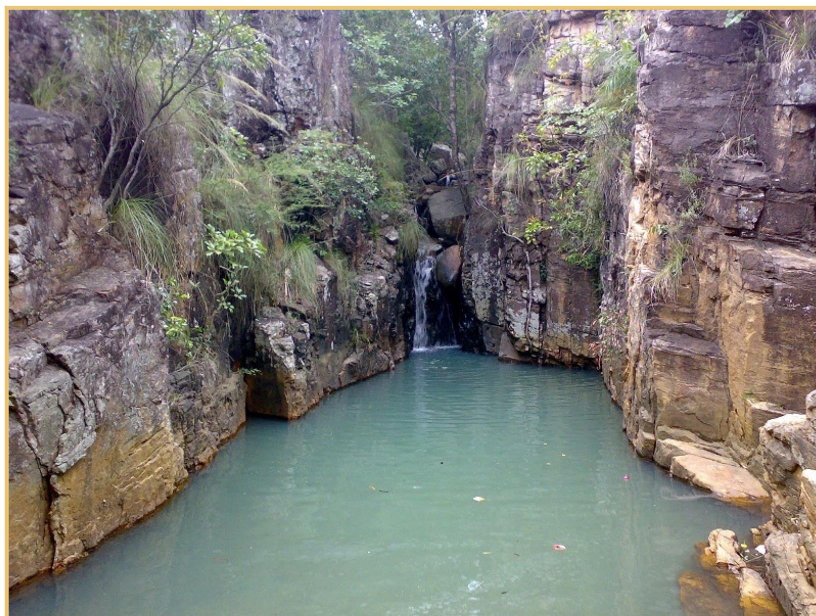
ভেঙ্কমাম্বা বৃন্দাবন (সমাধি)
(পৃষ্ঠা)



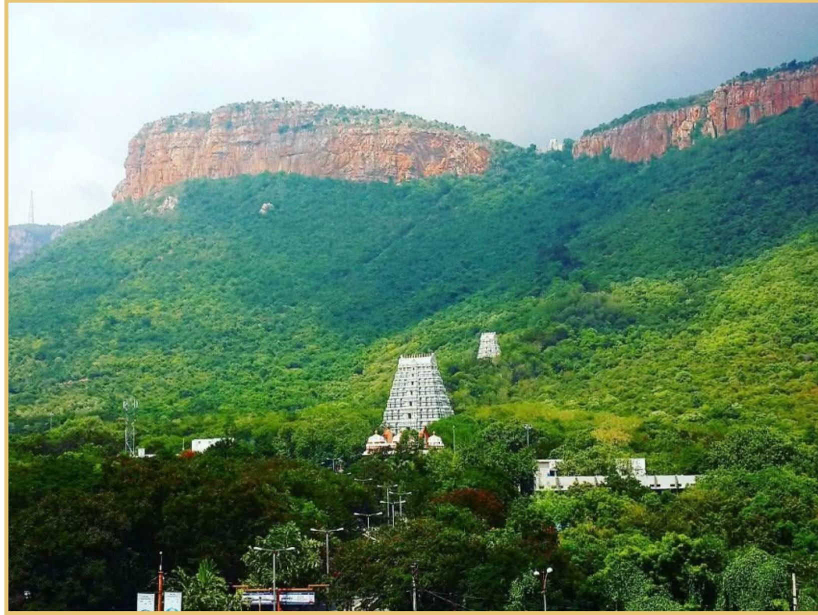
আকাশগঙ্গা তীর্থ
(পৃষ্ঠা)



রামকৃষ্ণ তীর্থ (পৃষ্ঠা)



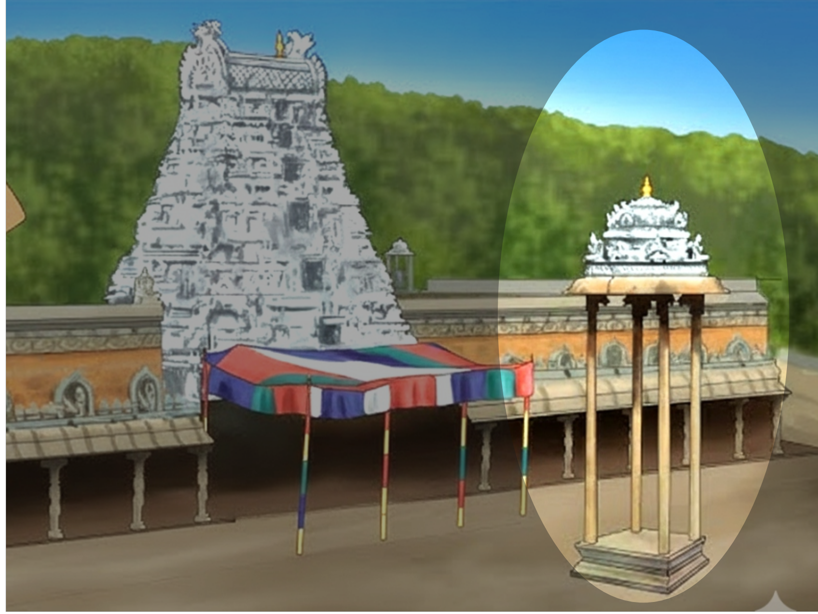
চক্র তীর্থ (পৃষ্ঠা)



ভেঙ্কটাচল পর্বত (পৃষ্ঠা)



এটি ভেঙ্কটাচল পর্বতের এক অপূর্ব দৃশ্য। একে "শিলা তোরণ" বলা হয়।
এটি চক্র তীর্থের নিকটে অবস্থিত।



গোল্ল মণ্ডপ (পৃষ্ঠা)



জাবালি তীর্থ (পৃষ্ঠা)



"শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী দিব্য চরিত" এই গ্রন্থটি বাংলা সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাতি, তামিল ও ওড়িয়া ভাষায় পাওয়া যায়

শ্রী শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী দিব্য চরিত্র
(তিরুপতি বালাজি)

শ্রীনিবাস সেবানন্দ দাস

কৃষ্ণকৃপামূর্তি শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ মহাশয়ের গ্রন্থাবলী

ভাগবদ্গীতা যথাযথ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১-১২ স্কন্ধ (১৮ খণ্ড) দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণভগবান শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (৯ খণ্ড) ভক্তি রাসামৃত সিন্ধু আত্মসাক্ষাৎকার শাস্ত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বোধামৃত ভ্রম এবং সন্দেহের অতীত কপিল ভগবানের উপদেশ কুন্তী মহারানীর উপদেশ কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বিতীয় গীতা সার উত্তম প্রশ্ন উত্তম সমাধান	প্রহ্লাদ মহারাজের দিভ্য উপদেশ যোগ পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দনিধি রাজবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছানোর পথ শ্রী ব্রহ্মসংহিতা জীবন থেকে জীবন জ্ঞান অনুসন্ধান উপদেশামৃত জ্ঞানখড়্গ ভক্তিযোগ ভাগবদ দর্শন (মাসপত্রিকা)

অধিক তথ্য ও সূচীপত্রের জন্য লিখুন:
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, হরে কৃষ্ণ ধাম, জুহু, মুম্বই ৪০০০৪৯।
এই গ্রন্থগুলি হরে কৃষ্ণ কেন্দ্রগুলোতেও পাওয়া যায়।
অনুগ্রহ করে আপনার নিকটস্থ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রকাশক
চৈতন্য পাবলিশিং হাউস,
৪-৪-২৬৬, প্রথম তলা,
দোকান নং ৩, শ্রীকৃষ্ণ শপিং মল,
সুলতান বাজার লেন, কোটি, হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা-৫০০০৯৫
ফোন: +৯১-৬৩০০ ২৯২৮৫৭ | Info@cabh.in
Merupub@gmail.com | www.cabh.in

বিতরণকারী
পদ্মাবতী বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স
৪-৪-২৬৬, প্রথম তলা, দোকান নং ৫,
শ্রীকৃষ্ণ সেন্টার শপিং মল,
সুলতান বাজার লেন, কোটি,
হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা-৫০০০৯৫
ফোন: +৯১-৯৮৪৮০ ২৫৩০৬ | bvs.padmavati@gmail.com

শ্রীনিবাস সেবানন্দ দাস
ফোন নম্বর: + (৯১) ৯৫৪২২০৯৫৯৩

সমর্পণ (অর্ঘ্য)

অংশাংশস্তু মারীচ্যাধিরংশা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
কলাঃ কপিলকূর্মাদ্যাভেশাভার্গবাদয়ঃ॥
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপাধিপো হরিঃ।
বৈকুন্ঠোऽপি তথা যজ্ঞো নরনারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান স্বয়ং।
অসমখ্যাক ব্রহ্মাণ্ড পতির্গোগোলকে ধাম্নি রাজতে॥

মারীচি আদি মুনিগণ অংশাংশ অবতার। ব্রহ্মা আদিগণ অংশ অবতার। কপিল ও কূর্ম প্রভৃতি লীলা-অংশ তথা কলা-অবতার। পরশুরাম হলেন আবেশ অবতার। নৃসিংহ, রামচন্দ্র, শ্বেতদ্বীপাধিপতি (নারায়ণ), বৈকুন্ঠপতি (বিষ্ণু), যজ্ঞ, নরনারায়ণ প্রভৃতি পূর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং আদি ভগবান। অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) গোলোক ধামে অধিষ্ঠিত। (গর্গ সংহিতা – গোলোককাণ্ড, (প্রথম অধ্যায় শ্লোক ১৬-১৮)

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞানের বিশ্বব্যাপী প্রচারক আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর প্রতিষ্ঠাপক আচার্য কৃষ্ণকৃপামূর্তি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণে এবং আমার সম্মানীয় গুরুদেব পরমপূজ্য শ্রী ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজ-এর শ্রীচরণে এই গ্রন্থটি অর্ঘ্য স্বরূপে নিবেদন করছি।

পরমপূজ্য শ্রী ভক্তি বিকাশ স্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাবলী

- প্রারম্ভিকদের জন্য কৃষ্ণচৈতন্য মার্গদর্শিনী
- ভারতীয় যুবকদের জন্য এক বার্তা
- কৃষ্ণচৈতন্যে ব্রহ্মচর্য
- বাল্মীকি রামায়ণ
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
- ভারতীয় প্রাচীন জীবনধারা
- জয় শ্রীল প্রভুপাদ!
- লেখামালা
- মাতৃগণ ও গুরুজনগণ
- শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতিচারণ
- পবিত্র ভারতে তীর্থযাত্রা
- শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় দৃঢ়ভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা
- পত্রোপদেশ (দুই খণ্ড)
- শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত বৈভব (তিন খণ্ড)
- শ্রী বাঁশীদাস বাবাজী
- রসিকানন্দের কাহিনী
- গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্যাবলী (বাংলা)
- বৈষ্ণব শিখা ও সাধনা (বাংলা)

সূচিপত্র

৭. তিরুপতিতে দর্শনীয় স্থান।

গোবিন্দরাজ স্বামী মন্দির
কোদন্ডরাম স্বামী মন্দির
কপিল তীর্থ
ইসকন রাধাগোবিন্দ মন্দির
আলিপিরিতে শ্রীবারী পাদালু
(ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পদচিহ্ন)
পদ্মাবতী দেবীর মন্দির -পদ্মা সরোবর
শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম
সুবর্ণ মুখারী (স্বর্ণ মুখি) নদী এবং অগস্ত্যয়েশ্বর মন্দির

৮. আলবারদের রচিত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর স্তুতি

শ্রী পোইগেয়ি আলওয়ার।
শ্রী পুদত্ত আলওয়ার।
শ্রী পেই আলওয়ার
শ্রী তিরুমালিশাই আলওয়ার
শ্রী নম্ম আলওয়ার
শ্রী কুলশেখর আলওয়ার
শ্রী পেরিয়া আলওয়ার
শ্রী তিরুপ্পন আলওয়ার
শ্রী তিরুমংগাই আলওয়ার
শ্রী গোদা দেবী (আন্দাল)।

৯. তিরুমালায় শুদ্ধ ভক্তদের লীলা

শ্রী যমুনাচার্য
শ্রী তিরুমালা নাম্বি
শ্রী কাঞ্চীপূর্ণা (তিরুক্কাচ্চি নাম্বি)
শ্রী রামানুজাচার্য
শ্রী অনন্তাচার্য।
শ্রী বেদান্ত দেশিকান
শ্রীপতিবাদী ভয়ংকর আনান

শ্রী অন্নমাচার্য
শ্রীপদরাজ তীর্থ (শ্রীপদরায়লু)
শ্রী ব্যাস তীর্থ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু
শ্রী বল্লভাচার্য
শ্রী বদিরাজ তীর্থ
শ্রী পুরন্দর দাস
শ্রী হাতিরাম বাবাজী
শ্রী কনক দাস
শ্রী রাঘবেন্দ্র স্বামী
শ্রীকৃষ্ণ দেব রায়
ভক্ত শিরোমণি তারিগোণ্ডা ভেঙ্কমাম্বা
শ্রী ত্যাগরাজু।
এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ।

কৃতজ্ঞতা

লেখকের ভূমিকা

তিরুপতিতে প্রসিদ্ধ স্থানগুলির নির্দেশিকা চিত্র

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির (তিরুমলা) থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি চিত্র

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির অভ্যন্তরের দর্শনীয় স্থানগুলি চিত্র

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে দর্শনীয় স্থানের তালিকা

সমর্পণ (অর্ঘ্য)

অংশাংশস্তু মারীচ্যাধিরংশা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
কলাঃ কপিলকূর্মাদ্যাভেশাভার্গবাদয়ঃ॥
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপাধিপো হরিঃ।
বৈকুন্ঠোऽপি তথা যজ্ঞো নরনারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান স্বয়ং।
অসমখ্যাক ব্রহ্মাণ্ড পতির্গোগোলকে ধাম্নি রাজতে॥

মারীচি আদি মুনিগণ অংশাংশ অবতার। ব্রহ্মা আদিগণ অংশ অবতার। কপিল ও কূর্ম প্রভৃতি লীলা-অংশ তথা কলা-অবতার। পরশুরাম হলেন আবেশ অবতার। নৃসিংহ, রামচন্দ্র, শ্বেতদ্বীপাধিপতি (নারায়ণ), বৈকুন্ঠপতি (বিষ্ণু), যজ্ঞ, নরনারায়ণ প্রভৃতি পূর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং আদি ভগবান। অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) গোলোক ধামে অধিষ্ঠিত। (গর্গ সংহিতা – গোলোককাণ্ড, (প্রথম অধ্যায় শ্লোক ১৬-১৮)

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞানের বিশ্বব্যাপী প্রচারক আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর প্রতিষ্ঠাপক আচার্য কৃষ্ণকৃপামূর্তি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণে এবং আমার সম্মানীয় গুরুদেব পরমপূজ্য শ্রী ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজ-এর শ্রীচরণে এই গ্রন্থটি অর্ঘ্য স্বরূপে নিবেদন করছি।

মুখপাত্র

এই গ্রন্থটি আরম্ভ করার পূর্বে, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব পরম পূজ্য শ্রী ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজ, ভগবদ্ভক্তগণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণের প্রতি আমি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি।

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক জন চিঠি বিতরণকারী (পোস্টম্যান) পরিপূর্ণ ব্যক্তি নাও হতে পারেন,
তবে তিনি যে চিঠি প্রদান করেন, তা আমাদের উপকারে আসতে পারে। ঠিক তেমনি, আমি নিজে পরিপূর্ণ না হলেও, আমি যে বার্তা দিচ্ছি তা পবিত্র, গুরু-পরম্পরার দ্বারা প্রাপ্ত, শাস্ত্রসম্মত এবং পরিপূর্ণ। এই কারণে, আমি আশা করি আপনারা এই বার্তাকে গ্রহণ করে মহত্তর কল্যাণ লাভ করবেন।

এই গ্রন্থটি রচনার জন্য ভবিষ্যোত্তর, স্কন্দ, ভাগবত, বরাহ পুরাণ এবং শ্রীবৈষ্ণব সাহিত্য ও তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুসমূহ আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে সাজিয়েছি। পাঠকদের পঠন সহজতর হওয়ার জন্য আমরা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে উপস্থাপন করেছি। ‘এই প্রচেষ্টায় যদি কোনো ভুল থেকে থাকে, তবে সেগুলোকে আমাদের অজান্তে ঘটিত ত্রুটি হিসেবে গণ্য করে দয়া করে আমাদের প্রতি সদয় হোন এবং ভবিষ্যতের মুদ্রণে তা সংশোধন করার সুযোগ দিন এই অনুরোধ করছি।

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দিব্য চরিত্র নামক এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার সাথে তেলুগু, হিন্দি, ইংরেজি, কন্নড়, তামিল, মারাঠি এবং গুজরাটি ভাষায়ও উপলব্ধ।

ভূমিকা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েত।।

সবার প্রথমে আমি ভগবান নারায়ণ, নর-নারায়ণ ঋষি, বিদ্যা দেবী সরস্বতী, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণাম জানাচ্ছি। (মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১ শ্লোক ১)

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দির অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার তিরুমল পাহাড়ে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব মন্দির। এই মন্দিরটি ভেঙ্কটাচলমের সাতটি পাহাড়ের মধ্যে একটি পাহাড়ের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫৩ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের মন্দির নির্মাণ শৈলীতে (আগম শাস্ত্র অনুসারে) নির্মিত হয়েছে।

শুকদেব গোস্বামী পরিক্ষিত মহারাজকে বলেন, "ইলা বৃতবর্ষের মতো ভারতবর্ষে অনেক পর্বত এবং নদী রয়েছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থম, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সাহ্য, দেবগিরি,ঋষ্যমূক,শ্রীশৈল, ভেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমন্ত, ঋক্ষগিরি, পারিয়াত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল,কামগিরি এর মতো আরও পর্বত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হাজার হাজার পর্বত এবং অনেক নদী রয়েছে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫.১৯.১৬)

পূর্বোক্ত পুণ্য পর্বতগুলির মধ্যে ভেঙ্কট পর্বতের ওপর নারায়ণ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিরুমলে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর আবির্ভূত হওয়ার কারণে তিরুমল ক্ষেত্রকে কলিযুগ বৈকুণ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়। তিরুমলে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং আবির্ভূত হন। সেই নারায়ণকে ভেঙ্কটেশ্বর, শ্রীনিবাস, সপ্তগিরীশ, সাত পাহাড়ের

অধিপতি, বালাজি, তিরুমলাপ্পা, তিরুমলেশ প্রভৃতি অনেক নামেও ডাকা হয়।

কলিযুগের শুরুতে, অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর আগে তিরুমলে আবির্ভূত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী এবং এক হাজার বছর আগে রামানুজাচার্য কর্তৃক তিরুপতিতে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দরাজ স্বামীকে দেখে চোল রাজা, বিজয়নগর রাজা, গদওয়াল রাজা, মাইসুর রাজা, পল্লব রাজাদের মতো অনেক রাজা এবং রানি এই দুটি মূর্তিকে দেখে, উপাসনা করে গোপুর এবং মন্দির নির্মাণ-পুনর্নির্মাণের কাজ করেছেন। তারা জমি দান করেছেন এবং সোনার গয়না উৎসর্গ করে অনেক পুণ্য অর্জন করেছেন।

ব্রহ্মা, কুমার, রুদ্র এবং শ্রী সমপ্রদায়ের অনেক আচার্য এবং ভক্ত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে, সেবা করে তাদের জীবনকে সার্থক করেছেন।

তিরুমল-তিরুপতির সমস্ত মন্দির সকাল ৫টা থেকে রাত ৮:৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে।

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী এবং তিরুমল-তিরুপতিতে বিভিন্ন পবিত্র স্থানের বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এজন্য এই বইতে প্রকাশিত তথ্য অন্য ভক্তদের প্রকাশিত বইয়ের বিবরণ থেকে আলাদা হতে পারে।

১. শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী চরিত্র – ১

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ থেকে

(ভবিষ্যোত্তর পুরাণের শ্রী বেঙ্কটাচল মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভিত্তি করে এই কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।)

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ সূত গোস্বামীকে বলিলেন, "হে সূত গোস্বামী! আমরা ইতিপূর্বে আপনার নিকট বরদরাজ স্বামী ও জগন্নাথ স্বামীর কথা শুনিয়াছি। এখন শ্রীবেঙ্কটাচল মাহাত্ম্য আমাদের বলুন।" এইরূপ প্রার্থনায় সূত গোস্বামী নিম্নরূপ বলিলেন:

পূর্বে গঙ্গার তীরে মুনিগণ একটি যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ মুনি সেখানে গিয়া সকল মুনিদের বলিলেন, "এই যজ্ঞের ফল ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করুন।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অতঃপর মুনিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনমূর্তির মধ্যে প্রকৃত ভগবান কে, তাহা জানিবার জন্য ভৃগু মহর্ষিকে প্রেরণ করিলেন। ভৃগু মহর্ষি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি কোন আশীর্বাদ প্রদান করিলেন না। এই কারণে ভৃগু কৈলাসে চলে গেলেন।

কৈলাসে শিব পার্বতীর সঙ্গে একান্তে অবস্থান করেছিলেন। পার্বতী দেবী ভৃগু মহর্ষির আগমন লক্ষ্য করিয়া লজ্জায় শিবের নিকট হতে সরে গেলেন। তখন শিব ভৃগুকে বলিলেন, "স্বামী ও স্ত্রীর একান্ত অবস্থানে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করিতেছো কেন?" এই কথা বলিয়া তিনি ক্রোধে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভৃগু মহর্ষি, বলেছিলেন "আমি যে কারণে এসেছি, তাহা তুমি না জানিয়া আমাকে ধ্বংস করিতেএসেছো। অতএব আজ হইতে পৃথিবীতে তোমার লিঙ্গরূপেই পূজা হইবে।" এইরূপ শাপ দিয়া ভৃগু কৈলাস হইতে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন।

ঐ সময় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আদিশেষের উপর শয়ান অবস্থায় ছিলেন। বিষ্ণুকে পরীক্ষা করিবার এইটাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া ভৃগু মহর্ষি বিষ্ণুর বক্ষে এক পদাঘাত করিলেন। বিষ্ণু উঠে বলিলেন, "হে মহর্ষি! আপনার আগমন আমি লক্ষ্য করিতে না পারায় দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।" এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এরপর তিনি মহর্ষিকে সিংহাসনের উপর বসাইলেন এবং বলিলেন, "আমার বক্ষ বজ্রের তুলনায় আটগুণ কঠিন। এজন্য আপনার পদে ব্যথা হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি গরম জলে ভৃগুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া, সেই জলে ভক্তিভরে নিজের শিরে ছিটাইলেন। তৎপর তিনি গঙ্গার তীরে ফিরিয়া গিয়া মুনিদের সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেভাবে তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বিবরণ দিলেন। মুনিগণ সকলেই নিশ্চিত করিলেন যে বিষ্ণুই প্রকৃত ভগবান এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞফল উৎসর্গ করিলেন।

(ভৃগু মহর্ষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে পরীক্ষা করিবার ঘটনা পদ্মপুরাণে এবং ভাগবতে বিদ্যমান। পদ্মপুরাণে ভৃগু মহর্ষি ত্রিমূর্তিদের পরীক্ষা করার পর মুনিগণ সকলেই "বিষ্ণুই পরমাত্মা" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যজ্ঞফল বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিলেন। ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন: "কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে এই সৃষ্টি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, কিছুজন মনে করেন শিব সৃষ্টি করেছেন, আবার কিছুলোক বলেন বিষ্ণুই সৃষ্টি করেছেন। সরস্বতী নদীর তীরে অধিষ্ঠিত মুনিগণ সমগ্র মানবজাতির এই সন্দেহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে পরীক্ষা করার জন্য ভৃগু মহর্ষিকে পাঠান। ভৃগু মহর্ষি তাঁদের পরীক্ষা করার পর নিশ্চিত করেন যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মধ্যে বিষ্ণুই পরমাত্মা।")

নারায়ণ বেঙ্কটাচলমে আগমন

ভৃগু মহর্ষি চলে যাওয়ার পর, নারায়ণের (বিষ্ণুর) সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী বললেন, "আমি যে বক্ষস্থানে বাস করি, সেই স্থানে ভৃগু তাঁর পা দিয়ে লাথি মারলেন. আপনি তাঁকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সেবা করলেন.

আমি আর এই বৈকুণ্ঠে বাস করতে পারব না।" এইভাবে বলেই, তিনি দুঃখে করবীরপুরে (কোলহাপুরে) তপস্যা শুরু করলেন। লক্ষ্মীদেবী ছাড়া বৈকুণ্ঠে বাস করতে ইচ্ছুক না হয়ে, নারায়ণ বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে মানবরূপে বেঙ্কটাচলমে এলেন। সেখানে স্বামীপুষ্করিণীর কাছে একটি চিন্তাগাছের নিচে যে গুহা ছিল, সেখানে নারায়ণ বাস করতে লাগলেন। এইভাবে সেই গুহায় নারায়ণ দশ হাজার বছর অতিবাহিত করলেন। দ্বাপর যুগ কেটে কলি যুগের ২৮তম বর্ষ এসে পৌঁছল।

ব্রহ্মা শিবকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মীদেবীর কাছে এসে বললেন, "নারায়ণ আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে বেঙ্কটাচলমে একটি গুহায় বাস করছেন। আমি আর শিব গরু ও বাছুরে রূপ নেব। আপনি একজন সাধারণ নারীর বেশে আমাদের চন্দ্রগিরি শাসনকারী চোল রাজাকে বিক্রি করুন। আমি প্রতিদিন নারায়ণকে দুধ দেব।" এই প্রস্তাবে লক্ষ্মীদেবী সম্মতি দিলেন।

শিব ও ব্রহ্মা গরু ও বাছুরে রূপান্তরিত হলে, লক্ষ্মীদেবী তাঁদের নিয়ে চোল রাজার কাছে গেলেন। তিনি রাজাকে বললেন, "হে রাজা! এই উৎকৃষ্ট জাতের গরুর দুধ শুধু সুস্বাদু নয়, বরং স্বাস্থ্যকরও।" এইভাবে তিনি তাঁদের বিক্রি করে দিলেন। রাজা সেই গরুর কথা তাঁর স্ত্রীকে জানালেন এবং গরুর দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁকে দিলেন। রাণী গরুগুলিকে চরাতে যাঁরা নিয়ে যান, সেই গোপালককে ডেকে বললেন, "এই গরুর দুধ আলাদা করে নিয়ে এসো।" গোপালক অন্যান্য গরুর সঙ্গে ওই গরুটিকেও পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে চরাচ্ছিলেন। কিন্তু দুধ দোহনের সময় গরুর কাছে এক ফোঁটা দুধও পাওয়া গেল না। রাণী গোপালককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি দুধ আনোনি কেন?" গোপালক উত্তর দিল, "গরুর কাছে দুধ নেই।" রাণী বললেন, "বাছুর ও স্তনের দুধসহ গরুর কাছে দুধ নেই কেন? নিশ্চয়ই তুমি নিজেই দুধ খেয়ে ফেলেছো। আগামীকাল থেকে যদি তুমি দুধ না নিয়ে আসো, তাহলে তোমাকে শাস্তি দেব।" এইভাবে রাণী তাঁকে ধমকালেন।

গোয়ালা যখন গরু চারণের জন্য গিয়ে গরুটিকে যত্ন করে দেখছিল, তখন গরুটি শ্রীনিবাস (নারায়ণ) সেখানে গিয়ে সাপের ঘর কাছে দুধ দিতে শুরু করল। গোয়ালা রাগে হাতের কুরাল দিয়ে গরুকে মেরার জন্য এগিয়ে গেল। গরুটি দুধ দিচ্ছে এমনটা বুঝে শ্রীনিবাস গোয়ালাটিকে আটকাল। গরুকে মারার জন্য যা আঘাত লাগার কথা ছিল তা শ্রীনিবাসুর মাথায় লাগল এবং রক্ত ঝরতে শুরু করল। গোয়ালাটি শ্রীনিবাসকে দেখে ভয়ে মারা গেল।

পরে গরুটি রাজা'র কাছে গিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল। তখন রাজা গরুটির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, “গোয়ালাটির মৃত্যু এবং সাপের ঘরের উপর রক্ত পড়ার কারণ কী? কে এই কঠিন অপরাধটি করল?” তখন শ্রীনিবাসু নারায়ণ রূপে সাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘটনাটি বলল। রাজা তার সেবকের ভুল ক্ষমা চাইল। শ্রীনিবাসু রাজাকে বলল, “সেবকের ভুলই মালিকের ভুল হয়ে থাকে।এই অপরাধের কারণে তুমি রাখখোস হয়ে যাও।

রাজা শ্রীনিবাসর কাছে বলল, “স্বামী! আমি না করা পাপের জন্য আমাকে শাপ দিয়েছে, দয়া করে শাপ মোচন করো এবং রক্ষা করো।” শ্রীনিবাস রাজাকে বলল, “হে রাজা! কিছুদিন পরে এই অঞ্চলে আকাশরাজ জন্ম নেবে, তিনি তার কন্যা পদ্মাবতী আমাকে দেবেন বিয়ের জন্য। বিয়ের সময় আমাকে উপহার হিসেবে যে সোনার মুকুট দিবে, আমি প্রতি শুক্রের সন্ধ্যায় সেটা পরিধান করব এবং আনন্দ করব। তখনই তোমার শাপ থেকে মুক্তি হবে।” বলেই রাজাকে সালাম জানিয়ে চলে গেল। শ্রীনিবাসু তার ক্ষত নিরাময়ের জন্য বৃহস্পতিকে স্মরণ করল। বৃহস্পতি এসে বলল, “এই ক্ষতের জন্য ডুমুর গাছের রস ও পর্ণমোচী গাছের তুলো মিশিয়ে ওষুধ বানিয়ে ক্ষত স্থানে লাগাও।”

শ্রীনিবাস বরাহ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

শ্রীনিবাস যখন নিজের ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ওষুধ খুঁজছিলেন, তখন তিনি বরাহ স্বামীকে দর্শন করলেন। বরাহ স্বামী শ্রীনিবাসকে নাৰায়ণ হিসেবে চিনে তিনি এখানে আসার কারণ জানতে চাইলেন।

শ্রীনিবাস ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন যে, তিনি এই পাহাড়ে কলিকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকতে চান এবং তাই বরাহ স্বামীর অনুমতি চাইছেন। বরাহ স্বামী বললেন, “যদি যথাযথ মূল্য (ধন) দাও তবে স্থান দিব।” শ্রীনিবাস উত্তর দিলেন, “আমার কাছে এই মুহূর্তে লক্ষ্মী দেবী (ধন) নেই। তাই কলিকালে আমার দর্শনে আসা ভক্তরা তোমাকে প্রথমে দর্শন করবেন, তোমাকে পূজা, অভিষেক ও নিবেদন দেবেন। এটিই তোমার জন্য আমি দিচ্ছি।” বরাহ স্বামী এ কথা মেনে নিয়ে শ্রীনিবাসকে থাকার জন্য একশো গজ জমি দিলেন। এরপর বরাহ স্বামী তাঁর জন্য রান্না করা বকুলমাতার কাছে শ্রীনিবাসর জন্য প্রতিদিন খাবারের ব্যবস্থা করার কথা বললেন।

সূত গোস্বামী মুনিরা বলেন, “নারায়ণ কলিকালের পাপগ্রস্তদের উদ্ধার করার জন্য সাধারণ একজন মানুষের মতো অভিনয় করেছেন। শ্রীনিবাস ও বরাহ স্বামী একই দেবতা হলেও, ভক্তিহীনদের মুগ্ধ করার জন্য এবং তাঁদের লীলা শুনানোর ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এভাবে করেছেন।”

বকুলমাতা পূর্বজন্ম

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসদের বিনাশ করে, গোপবালকদের সঙ্গে সাধারণ শিশুর মতো খেলায় মেতে উঠেছিলেন এবং যশোদামাতাকে আনন্দ দিয়েছিলেন। পরে কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা গিয়েছিলেন। মথুরা থেকে দ্বারকায় গিয়ে অনেক রাণীদের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। একবার যশোদামাতা কৃষ্ণকে বললেন, “ও কৃষ্ণ! তোমার শৈশবের লীলাগুলো দেখেছি অনেক আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু তোমার বিয়ের কোন দৃশ্যই দেখার সুযোগ পাইনি,” এ কথা শুনে তিনি দুঃখিত হলেন। তখন কৃষ্ণ যশোদামাতাকে বললেন, “মা! তুমি এই শরীর ত্যাগ করার পর বকুলমাতা নামে জন্ম নেবে এবং বেনকটাচল পাহাড়ের বরাহ স্বামীকে সেবা করবে। আমি বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রীনিবাসু রূপে আসব এবং তখন তুমি আমাকে বিয়ে করবে।” সেই যশোদামাতাই বকুলমাতা হয়ে জন্ম নিয়ে বরাহ স্বামীকে সেবা করে যাচ্ছেন।

শ্রীনিবাস পদ্মাবতী দেবীকে সাক্ষাৎ করা

এভাবে শ্রীনিবাসু ভেঙ্কটাচলে বকুলমাতার সেবায় লিপ্ত থেকে আনন্দের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। একদিন শ্রীনিবাসু শিকার করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর মনেই ঠিক হতেই বায়ুদেব ঘোড়ার আকার ধারণ করে স্বামীর কাছে এলেন। শ্রীনিবাসু পোষাক ও অলংকার পরিধান করে ধনুর্বাণ ধারণ করে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরোলেন। সেই শিকার যাত্রায় তিনি অনেক বন্যপ্রাণী যেমন সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, হাতি, শরভঙ্গ এবং অন্যান্য বনজ প্রাণীকে বিনাশ করলেন। এক সময় এক হাতি তাঁর কাছে ষষ্ঠাংগ নমস্কার করে নিজেকে রক্ষা করার প্রার্থনা করল, তখন শ্রীনিবাসু সেই হাতিটিকে মুক্তি দিলেন।

সেই বনভূমির ফুলের বাগানে শ্রীনিবাসু তাঁর সখীদের সঙ্গে ফুল তুলছে এমন পদ্মাবতী দেবীকে দেখতে পেলেন। শ্রীনিবাসু তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় দিলেন। দেবীর সখীরা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?" শ্রীনিবাসু বললেন, "আমাকে কৃষ্ণ বলে ডাকা হয়। আমার বড় ভাই বলরাম, বোন সুভদ্রা, পিতা বসুদেব এবং মাতা দেবকী। আমার কালো চেহারা এবং কৃষ্ণপক্ষের জন্মের কারণে কৃষ্ণ নামকরণ করা হয়েছে।" পরে তিনি পদ্মাবতী দেবীকে তাঁর নাম এবং গোত্র জিজ্ঞাসা করলেন। পদ্মাবতী দেবী বললেন, "আমার নাম পদ্মাবতী, পিতা আকাশরাজ। আমরা চন্দ্রবংশ এবং অত্রিমুনি গোত্রের। ও রাজপুত্র, এখন থেকে তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারো।" শ্রীনিবাস বললেন, "ও রাজকুমারী! এত রাগ কেন? পথচারীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে আহার দান করা স্বর্গযাত্রার কারণ। তুমি না খাওয়া হলেও ভদ্রভাবে কথা বলার ফলে পুণ্য লাভ হয়। এখন আমি তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত। আমার ইচ্ছা পূরণ করো এবং স্বর্গে যাও।" পদ্মাবতী দেবী বললেন, "অসৎ পথিক! তুমি কি প্রাণের মালিক? আমার পিতার আগমনের আগে এখান থেকে চলে যাও এবং প্রাণ রক্ষা করো।"

শ্রীনিবাসু বললেন, "ও রাজকুমারী! রাজা আমাকে অন্যায়ভাবে কেন বিনাশ করবে? তুমি অবিবাহিত কন্যা। তোমার জন্য আমি যথার্থ বর। আমি তোমাকে প্রণয় করার মধ্যে কোনও অন্যায় করিনি।" এই কথা শুনে পদ্মাবতী দেবী রেগে বললেন, "মূর্খ! আকাশরাজ তোমাকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন।" শ্রীনিবাসু পদ্মাবতী দেবীর উদ্দেশ্যে বললেন, "জন্মগ্রহণকারী সকলের মৃত্যু অনিবার্য, পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণে সেগুলো শুভ বা অশুভ হয়। আমার কোনও ভুল না থাকা সত্ত্বেও আকাশরাজ কেন আমাকে বিনাশ করবেন?" তখন পদ্মাবতী দেবী আবারও বললেন, "ও কিরাতরাজ! কেন তুমি তোমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে কাকের মত করেই মারা যাবে?"

শ্রীনিবাসু পদ্মাবতীর কথা অবজ্ঞা করে ঘোড়াসহ পদ্মাবতীর কাছে ফিরে এলেন। হঠাৎ এই ঘটনায় পদ্মাবতী দেবী ভয় পেয়ে শ্রীনিবাসুর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে তার সখিরাও একইভাবে পাথর নিক্ষেপ করল। ঐ আঘাতে ঘোড়া মারা যায় এবং শ্রীনিবাসুও গুরুতর আহত হন। লোকেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করুক বলেই শ্রীনিবাসু সেখান থেকে ভেঙ্কটাচল চলে এসে বিশ্রাম নিলেন। সূত গোস্বামী ও মুনীরা প্রশ্ন করল, "ওই পদ্মাবতী দেবী কে? তাঁর জন্ম ও জীবনী সম্পর্কে বলুন।" তখন সূত গোস্বামী পদ্মাবতী দেবীর সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন:

পদ্মাবতী দেবী জন্ম

কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধের এক হাজার বছর পরে, সুধর্ম নামে এক রাজা সমগ্র ভূমিকে শাসন করছিলেন। সুধর্মের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—আকাশরাজ এবং তুন্ডমান, উভয়েই নারায়ণের ভক্ত ছিলেন। আকাশরাজের বিবাহ হয়েছিল ধরনী দেবী নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে। তাঁদের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না, তাই পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞের জন্য তাঁরা ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন এক বালিকা আবির্ভূত হলেন। তখন আকাশবাণী আকাশরাজকে বললেন—"হে রাজা! এই বালিকাকে তুমি কন্যা হিসাবে গ্রহণ করো। এই বালিকার কারণে তোমার কীর্তি সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বে।"

রাজা আনন্দের সঙ্গে সেই বালিকাকে পদ্মের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে পদ্মাবতী নাম দিয়ে লালন-পালন করলেন। সেই বালিকার কৃপায় আকাশরাজের এক পুত্রও জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সেই বালককে বসুদাস নামে অভিহিত করলেন।

পদ্মাবতী দেবীর পূর্বজন্ম

বকুলমাতা সুস্বাদু ভোজন প্রস্তুত করে শ্রীনিবাসের কাছে এসে বললেন—“গোবিন্দ! তুমি কেন দিনের বেলা নিদ্রিত আছো? জাগো। তুমি কেন দুঃখিত? তোমার দুঃখের কারণ কী? তুমি কি বনভূমিতে ভূত-প্রেত দেখে ভীত হয়েছো? অথবা জন্তুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছো? তোমার শরীরের সর্বত্র কেন আঘাতের চিহ্ন রয়েছে? তুমি কি জঙ্গলে কোনো কন্যাকে দেখেছো? সেই সৌভাগ্যবতী কন্যা কে? তোমার মন কে চুরি করেছে, সেই কন্যার কথা বলো।”

অতঃপর শ্রীনিবাস লক্ষ্মীদেবীর মতো দেখতে পদ্মাবতী দেবীর সম্পর্কে এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন—“আমি ত্রেতাযুগে শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হলে, আমার পিতার আদেশ অনুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনবাস করেছি। আমি ও লক্ষ্মণ অনুপস্থিত থাকাকালে, রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অগ্নিদেব এক ভেড়া-রথ নিয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—‘হে রাবণ! তুমি যে নারীকে নিয়ে যাচ্ছ, সে সীতাদেবী নন। তিনি এক ব্রাহ্মণ নারী। রাম তোমাকে ভীত হয়ে প্রকৃত সীতাদেবীকে আমার কাছে গোপন রেখেছেন। আমার কাছে থাকা প্রকৃত সীতাদেবীকে নিয়ে যাও এবং এই ব্রাহ্মণ নারীকে মুক্ত করে দাও।’ রাবণ অগ্নিদেবের কথা বিশ্বাস করে প্রকৃত সীতাদেবীকে মুক্ত করে দেন এবং অগ্নিদেবের কাছে থাকা বেদবতীকে নিয়ে যান।”

"আমি যখন রাবণাসুরকে সংহার করলাম, তখন বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন, আর অগ্নি থেকে প্রকৃত সীতাদেবী আবির্ভূত হয়ে পূর্বে ঘটে যাওয়া বিষয়টি প্রকাশ করে বললেন যে তিনি বেদবতীকে বিবাহ করতে চান। তখন আমি বললাম—'আমি রাম অবতার রূপে একমাত্র এক স্ত্রী গ্রহণ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই আমি এখন

তাঁকে বিবাহ করব না। কিন্তু কলিযুগে যখন বেদবতী আকাশরাজের কন্যা রূপে জন্ম নেবেন, তখন আমি তাঁকে বিবাহ করব। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ব্রহ্মালোকের ব্রহ্মাদেবের পূজাকে গ্রহণ করতে পারেন।' এরপর বেদবতী ব্রহ্মালোকে গমন করলেন। সেই বেদবতীই এখন আকাশরাজের পুত্রকামেষ্ঠী যজ্ঞের সময় ভূমি কর্ষণের ফলে পদ্ম থেকে আবির্ভূত হলেন। পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করায় আকাশরাজ তাঁকে পদ্মাবতী দেবী নামে অভিহিত করলেন।"

(**বরাহ পুরাণে বেদবতী সম্পর্কে এইভাবে উল্লেখ আছে:** বেদবতী নারায়ণকে বিবাহ করার তপস্যা করছিলেন। সেই সময় লঙ্কার রাজ্য শাসন করছিলেন রাবণাসুর। তিনি পৃথিবীর উপর রাজ্য, দিক্‌পাল এবং লোকপালদের জয় করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখনই তিনি তপস্যারত বেদবতীকে দেখেন। রাবণাসুর বেদবতীর কাছে গিয়ে বললেন, “ও কল্যাণী! তোমার তপস্যা ও সৌন্দর্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। আমি চৌদ্দটি লোক জয় করেছি। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আমার দাস। ত্রিমূর্তিরাও আমাকে দেখে ভয় পান। এখন এই তিনটি জগত আমার হাতে। আমি এতো লোক ঘুরেছি, কিন্তু তোমার মতো রমণীয় নারীকে কখনও দেখিনি। তোমাকে দেখেই আমার মন কামনায় অধীন হয়েছে। তুমি এই তপস্যা ত্যাগ করে তোমার যৌবন নষ্ট না করে আমাকে বিবাহ করো, লঙ্কার রাণী হও এবং চৌদ্দলোকবাসীদের সেবা গ্রহণ করো।”

এই কথাগুলি শুনে বেদবতীর মনে ক্রোধ ও ভয় উদয় হল। তবুও সাহস নিয়ে তিনি রাবণাসুরকে বললেন, “ও রাক্ষসরাজ! আমি শপথ করেছি যে নারায়ণ ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করব না। সেই কারণে আমি নারায়ণের জন্যই তপস্যা করছি। যদি নারায়ণ আমাকে বিবাহ না করেন, তবে আমি প্রাণ ত্যাগ করব কিন্তু অন্য কাউকে বিবাহ করব না। অতএব তুমি তোমার পথে চলো।”

রাবণাসুর বড় করে হেসে বলল, “ও পাগলী! নারায়ণ আমার নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপে। আমি এত বড় বীর হয়ে নিজে চাইছি, আর তুমি প্রত্যাখ্যান করছো! তাহলে আমি তোমাকে জোরপূর্বক বিবাহ করব,

কে আমাকে বাধা দেয় তা দেখে নেব।” এই কথা বলে রাবণাসুর বেদবতীর কাছে গিয়ে তার কেশ ধরল। তখন বেদবতী নিজের তপোবলে হাতকে খড়্গরূপে পরিণত করে রাবণাসুরের ধরা কেশ নিজেই ছেঁটে ফেললেন এবং বললেন, “ওরে পাপী! যে পরস্ত্রীরা তোকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, তাদের জোর করে অপমান করিস? আমার কারণেই তুই এবং তোর বংশ ধ্বংস হবে।” এইভাবে অভিশাপ দিয়ে বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। সেই বেদবতীকেই অগ্নিদেব রাবণাসুরকে ফিরিয়ে দিলেন।)

বকুলমাতা পদ্মাবতী দেবীর সখীদের সঙ্গে দেখা করা

শ্রীনিবাস বকুলমাতাকে বললেন, "আমি সেই পদ্মাবতীকে বিবাহ করব। এজন্য তুমি পদ্মাবতীর পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তুতি করো।" বকুলমাতা শ্রীনিবাসকে বললেন, "স্বামী! আপনি যা বললেন, আমি আপনার বিয়ের জন্য সেটি করব।" এরপর তিনি একটি মেয়ের ঘোড়ায় চড়ে শ্রীনিবাসের নির্দেশিত পথে বেরিয়ে পড়লেন, কপিলতীর্থে স্নান করে কপিলেশ্বরের দর্শন করলেন এবং তাঁর পুত্রের বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার জন্য কপিলেশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করলেন। সেখানে থেকে বকুলমাতা পদ্মসরোবরেও স্নান করলেন, এবং সেখানে থাকা কৃষ্ণবলরামকে দর্শন করে তাঁদের কমল ফুল দিয়ে পূজা করলেন (বকুলমাতা যাঁরা কৃষ্ণবলরামের দর্শন করলেন, তাঁদের মন্দির পদ্মাবতী দেবীর মন্দিরের ভেতরেই রয়েছে)। এরপর বকুলমাতা স্বর্ণমুখারী নদীতে গিয়ে স্নান করলেন।

সোনামুখারী নদী থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি অগস্ত্য আশ্রমে পৌঁছালেন এবং অগস্ত্যেশ্বরের দর্শন করলেন। ঠিক তখনই সেখানে পদ্মাবতী দেবীর সখীরা এসেছিল। বকুলমাতা ঐ কন্যাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কে? এখানে কেন এসেছ?" কন্যারা বললেন, "আমরা পদ্মাবতী দেবীর সখীরা।" এরপর তারা ফুলের বাগানে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বর্ণনা করল এবং পরে যা ঘটল তা এভাবে জানালো: "সেই কিরাতক পুরুষ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতী দেবী মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। আমরা পদ্মাবতী দেবীকে পালকিতে করে আকাশরাজের কাছে নিয়ে গেলাম এবং

ঘটনার বিবরণ দিলাম। তখন আকাশরাজ তাঁর পুত্রকে বললেন, 'বৃহস্পতিকে নিয়ে আসো।' তখন বসুদাস স্বর্গে গিয়ে বৃহস্পতিকে নিয়ে এলেন। আকাশরাজ বৃহস্পতির অতিথি সেবা করে ঘটনার বর্ণনা দিলেন এবং পদ্মাবতীর সুস্থ হওয়ার উপায় জানতে চাইলেন। তখন বৃহস্পতি অগস্ত্যেশ্বরকে অভিষেক করার নির্দেশ দিলেন। আকাশরাজ ব্রাহ্মণদের বললেন, 'অগস্ত্যেশ্বরকে অভিষেক করাও এবং অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও।' এজন্য আমরা অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে এখানে এসেছি," তারা জানালো।

তারপর পদ্মাবতী দেবীর সখীরা বকুলমাতাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? এখানে আসার কারণ কী?" বকুলমাতা তাদের বললেন, "পুরাণ পুরুষ, জন্মহীন নারায়ণের প্রভাব তোমরা জানো না। সেই নারায়ণ এখন ভেঙ্কটাচলমূলে সাধারণ মানুষের মতো বাস করছেন। আমি তাঁর সেবা করছি। আমার নাম বকুল। আমি ধরনী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার পথ বলো।" পদ্মাবতী দেবীর সখীরা বলল, "তুমি আমাদের সাথে চলো, আমরা ধরনী দেবীর সঙ্গে দেখা করাব।" তাই বকুলমাতা সম্মতি জানিয়ে তাদের সঙ্গে রওনা দিল।

শ্রীনিবাস নারী তান্ত্রিক রূপ ধারণ করা

বকুলমাতা চলে যাওয়ার পরে, শ্রীনিবাস ভাবলেন, "যার একমাত্র পুত্র আছে, সে সন্তানহীন ব্যক্তির মতো; যার একমাত্র চোখ আছে, সে এক চোখের ব্যক্তির মতো; তেমনি একমাত্র নারীর কাজ সফল হবে না। বকুলমাতার কথাগুলো আকাশরাজ বিশ্বাস নাও করতে পারেন।" তাই তিনি ব্রহ্মদেবের ছেলে রূপে পরিণত হয়ে শিবকে মন্ত্রদন্ড হিসাবে নিয়ে এক সোদিকন্তে নারীর ভেষজ গ্রহণ করলেন। নারায়ণপুরের সবাই শোনার মতো সেই নারী বলতেন, "আমি যাদের সঙ্গে ঘটে গেছে, ঘটছে এবং ঘটতে চলেছে, তাদের সম্পর্কে বলব।"

নগরের একজন নারী ধরনী দেবীর কাছে গিয়ে তান্ত্রিকের নারীর কথা জানালো। ধরনী দেবী ঐ নারীর ডাক দিলেন এবং তাঁকে পদ্মাবতী দেবীর ব্যাপারে জানাতে বললেন। পদ্মাবতী দেবীর হাত দেখার পর তান্ত্রিকের নারী ধরনী দেবীর কাছে বলল, "তোমার কন্যা কিছুদিন আগে ফুলের বাগানে একজন যুবককে দেখে প্রেমে পড়েছে। সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তুমি রাজি হবে না ভেবে সে তোমাকে এই কথা বলতে পারেনি এবং এ কারণে অন্নাহার করতে ছেড়ে দুঃখে আছে। তুমি দ্রুত ঐ যুবকের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে করাবে না, তবে তোমার কন্যা বাঁচবে না। ওই পুরুষ বৈকুণ্ঠে অবস্থানরত নারায়ণ। তোমার কন্যাকে নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে করালে তার মানসিক যন্ত্রণার অবসান হবে।" বলেই সে চলে গেল। সোদিকন্তে নারী চলে যাওয়ার পরে ধরনী দেবী পদ্মাবতীর কাছে গিয়ে বললেন, "তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। তুমি দুঃখ করো না।" বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

বকুলমাতা ধরনী দেবীকে সাক্ষাৎ করা

পদ্মাবতী দেবীর সখীরা ধরনী দেবীর কাছে গিয়ে বকুলমাতার ব্যাপারে জানাল। ধরনী দেবী বকুলমাতাকে অতিথি সেবা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?” বকুলমাতা বললেন, “আমি বেনকটাচল পর্বতে বরাহ স্বামীর এবং নারায়ণের সেবা করি।” ফুলের বাগানে ঘটানো ঘটনাটাও জানিয়ে বললেন, “নারায়ণ আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চান। তাই আপনার মতামত জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন।” ধরনী দেবী বললেন, “আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে উত্তর দেব।”

ধরনী দেবী আকাশরাজকে সাক্ষাৎ করে সোদিকন্তে ও বকুলমাতার কথাগুলো জানালেন। পরে আকাশরাজ ব্রহ্মাপুত্র বহস্পতিকে ডেকে এনে বকুলমাতা ও তান্ত্রিক কে যে কথা বলেছে তা জানান দিয়ে শ্রীনিবাস সম্পর্কে জানাতে বললেন। বৃষস্পতি বললেন, “শ্রীনিবাস সম্পর্কে আমার থেকে বেশি জানেন শুকদেব। তাই আপনি শুকদেবকে জিজ্ঞেস করুন।”আকাশরাজ তখন তণ্ডামানকে ডাক দিয়ে শুকদেবকে আমন্ত্রণ জানাতে পাঠাল। ঠাণ্ডামান শুকদেবের কাছে গিয়ে আকাশরাজের আমন্ত্রণ জানাল। শুকদেব তণ্ডামানের

সঙ্গে আসতে থাকলে আকাশরাজ তাদের স্বাগত জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে অতিথি সেবা করে আসন দিলেন। তারপর ঘটনাগুলো বিস্তারিত জানিয়ে শ্রীনিবাস সম্পর্কে বলার অনুরোধ করলেন। শুকদেব নারায়ণ কীভাবে বৈকুণ্ঠ থেকে ভেঙ্কটাচল আসেন তা বিস্তারিত জানালে আকাশরাজ বললেন, "তুমি অনেক ভাগ্যবান। পূর্ব জন্মে তোমার সঞ্চিত পুণ্যের জন্য নারায়ণ তোমার জামাই হতে চলেছেন। ও রাজা! তোমার বন্ধুত্বের জন্য আমরাও ভাগ্যবান।"

আকাশরাজ শ্রীনিবাসকে বিবাহ পত্র লেখা

আকাশরাজ বৃহস্পতিকে কিভাবে বিবাহ পত্র লেখা যায় তা জানতে চাইলেন। তখন বৃহস্পতি বললেন, "দিব্য মঙ্গল স্বরূপ (সমস্ত শুভ গুণের অধিকারী), সনাতন (জন্মহীন), স্বতন্ত্র (কারও অধীনে নয়), বহু অবতার ধারণকারী সেই নারায়ণের পাদদর্শন করার উত্সাহে আমি আকাশরাজ নামে পরিচিত। আমি আপনার করুণায় নারায়ণপট্টন পরিচালনা করি। আমার কন্যা পদ্মাবতীকে আপনাকে বিয়ে দিতে নির্ধারণ করেছি। তাই বৈশাখ শুক্ল দশমী শুক্রবার আপনার বন্ধু এবং আত্মীয়দের সঙ্গে এসে পদ্মাবতীর সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন করতে পারবেন।" বৃষস্পতির এই কথাগুলো শুনে আকাশরাজও একইভাবে বিবাহ পত্রটি লিখলেন।

শুভলেখাটি শুকদেবকে দিয়ে বললেন, "আপনি বকুলমাতা এবং আপনার শিষ্যদের সঙ্গে ভেঙ্কটাচল গিয়ে এই শুভলেখা শ্রীনিবাসকে পৌঁছে দিন।" শুকদেব সম্মতি জানিয়ে ভেঙ্কটাচল গিয়ে ঘটনার সব বিবরণ শ্রীনিবাসকে জানালেন এবং আকাশরাজের লেখা বিবাহ পত্রটি শ্রীনিবাসকে দিলেন। শ্রীনিবাস সেই বিবাহ পত্রটি পড়ে আনন্দে শুকদেবকে আলিঙ্গন করে বললেন, "হনুমান আমাকে সীতার সন্ধান করিয়ে দিয়েছিল, তখন আমি হানুমানকে এমনভাবে আলিঙ্গন করে ব্রহ্মের পদ দিয়েছিলাম।"

শ্রীনিবাস দ্বারা আকাশরাজকে উত্তরপত্র লেখা

তারপর শ্রীনিবাস শুকদেবকে বললেন, “যেমন রুক্মিণীকে আমি চিঠি লিখেছি, তেমনি ইন্দ্রের বন্ধু আকাশরাজকে চিঠি লিখব।” এবং এভাবে লিখলেন: “সব রাজাদের দ্বারা পূজিত সুধর্মের পুত্র আকাশরাজ, আমি শ্রীনিবাস ভক্তিভরে নমস্কার জানিয়ে এই চিঠি লিখছি। আপনার পাঠানো শুভলেখাটি দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। বৈশাখ শুক্ল দশমী শুক্রবার আপনি যে সময় নির্ধারণ করেছেন, সেদিন এসে পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করব। পূর্বে সমুদ্র তার কন্যা (লক্ষ্মীদেবী) আমাকে উপহার দিয়ে কীর্তি অর্জন করেছিলেন, তেমনি আপনি পদ্মাবতীকে আমাকে সমর্পণ করে এই জগতে কীর্তি অর্জন করবেন। ভাগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসে কপিল মুনির অভিশপ্ত সাগরের সন্তানরা তাদের পূর্বপুরুষদের ধ্বংস করেছিলেন, তেমনি আপনি আপনার সুন্দর কন্যাকে আমাকে সমর্পণ করে আপনার পিতৃপক্ষকে উদ্ধার করবেন এবং অবিশ্বাস্য কীর্তি অর্জন করবেন।” এই চিঠি লিখে শুকদেবকে দিয়ে পাঠালেন।

শ্রীনিবাস তাঁর বিবাহের জন্য দেবতাদের আমন্ত্রণ করা

শ্রীনিবাস বকুলমাতার কাছে বললেন, “আকাশরাজ আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে রয়েছেন। মানুষ তাদের সমকক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহ বা বিবাদের জন্য প্রস্তুত হয়। আমি এখানে আত্মীয় ও বন্ধুদের থেকে দূরে আছি। আমাদেরও আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে বিবাহের জন্য যেতে হবে।” তখন শ্রীনিবাস গোরুড় ও আদিশেষকে স্মরণ করতেই তারা এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীনিবাস গোরুড় এর কাছে বললেন, “তুমি অবিলম্বে ব্রহ্ম দেবের কাছে গিয়ে আমার বিবাহ শুভলেখা দাও এবং বলো যে তিনি তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে আমার বিবাহে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।” আদিশেষকে বললেন, “তুমি কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে আমার বিবাহ শুভলেখা দাও এবং বলো তিনি তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে আমার বিবাহে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।” তারা দুজনই তেমনি আমন্ত্রণ জানালেন।

"নারায়ণের বিবাহে সবাই আসবে" বলে ব্রহ্ম দেব তাঁর লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন। ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, যমসহ দিকপালদের ডেকে বললেন, "নারায়ণের বিবাহে তোমাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে আসতে হবে।" ব্রহ্ম দেব তাঁর স্ত্রীদের (সরস্বতী, সাভিত্রী, গায়ত্রী) ও দিকপালদের সঙ্গে শেষাচলে এসে শ্রীনিবাসকে নমস্কার করলেন। কৈলাস থেকে শিবও তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে এসে শ্রীনিবাসকে নমস্কার করলেন। ব্রহ্মদেবের ইচ্ছা অনুযায়ী আসা সবার জন্য বিশ্বকর্মা বিশিষ্ট ভদ্র ভবন নির্মাণ করলেন। এরপর শ্রীনিবাসের বিবাহে আসা দেবতাদের বিভিন্ন সেবা অর্পণ করে বিশ্বকর্মাকে বললেন, "তুমি নারায়ণপুরে গিয়ে বিবাহ মঞ্চ নির্মাণ করো।" বিশ্বকর্মা নারায়ণপুরে গেলেন।

শ্রীনিবাসের বিবাহে লক্ষ্মী দেবীর আগমন

শ্রীনিবাস মনের মধ্যে ভাবলেন, "আমার বিবাহ দেখতে লক্ষ্মী দেবীও আসবেন।" তিনি সূর্যকে ডেকে বললেন, "করবীরপুরে (কলহাপুর) আমার জন্য তপস্যা করছেন লক্ষ্মী দেবীর কাছে যাও এবং বলো যে আমি শেষা চলে খাবার না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে মাটিতে পড়ে আছি, শুনলেই তিনি এখানে আসবেন।" সূর্য শ্রীনিবাসকে বললেন, "স্বামী! সকলের মনোভাব লক্ষ্মী দেবী জানেন। তুমি খাবার না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে মাটিতে পড়ে আছো বললে লক্ষ্মী দেবী কীভাবে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?"

শ্রীনিবাস সূর্যকে বললেন, "লক্ষ্মী আমার মায়াজালে তোমার কথা বিশ্বাস করে এখানে আসবেন।" সূর্য বললেন, "স্বামী! আপনি যেভাবে বলছেন আমি তাই করব।" এরপর তিনি লক্ষ্মী দেবীর কাছে গিয়ে বললেন, "নারায়ণ খাবার না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন।" এই কথা শুনে লক্ষ্মী দেবী বিশ্বাস করে ভেঙ্কটাচলে এলেন। লক্ষ্মী দেবীকে দেখেই মুনিরা এবং শিব, ব্রহ্মা সহ অন্যান্য দেবতারা প্রণাম করলেন। লক্ষ্মী দেবী শ্রীনিবাসকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীনিবাস লক্ষ্মী দেবীকে বললেন, "রামঅবতারে তুমি আমাকে বেদবতীকে বিয়ে করার জন্য বলেছিলে। তিনি এখন পদ্মাবতী রূপে

জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি পদ্মাবতীকে তোমার সন্নিধিতে বিয়ে করতে চাই।” লক্ষ্মী দেবী আনন্দিত হয়ে সম্মত হলেন।

শ্রীনিবাস কুবেরের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা

যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সবার জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করতে বললেন শ্রীনিবাস ব্রহ্মাকে। তখন ব্রহ্মা বললেন, “স্বামী! রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিংবা পাত্র কিছুই নেই।” শ্রীনিবাস ব্রহ্মাকে বললেন, “আমি এখন একজন সাধারণ মানবরূপে রয়েছি, তাই বৈকুণ্ঠের সম্পদ আমি ভূলোকতে ব্যবহার করতে পারব না।” ব্রহ্মা শ্রীনিবাসকে বললেন, “স্বামী! বিবাহ কিংবা গৃহনির্মাণের সময় সাধারণ মানুষ যদি অর্থ না থাকে তবে ঋণ গ্রহণ করেন। সেইজন্য আপনি কুবেরের কাছ থেকে ঋণ নিন।” শ্রীনিবাস সম্মত হয়ে কুবেরকে ডেকে বিবাহের খরচের জন্য ঋণ চাইলেন। কুবের বললেন, “স্বামী! এটি ভূলোক, তাই আপনি যদি আমাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন তবেই আমি অর্থ দেব।”

শ্রীনিবাস সম্মত হলেন এবং লিখলেন – “ঋণ গ্রহণকারী শ্রীনিবাস, ঋণ প্রদানকারী কুবের। কলিযুগে বিলম্ব নামক বছরের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে আমার বিবাহ উপলক্ষে আমি শ্রীরামের মুদ্রা চিহ্নযুক্ত চৌদ্দ লক্ষ মাড়ল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করছি। এই অর্থ আমি মূলসহ সুদসহ এক হাজার বছরের মধ্যে পরিশোধ করব। এই চুক্তির সাক্ষী ব্রহ্মা, রুদ্র এবং একটি পিপলগাছ।” এই ঋণপত্রটি শ্রীনিবাস কুবেরকে দেওয়ার পর, কুবের শ্রীনিবাসকে অর্থ দিলেন। ব্রহ্মা সেই অর্থ দিয়ে রান্নার উপকরণ সংগ্রহ করে রান্না করলেন এবং শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে শ্রীনিবাস! এই ভোজন কাকে নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হবে?” তখন শ্রীনিবাস বললেন, “অহোবিলা নৃসিংহ স্বামীকে নিবেদন কর।” ব্রহ্মা নৃসিংহ স্বামীর পূজা করে তাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করলেন এবং আগত সকলকে সেই প্রসাদ বিতরণ করলেন।

শ্রীনিবাস নারায়ণপুরে গমন করেন

শ্রীনিবাসকে বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে মঙ্গল স্নান করিয়ে, অলংকার ও বস্ত্র পরিয়ে বররূপে সজ্জিত করা হল। সেই সময়ে অপ্সরাগণ নৃত্য করলেন, গন্ধর্বগণ কীর্তন করলেন, দেবতারা ফুল বর্ষণ করলেন, ঋষিগণ বেদ পাঠ করলেন। শ্রীনিবাস বরাহ স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, "স্বামী! আপনার আশীর্বাদে আমি বিবাহ করতে চলেছি। তাই আমার বিবাহ উপলক্ষে আপনি ভূমিদেবীর সঙ্গে আসুন।" তখন বরাহ স্বামী বললেন, "আমার সেবিকা বকুল তোমার বিবাহ উপলক্ষে যাবে।" শ্রীনিবাস বললেন, "আমি আপনার ইচ্ছাকে অস্বীকার করতে পারি না।" এইভাবে বলেই তিনি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গরুড়ের উপর আরোহণ করে নারায়ণপুরের দিকে যাত্রা করলেন এবং পথে পদ্মসরোবরের তীরে পৌঁছালেন।

সেখানে শুকদেবের আশ্রম ছিল। শুকদেব শ্রীনিবাসের কাছে এসে প্রণাম করে বললেন, "হে বৈকুণ্ঠপতি! আপনি আমার আশ্রমে এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমার জীবনকে সার্থক করুন।" শ্রীনিবাস শুকদেবকে বললেন, "আমি একা নই, আমার পরিবারকেও দেখুন।" তখন শুকদেব বললেন, "স্বামী! আপনি যদি সন্তুষ্ট হন, তাহলে চৌদ্দটি লোকের অধিবাসীরাও সন্তুষ্ট হন। তাই আপনি দয়া করে এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।" শুকদেবের প্রার্থনা শুনে শ্রীনিবাস তাঁর আশ্রমে গেলেন। শুকদেব পদ্মসরোবরে স্নান করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে লক্ষ্মী ও শ্রীনিবাসকে নিবেদন করলেন।

পদ্মাবতী দেবী ও শ্রীনিবাসের বিবাহ

শ্রীনিবাস তাঁর পরিবারসহ আগমন করেছেন জেনে তোন্ডামান তাঁর স্ত্রী ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে তাঁদের স্বাগত জানান। তোন্ডামানের স্ত্রী শ্রীনিবাসকে নজর না লাগার জন্য আরতি করেন। তোন্ডামান শ্রীনিবাসকে আকাশরাজের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে সোনার সিংহাসনে বসান। আকাশরাজ শ্রীনিবাসকে প্রণাম করেন। ধরণী দেবী স্বামী পুষ্করিণীর জল দিয়ে শ্রীনিবাসের পায়ে অভিষেক করাতে থাকেন, সেই সময় আকাশরাজ নিজ হাতে সেই জল দিয়ে

পাদাবিষেক করেন। এরপর সেই জল নিজের মাথায় ছিটিয়ে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সেবকগণের মাথায়, ধনাগার, গোশালা, গজশালা, অশ্বশালা ও বস্ত্রশালার উপর ছিটিয়ে দেন এবং বলেন: "শ্রীনিবাসের পদোদকেই আজ আমার রাজ্য, আত্মীয়বর্গ, পিতৃদেবতারা পবিত্র হয়েছেন।"

বৃহস্পতি শ্রীনিবাসকে বলেন, "অত্রি মহর্ষির গোত্রে জন্ম নেওয়া সুধীরের প্রপৌত্রী, সুধর্মার পৌত্রী এবং আকাশরাজের কন্যাকে আপনি গ্রহণ করুন।" তখন বশিষ্ঠ মুনি শ্রীনিবাসের পক্ষে বলেন, "বশিষ্ঠ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী, যযাতির প্রপৌত্র, তেজস্বী সূরসেনের পৌত্র এবং বসুদেবের পুত্র শ্রীনিবাস আপনার কন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ করবেন।" আকাশরাজ শ্রীনিবাসকে বলেন, "হে পুরুষোত্তম! আমি আমার কন্যাকে আপনাকে সমর্পণ করছি। দয়া করে আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন।" এইভাবে তিনি পদ্মাবতী দেবীকে শ্রীনিবাসের ডান হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সমর্পণ করেন। বশিষ্ঠ মুনি যখন বিবাহ মন্ত্র পাঠ করছিলেন, তখন পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠে শুদ্ধ মঙ্গলসূত্রটি শ্রীনিবাস পদ্মাবতী দেবীর গলায় পরিয়ে দেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ নারীরা পদ্মাবতীকে আশীর্বাদ করে বলেন, "সাবিত্রী রূপে বহু পুত্র সন্তান লাভ করে, তুমি জগৎমাতারূপে সকলকে কল্যাণ প্রদান করো।"

বিবাহ উপলক্ষে আকাশরাজ ব্রাহ্মণদের কোটি কোটি সংখ্যক গরু, ঘোড়া, বস্ত্র ও অলংকার দান করেন। শ্রীনিবাসকে পণ হিসেবে তিনি একশো ভারের স্বর্ণমুকুট, কণ্ঠহার, মুক্তার মালা, দুই কাঁধে নাগাভরণ, আংটি, কোমরের রত্নজড়িত কোমরবন্ধ ও বহু রত্নহারাদি উপহার দেন। বিবাহের পরে সবাই শ্রীনিবাসের সঙ্গে ভোজে অংশগ্রহণ করেন। বিবাহানুষ্ঠান চার দিন ধরে চলে। পঞ্চম দিনে শ্রীনিবাস, পদ্মাবতী দেবীর সঙ্গে গরুড় বাহনে করে সুবর্ণ মুখারী নদীর তীরে অবস্থিত অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গমন করেন। (এই বিবাহ যে স্থানে হয়েছিল সেই নারায়ণপুর নামক স্থানে এখন পদ্মাবতী দেবী ও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দির অবস্থিত। নারায়ণপুর তিরুপতি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।)

এই সময় আকাশরাজ ও অন্যান্য আত্মীয়রা পদ্মাবতী দেবীর বিরহে দুঃখিত হন। আকাশরাজ অগস্ত্য মুনির আশ্রমে রান্নার পাত্র ও সামগ্রী পাঠান। পদ্মাবতী দেবীকে সেবা করার জন্য শত শত দাসী নিয়ে নিজে উপস্থিত হন এবং শ্রীনিবাস-পদ্মাবতীকে দর্শন করেন। শ্রীনিবাস আকাশরাজকে বলেন, "আপনি আমার গুরুতুল্য। আপনার ইচ্ছা জানান, আমি তা পূর্ণ করব।" তখন আকাশরাজ বলেন, "হে কৃষ্ণ! আমাকে ও আমার পরিবারকে ভক্তি প্রদান করুন।" তখন শ্রীনিবাস আশীর্বাদ করে বলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" এরপর তিনি নিজের পরিধানকৃত পট্টবস্ত্র নিজের ভগ্নিপতি বসুদাসকে উপহার দেন।

আকাশরাজ তখন পদ্মাবতী দেবীকে বলেন, "মা! আমি এখন যাচ্ছি। তুমি শ্রীনিবাসের সেবা করে তোমার জীবনকে সার্থক করো।" এই বলে তিনি নারায়ণপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীনিবাস তখন বিবাহ উপলক্ষে আগত দেবতা ও ঋষিদের উদ্দেশে বলেন, "আমি অগস্ত্য মুনির আশ্রমে ছয় মাস থাকব, অতএব আপনারা সকলে নিজ নিজ লোকালয়ে ফিরে যান।" শ্রীনিবাসের আজ্ঞা অমান্য করতে না পেরে সকল দেবতা ও ঋষিগণ শ্রীনিবাস, পদ্মাবতী দেবী ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে চলে যান। লক্ষ্মীদেবী শ্রীনিবাসের অনুমতি নিয়ে করবীরপুরে গমন করেন।

আকাশরাজ এর দেহ ত্যাগ

পদ্মাবতী দেবী এবং শ্রীনিবাস অগস্ত্য মুনির আশ্রমে থাকাকালীন আকাশরাজুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। তিনি দেহ ত্যাগের সময় পদ্মাবতী দেবী ও শ্রীনিবাসকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করে একজন দূতকে পাঠালেন তাঁদের আনতে। দূত গিয়ে পদ্মাবতী দেবীকে প্রণাম করে বললেন, "আকাশরাজুর স্বাস্থ্য ভীষণ খারাপ, তিনি আপনাদের দেখতে চান।" এই কথা শুনেই পদ্মাবতী দেবী অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অগস্ত্য মুনির পত্নীর সেবায় পদ্মাবতী দেবী পুনরায় চেতনা লাভ করলেন। এই সংবাদে শ্রীনিবাসও গভীরভাবে শোকাহত হলেন।

পদ্মাবতী দেবী, শ্রীনিবাসসহ সকলেই নারায়ণপুরে এসে আকাশরাজুকে দর্শন করলেন। শ্রীনিবাস আকাশরাজকে বললেন, “হে রাজা! তুমি তোমার পুত্র বসুদাস, কন্যা পদ্মাবতী, সাহসী ভ্রাতা তন্ডমানএবং সামন্ত রাজাদের, এমনকি তোমার রাজ্য ও শরীরকেও ছেড়ে চলে যাচ্ছো? আমাদের পিতা-মাতা কেউ নেই, তুমি-ই আমাদের পিতা, তুমি-ই জননী। আজ থেকে আমরা অনাথ হলাম।” এইভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো শ্রীনিবাস দুঃখ প্রকাশ করলেন। আকাশরাজু বললেন, “তুমি যদিও সমস্ত জগতের আত্মীয়, আমাদের ভাগ্য যে তোমার সাথে সরাসরি আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। তুমি আমাদের আত্মীয় হওয়াতে আমাদের জন্ম সার্থক হয়েছে। আমি ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পর আমার পুত্র বসুদাস ও ভাই তোমদামানকে তুমি রক্ষা করো।” এই বলে তিনি দেহ ত্যাগ করলেন ও তাঁর জন্য আগত বিমানে ব্রহ্মলোকে গেলেন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, অত্রি, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিদের তত্ত্বাবধানে বসুদাস আকাশরাজুর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করলেন। পরে শ্রীনিবাস পদ্মাবতী দেবীকে নিয়ে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে ফিরে গেলেন।

রাজ্য নিয়ে তন্ডমান ও বসুদাসের যুদ্ধ

আকাশরাজ শরীর ত্যাগ করার পরে তন্ডমান বসুদাসকে বললেন, “বড়োরা মৃত্যুবরণ করলে ছোটদেরই রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হয়, সেই অনুযায়ী এই রাজ্যের উপর আমারই অধিকার রয়েছে।” বসুদাস বললেন, “পিতার রাজ্য কেবল পুত্রের কাছেই হস্তান্তরিত হয়, তাই এই রাজ্যের উপর আমারই কর্তৃত্ব থাকবে।” এইভাবে তারা উভয়েই রাজ্য নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধের সময় নিজেদের সাহায্যের জন্য বসুদাস ও থোণ্ডমান দুজনেই শ্রীনিবাসের কাছে প্রার্থনা করলেন। শ্রীনিবাস একান্ত সময়ে পদ্মাবতী দেবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কার সাহায্য করব?” পদ্মাবতী দেবী বললেন, “থোণ্ডমান সাহসী ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ। বসুদাস যুদ্ধের অনভিজ্ঞ এবং পিতৃহীন, তাই তুমি বসুদাসের সহায় হও।” শ্রীনিবাস থোণ্ডমানকে নিজের শঙ্খচক্র প্রদান করে বসুদাসকে যুদ্ধে সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হল, বসুদাস দশটি তীর দিয়ে তন্ডমানকে আঘাত করলেন। তন্ডমান বসুদাসকে ছেড়ে শ্রীনিবাসের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। শ্রীনিবাস থোণ্ডমানকে আহত করে তাঁর সারথিকে বধ করে রথকে ধ্বংস করলেন। এটি দেখে তন্ডমান এর পুত্র শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে পাঁচ হাজার তীর দিয়ে তাঁর বক্ষদেশে আঘাত করলেন। ক্রোধে উন্মত্ত তন্ডমান ঘোড়ায় চড়ে শ্রীনিবাস প্রদত্ত সুদর্শন চক্র দিয়ে শ্রীনিবাসের বক্ষদেশে আক্রমণ করতেই, শ্রীনিবাস একজন সাধারণ মানবের মত মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

শ্রীনিবাস যুদ্ধক্ষেত্রে মাটিতে পড়তেই, অন্তঃপুরের উপর থেকে এই যুদ্ধ দেখছিলেন পদ্মাবতী দেবী। তিনি দুঃখে আগস্ত্য মুনির নিকটে গিয়ে বললেন, “সবাই দেখতে থাকতেই কি আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে অচেতন হলেন? নাকি আমাকে বিভ্রম সৃষ্টি করতে তিনি মাটিতে পড়ে গেছেন? এখন আমি কী করব তা আপনারাই বলুন” বলে প্রার্থনা করলেন। আগস্ত্য মুনি বললেন, “দেশ, কাল অনুযায়ী কাজ করলে তবেই মানুষ ফল লাভ করে। অতএব, তোমার স্বামীর কল্যাণ কামনা করে, তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। স্ত্রীদের ধর্ম হল স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভক্তি থাকা। কল্যাণী! আমার মনে হয় সন্ধির প্রচেষ্টাই এখন শ্রেয়। তোমার কাকা এবং ভাই দুজনেই রাজ্য শাসনের যোগ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই” বলে জানালেন। পদ্মাবতী দেবী আগস্ত্য মুনির বাক্য মেনে, “আপনি যেমন বললেন, তেমনই করব” বলে আগস্ত্য মুনির সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে পদ্মাবতী দেবী শ্রীনিবাসের সেবা করে তাঁকে চেতনায় ফিরিয়ে আনলেন। শ্রীনিবাস পদ্মাবতী দেবীকে দেখে বললেন, “স্ত্রীরা যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে পারে না। তুমি কেন এসেছ?” তখন আগস্ত্য মুনি শ্রীনিবাসকে বললেন, “শ্রীনিবাস! তুমি যুদ্ধ বন্ধ করে উভয়কে রাজ্য ভাগ করে দাও।” শ্রীনিবাস রুষ্ট হয়ে বললেন, “আমি তন্ডমান এবং তন্ডমান এর পুত্রকে যুদ্ধে বধ করে রাজ্য বসুদাসকেই দেব।

আপনারা এখান থেকে চলে যান।” পদ্মাবতী দেবী শ্রীনিবাসকে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললেন, “স্বামী! পুন্ডরীকাক্ষ! এই পৃথিবী ধ্বংস আনয়নকারী যুদ্ধ থেকে কী লাভ? বসুদাস ও তন্ডমান উভয়েই তো আমাদের আত্মীয়। তাই উভয়কে রাজ্য ভাগ করে দিন” বলে প্রার্থনা করলেন। তবুও শ্রীনিবাস পদ্মাবতী দেবীকে বললেন, “তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম জানো না। তুমি এখান থেকে চলে যাও!” বলে ভর্ৎসনা করলেন। শ্রীনিবাস তাঁর কথা না শুনায়, পদ্মাবতী দেবী আগস্ত্য মুনিকে “আপনিই অন্তত এই যুদ্ধ থামান” বলে প্রার্থনা করলেন।

আগস্ত্য মুনি শ্রীনিবাসকে বললেন, “আকাশরাজ দেহ ত্যাগ করার সময় বসুদাস ও তন্ডমানকে তুমি রক্ষা করো বলে আমায় বলে গিয়েছেন। অতএব, তুমি উভয়কে রক্ষা করতেই হবে! একজনকে বধ করে আরেকজনকে রাজ্য দিলে তুমি আকাশরাজকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙঘন করবে। তাই, রাজ্য উভয়ের মাঝে ভাগ করে দাও” বলে উপদেশ দিলেন। আগস্ত্য মুনির উপদেশ শুনে শ্রীনিবাস শান্ত হলেন এবং বসুদাস ও তন্ডমানকে ডেকে বললেন, “আকাশরাজ দেহ ত্যাগ করার সময় তোমাদের দুজনকে রক্ষা করতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতএব, তোমরা উভয়েই রাজ্য সমানভাবে ভাগ করে নাও” বলে উপদেশ দিলেন। বসুদাস এবং থোণ্ডমান শ্রীনিবাসের কথা অস্বীকার করতে না পেরে রাজ্য সমানভাবে ভাগ করে নিলেন।

শ্রীনিবাসের অর্চামূর্তিতে পরিণত হওয়া

শ্রীনিবাস বসুদাস ও তন্ডমান এর মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার পর আগস্ত্য মুনির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। একদিন তন্ডমান শ্রীনিবাসের কাছে এসে প্রণাম করলেন। শ্রীনিবাস তন্ডমানকে আলিঙ্গন করে বললেন, “ও রাজা, তুমি এখানে আসার কারণ কী?” তন্ডমান বললেন, “স্বামী! আপনার দর্শনের চেয়ে আমার কাছে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ও শ্রীনিবাস ! আপনি যোগীদের অধিপতি, আপনি সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মাকে নিযুক্তকারী, এবং লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিচরণকারী।” এইভাবে তিনি শ্রীনিবাসের প্রশংসা করে বললেন, “আপনার সেবা করে আমি আমার জীবনকে সার্থক করে তুলতে চাই।” তখন শ্রীনিবাস বললেন, “ও রাজা! তোমার ভাইয়ের কারণে

আমি গৃহস্থ হয়েছি। তবুও আমার থাকার জন্য কোনো ঘর নেই। আকাশরাজের জামাতা থাকার জন্য ঘর না পেয়ে অন্যের বাড়িতে থাকছেন, এই অপমান আকাশরাজের জন্য অনুচিত। অতএব, এই ভেঙ্কটাচল পর্বতে আমার থাকার জন্য তিনটি প্রাকার, দুটি গোপুরম, সাতটি দরজা, মালা গাঁথার ঘর, রান্নাঘর, যজ্ঞশালা, বস্ত্রের ঘর, তেলের ঘর, ভোজনের ঘর ও গয়নার ঘরসহ একটি অসাধারণ মন্দির নির্মাণ কর।”

তন্ডমান শ্রীনিবাস যা বলেছিলেন ঠিক তেমন একটি মন্দির নির্মাণ করলেন। শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম থেকে সেই মন্দির পর্যন্ত সিঁড়িগুলিও নির্মাণ করালেন এবং শ্রীনিবাসকে তা দেখালেন। শ্রীনিবাস শুভ মুহূর্তে দেবতাদের সাথে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন, এবং পদ্মাবতী দেবীকে তাঁর বক্ষে স্থাপন করে, বাম হাতটি কোমরে রেখে, ডান হাত দিয়ে তাঁর পদাশ্রয় গ্রহণ করতে ইঙ্গিত করে অর্চামূর্তিতে পরিণত হলেন।

২. শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর চরিত্র - ২

স্কন্দপুরাণ থেকে

(এই গল্পটি স্কন্দপুরাণের দ্বিতীয় বৈষ্ণব খন্ড - 'শ্রী বেঙ্কটাচল মহাত্ম্যম'-এর প্রথম থেকে দশম অধ্যায় অবলম্বনে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।)

শিব যে কথা স্কন্দকে বলেছিলেন, সেই কথা ঋষিদের বলেন সুত গোস্বামী, নিয়মিশারণ্যে। এখন আমরা স্কন্দপুরাণ থেকে শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর লীলাকথা জানব। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর লীলা এবং ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বর্ণিত লীলার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আচার্যদের মতে, প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার এক দিনে সহস্র সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগ আসে – এটিই 'কল্প' নামে পরিচিত) ভগবান বৈকুন্ঠ থেকে অবতীর্ণ হয়ে বেঙ্কটাচল পর্বতে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীরূপে লীলা করেন। অতএব, কল্পভেদে এই লীলায় পার্থক্য হতে পারে।

নারায়ণের বেঙ্কটাচল আগমন

সুত গোস্বামী ঋষিদের বলেন: হৈহয় বংশে শঙ্খ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নারায়ণের জন্য বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, ব্রাহ্মণদের সোনা, গরু ও জমি দান করেন। কিন্তু নারায়ণের দর্শন না পাওয়ায় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হন। তখন আকাশবাণীর মাধ্যমে নারায়ণ বলেন "হে রাজা! তুমি বৃষভাচলমে (বেঙ্কটাচলমে) গমন করো। এই স্থানটি বৈকুন্ঠেরই সমতুল। সেখানে স্বামীপুষ্করণী নামে এক পবিত্র কুণ্ডের নিকটে আমার জন্য তপস্যা করো। আমি সেখানে তোমাকে দর্শন দেব।" নারায়ণ আরও বলেন "আগস্ত্য মুনি একবার ব্রহ্মার

কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কোথায় নারায়ণের দর্শন পেতে পারেন। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন ‘বেঙ্কটাচলমে গিয়ে তপস্যা করো।’ সেইমতো আগস্ত্য মুনি সেখানে তপস্যা শুরু করেন। আমি সেখানে আগস্ত্য মুনি ও তোমাকে দর্শন দেব।” শঙ্খ রাজা আনন্দিত হয়ে তাঁর পুত্র বজ্রকে রাজত্ব প্রদান করে বেঙ্কটাচলমে যান। তিনি স্বামীপুষ্করণীতে স্নান করে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্যা শুরু করেন।

অন্যদিকে, ইন্দ্রসহ দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়ে নারায়ণের দর্শন কোথায় হবে, তা জানতে চান। ব্রহ্মা বলেন “বেঙ্কটাচলমে এখন আগস্ত্য মুনি ও শঙ্খ রাজা তপস্যা করছেন। তোমরা সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দাও, সেখানে তোমরা নারায়ণের দর্শন পাবে।” দেবগণ বেঙ্কটাচলমে গিয়ে আগস্ত্য মুনির দর্শন করেন এবং ব্রহ্মার আদেশ ব্যাখ্যা করেন।

পরে তাঁরা শঙ্খ রাজার সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং তিনজন মিলে নারায়ণের জন্য প্রার্থনা শুরু করেন। তাঁদের ভক্তি ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ গরুড়বাহনে উপস্থিত হন। সবাই তাঁকে প্রণাম করে বন্দনা করেন। নারায়ণ আগস্ত্য মুনিকে বর চাইতে বলেন। আগস্ত্য মুনি বলেন “আমি চিরকাল আপনার ভক্ত থাকতে চাই এবং অনুরোধ করি, আপনি এই পর্বতে থেকে জীবদের দর্শন দিন।” নারায়ণ বলেন “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, আমি এখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করব।” তিনি শঙ্খ রাজাকে বলেন “তোমার ভক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, বর চাও।” শঙ্খ বলেন “আমি চিরকাল আপনার ভক্তি পেতে চাই।” নারায়ণ বলেন “তোমার ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।” এভাবেই আগস্ত্য মুনির অনুরোধে নারায়ণ বেঙ্কটাচলমে অধিষ্ঠান করেন।

পদ্মাবতী দেবীর জন্ম

নারায়ণপুরমে শাখ বংশের মিত্রবর্মা নামে এক রাজা শাসন করতেন। তাঁর রানি মনোরমা। তাঁদের পুত্র ছিল আকাশ রাজা। আকাশ রাজার স্ত্রী ধরণী দেবী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞের জন্য আকাশ রাজা ভূমি চাষ করার সময় এক

কন্যাশিশুকে খুঁজে পান। সেই কন্যাকে তিনি পদ্মাবতী নামে কন্যারূপে গ্রহণ করেন ও লালন-পালন করেন। পদ্মাবতীর কৃপায় পরে তাঁর এক পুত্রও জন্ম নেয়, যার নাম রাখা হয় বাসুদাস। একদিন পদ্মাবতী দেবী সখীদের সঙ্গে বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে নারদ মুনি আগমন করেন। তাঁকে প্রণাম করে পদ্মাবতী দেবী তাঁর পরিচয় দেন ও ভবিষ্যৎ ভাগ্য জানতে চান। নারদ মুনি বলেন "তুমি লক্ষ্মীরূপিণী। তোমার গুণে লক্ষ্মীর সদৃশ। ভবিষ্যতে নারায়ণ তোমাকে বিবাহ করবেন।" এই বলে নারদ মুনি তাঁকে আশীর্বাদ করে চলে যান।

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সঙ্গে পদ্মাবতী দেবীর সাক্ষাৎ

একদিন বেঙ্কটেশ্বর স্বামী (নারায়ণ) একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বেরিয়ে পড়েন এবং পদ্মাবতী দেবী যেখানে ছিলেন সেই বাগানে পৌঁছে যান। তাঁকে দেখে বাগানের মহিলারা বিস্মিত হন। স্বামী তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন "এই অঞ্চলে কি কোনো নেকড়ে এসেছে?" সখীরা উত্তর দেন "তুমি কেন ধনুক নিয়ে এখানে এসেছো? এই বাগানে হিংসার কোনো স্থান নেই। আকাশ রাজার সুরক্ষিত বাগানে তুমি কীভাবে প্রবেশ করলে?" তখন স্বামী ঘোড়া থেকে নেমে বলেন "তোমরা কারা? বিশেষ করে এই পদ্মনয়না সুন্দরী কে?" তাঁরা বলেন "এই কন্যা পদ্মাবতী, আকাশ রাজার কন্যা, এবং ভূমিদেবীর কৃপায় প্রাপ্ত। আমরা তাঁর সখী।" সখীরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কে?" স্বামী বলেন "আমার নাম অনন্ত, যোগীরা আমাকে কৃষ্ণ নামে ডাকেন। আমি বেঙ্কটাচলমে থাকি, তাই সবাই আমাকে বেঙ্কটাচল স্বামী বলেন। এই সুন্দরীকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি কি আমাকে বিবাহ করবেন?" এই কথা শুনে সখীরা রাগান্বিত হন। তখন স্বামী আবার ঘোড়ায় উঠে বেঙ্কটাচলমে ফিরে যান।

পদ্মাবতী দেবীর পূর্বজন্ম

একদিন বরাহ স্বামী এবং বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবিকা বকুলামাতা বলেন— "ভোজন প্রস্তুত হয়েছে, গ্রহণ করুন।" তখন বেঙ্কটেশ্বর স্বামী বলেন— "রামরূপে বনবাসকালে রাবণ সীতাকে অপহরণ

করতে আসলে, অগ্নিদেবতা সীতাকে তাঁর পত্নী স্বাহা দেবীর নিকট রাখেন এবং বেদবতীকে সীতার রূপে পর্ণশালায় রেখে যান। রাবণ তাঁকেই অপহরণ করে। পরে যখন রাবণ বধ হয়, তখন বেদবতী অগ্নিপ্রবেশ করেন এবং প্রকৃত সীতা অগ্নি থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন অগ্নিদেব বলেন 'বেদবতী আপনার জন্য তপস্যা করেছেন, আপনি তাঁকে বিবাহ করুন।' কিন্তু আমি বলি 'এই জন্মে আমি একপত্নী ব্রতী, তাই এখন তাঁকে বিবাহ করতে পারব না। কৃতযুগে আমি তাঁকে বিবাহ করব।' তখন আমি বেদবতীকে বলি 'তুমি ব্রহ্মলোকে অবস্থান করো, কৃতযুগে আমি তোমাকে বিবাহ করব।'

পুত্রকামেষ্টির সময় আকাশ রাজা যে কন্যাকে মাটির নিচ থেকে পান, তিনিই হলেন সেই বেদবতী, বর্তমান পদ্মাবতী।" এরপর স্বামী বলেন "তুমি পদ্মাবতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যাও।" বকুলামাতা তাঁর আদেশে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে প্রণাম করেন যাত্রা শুরু করেন।

বকুলামাতার পদ্মাবতী দেবীর সখীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পথে অগস্ত্যেশ্বর (শিব) দর্শন করে বিশ্রাম নেওয়ার সময় বকুলামাতা দেখতে পান, পদ্মাবতী দেবীর সখীরা সেখানে উপস্থিত। তিনি তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে সুন্দরী মহিলাগণ! আপনারা কারা? কোথা থেকে এসেছেন? এই মন্দিরে কী কাজ করছেন?" মহিলারা উত্তর দেন, "আমরা আকাশরাজের কন্যা পদ্মাবতী দেবীর দাসী। আমরা দেবীর সঙ্গে বাগানে ফুল তুলছিলাম। সে সময় একজন সুদর্শন পুরুষ সাদা ঘোড়ায় চড়ে জন্তু শিকার করতে করতে সেখানে এসে পদ্মাবতী দেবীকে দেখে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। আমরা সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকাই, তখন তিনি চলে যান। তাঁর চলে যাওয়ার পর পদ্মাবতী দেবী জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। "আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেবীকে আকাশরাজের কাছে নিয়ে যাই। রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে বলেন, 'পদ্মাবতী কেন অজ্ঞান হয়েছেন?' এক ব্রাহ্মণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি দিয়ে বাগানে যা ঘটেছে তা জানিয়ে বলেন, 'হে রাজা, পদ্মাবতী দেবীর বিবাহ ঐ পুরুষের সঙ্গেই হবে।' এরপর রাজা আদেশ দেন, 'শংকর মন্দিরে অভিষেক করো,' এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনার নির্দেশ দেন। সেই সামগ্রী নিয়েই আমরা

এসেছি। এবার বলুন, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?” বকুলামাতা বলেন, “আমি বেঙ্কটাচলে থাকি এবং নারায়ণের সেবা করি। আমি ধরণী দেবীকে দর্শন করতে এসেছি। আমি কি তাঁকে দেখতে পারি?” সখীরা বলেন, “চলুন, আমাদের সঙ্গে এসে ধরণী দেবীর সঙ্গে দেখা করুন।” বকুলামাতা তাঁদের সঙ্গে রওনা হন।

যখন বকুলমাতা পদ্মাবতী দেবী সখীদের সঙ্গে আসছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদের সামনে এক ওঝা নারী ধরনী দেবীকে শুনতে পেলেন এবং সকলকে বললেন, "আমার অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে।" ধরনী দেবী সেই ওঝা নারীকে ডেকে পাঠালেন এবং যখন সে এল, তখন তিনি রঙিন জলের মধ্যে একটি মুক্তো ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এতে কী আছে?" সেই ওঝা নারী বলল, "এতে একটি মুক্তো আছে।" তখন ধরনী দেবী বললেন, "এটাই সত্য! এনার অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে।" এইরূপ ভাবিয়া পদ্মাবতী দেবীর নিকট নিয়ে গিয়ে নিজের কন্যা সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন ওঝা নারী পুষ্প বাটিকা যা ঘটেছে তা বলিয়া জানালেন, "সেই পুরুষ নারায়ণ স্বয়ং। সেই নারায়ণকে তোমার কন্যা পদ্মাবতী দেবীকে বিবাহে দাও। তাহলেই তোমার কন্যার মানসিক ব্যাধি দূর হবে।” এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বকুলামাতা ধরণিদেবীকে সাক্ষাৎ করা

বকুলামাতা পদ্মাবতী দেবীর সখীদের সঙ্গে ধরণিদেবীর কাছে এসে তাকে সাক্ষাৎ করলেন। ধরণিদেবী অতিথিসেবা করে জিজ্ঞাসা করলেন “আপনারা কারা? কোথায় থাকেন? এখানে আসার কারণ কী?” তখন বকুলামাতা ধরণিদেবীকে বললেন “আমি ভেঙ্কটাচলের ওপর নারায়ণকে সেবা করি।” এরপর তিনি নারায়ণ কীভাবে পদ্মাবতী দেবীকে দেখেছিলেন তা জানিয়ে বলেন “তোমার কন্যাকে নারায়ণ বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তোমাদের মতামত জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন।”

ধরণিদেবী বললেন, "আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে জানাবো," বলে আকাশরাজের কাছে গিয়ে সব ঘটনা বললেন। আকাশরাজ বকুলামাতার কাছে এসে বললেন "নারায়ণ আমার কন্যাকে বিবাহ করতে চাইছেন এটি আমার কন্যার সৌভাগ্য।" এরপর তিনি মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন "পদ্মাবতী দেবীর বিবাহ বিষয়ে আপনাদের মত কী?"

সকলেই সম্মতি জানিয়ে বৃহস্পতি দেবকে ডেকে শুভ লগ্ন নির্ধারণ করতে বললেন। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আকাশরাজ বৃহস্পতিকে ডেকে বিবাহ-মুহূর্ত নির্ধারণের অনুরোধ করলেন। বৃহস্পতি বৈশাখ মাসে (এপ্রিল–মে) পড়া উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের শুভ মুহূর্ত নির্ধারণ করলেন। আকাশরাজ তখন বকুলামাতাকে বললেন "বৃহস্পতি নির্ধারিত ওই শুভক্ষণে নারায়ণ যেন এসে আমার কন্যাকে বিবাহ করেন এ কথা তাকে জানিয়ে দাও," বলে বকুলামাতাকে বিদায় দিলেন।

পদ্মাবতী দেবীর বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ

আকাশরাজ তাঁর পুত্র বাসুদাসকে চতুর্দশলোকের সকল দেবতা ও রাজাদের বিবাহে আমন্ত্রণ জানাতে পাঠান। তিনি বিশ্বকর্মাকে ডেকে শহরটি সাজানোর নির্দেশ দেন।

বিবাহ উপলক্ষে দেবতারা সবাই উপস্থিত হন। চন্দ্রকে নারায়ণের প্রিয় খাদ্য প্রস্তুতির দায়িত্ব দেওয়া হয়, আর অন্যান্য দেবতারা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। বিবাহের দিন বেঙ্কটেশ্বর স্বামী গরুড়ে চড়ে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে আগমন করেন। পদ্মাবতী দেবী একটি সুসজ্জিত হাতিতে চড়ে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে প্রণাম করেন। বেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁর গলায় থাকা মালা পদ্মাবতী দেবীর গলায় পরিয়ে দেন, আর দেবী তাঁর হাতে থাকা ফুলের মালা স্বামীর গলায় দেন। এরপর তাঁরা মণ্ডপে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা দেব বিবাহ মন্ত্র পাঠ করে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন করেন।

আকাশরাজ কন্যাকে বিপুল উপহার দিয়ে দেবতাদের বলেন, “আপনারা সকলেই এখন আপনার নিজ নিজ লোকলোকে ফিরে যান।” দেবতারা বেঙ্কটেশ্বর স্বামী ও পদ্মাবতী দেবীকে প্রশংসা করে প্রদক্ষিণ প্রণাম করে ফিরে যান। এরপর বেঙ্কটেশ্বর স্বামী বেঙ্কটাচলে লক্ষ্মী ও পদ্মাবতী দেবীর সঙ্গে বাস করতে শুরু করেন।

বাসু ও টন্ডমানের ইতিহাস

বাসু নিষাদ জাতির বাসু ছিলেন নারায়ণের এক পরম ভক্ত, যিনি বেঙ্কটাচলে বসবাস করতেন এবং পাহাড় ও গাছপালা রক্ষা করতেন। তিনি প্রতিদিন মধু মেশানো ভাত রান্না করে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করতেন। একদিন বাসু স্ত্রীকে নিয়ে মধু সংগ্রহে গেলে ছেলেকে বলেন, “ভাত রক্ষা করো।” বাসুর অনুপস্থিতিতে ছেলে বীর কিছু ভাত আগুনে উৎসর্গ করে, কিছু গাছতলায় নিবেদন করে এবং বাকিটা নিজে খেয়ে নেয়। বাসু ফিরে এসে ভাত না পেয়ে রাগান্বিত হন। তিনি বীরকে মারতে উদ্যত হলে বেঙ্কটেশ্বর স্বামী হস্তক্ষেপ করে বলেন, “তোমার পুত্র আমার জন্য ভাত নিবেদন করে খেয়েছে। সে তোমার চেয়েও বড় ভক্ত।” এরপর বাসু শান্ত হন।

চন্দ্রবংশীয় টন্ডমান রাজা ছিলেন সুধীর ও নন্দিনীর পুত্র। পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি নারায়ণের প্রতি গভীর ভক্ত ছিলেন। তিনি পান্ড্য রাজকুমারী পদ্ম ও অন্যান্য রাজকন্যাদের বিবাহ করেন এবং নারায়ণপুরমে বসবাস শুরু করেন। একদিন শিকারে বেরিয়ে বেঙ্কটাচলে তিনি একটি পাঁচ রঙের টিয়া পাখি দেখেন, যা “শ্রীনিবাস” বলতে বলতে উড়ে যায়। পাখিটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি বাসুর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে টিয়া পাখির কথা জানান। বাসু বলেন, “এটি লক্ষ্মী দেবী পালন করেছেন ও এটি স্বামী পুষ্করণীর কাছে থাকে। এখন পূজার সময়, পরে দেখা করুন।” টন্ডমান বলেন, “আমি পূজা দেখতে চাই,” এবং বাসুর সঙ্গে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনে যান। উভয়ে স্বামীকে প্রণাম করেন এবং স্বামী অন্ন গ্রহণ করেন। টন্ডমান প্রশংসা করে রাজ্যে ফিরে যান।

চন্দ্রবংশে টন্ডমান নামে এক পরম ভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সুধীর এবং মাতা নন্দিনী। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি নারায়ণের প্রতি অপরিসীম ভক্তি প্রকাশ করতেন। তিনি পান্ড্যে রাজ্যের রাজকুমারী পদ্মকে বিবাহ করেন এবং স্বয়ম্বর সভায় আরও অনেক রাজকুমারীকেও বিবাহ করেন। পরে তিনি নারায়ণপুরমে বসবাস শুরু করেন। একদিন শিকারে বেরিয়ে টন্ডমান বেঙ্কটাচল পর্বতে একটি হাতিকে তাড়া করতে থাকেন। তখনই তিনি একটি পাঁচ রঙের টিয়া পাখি দেখতে পান, যা "শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাস" বলে ডেকে উড়ে যায়। টন্ডমান সেই পাখির খোঁজে বেঙ্কটাচল পাহাড়ের রক্ষক বাসুর কাছে যান।

বাসু জানান, এই টিয়া লক্ষ্মী দেবী লালন-পালন করেছেন এবং এটি শ্রী বেঙ্কটেশ্বরের খুব প্রিয়। সেই সময় পূজার সময় হওয়ায় বাসু টন্ডমানকে অপেক্ষা করতে বলেন। তবে টন্ডমান নিজেই বেঙ্কটেশ্বরের দর্শন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাসুর সঙ্গে যান। বেঙ্কটেশ্বরের কাছে গিয়ে তাঁরা প্রণাম করেন এবং বাসু নিবেদন করা ভোগ স্বামী গ্রহণ করেন। টন্ডমান পূর্ণ ভক্তিভরে স্বামীকে প্রণাম করে ফিরে যান এবং এরপর থেকে নিয়মিত স্বামীর দর্শন ও সেবা করতে থাকেন।

বীরশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী লক্ষ্মীকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। পথে স্ত্রী হাঁটতে না পারায় তিনি টন্ডমানের কাছে সাহায্যের জন্য যান এবং বলেন, "আমি গঙ্গাস্নানে যাব, ফিরতে ছয় মাস লাগবে। ততদিন আমার স্ত্রীকে আপনার আশ্রয়ে রাখুন।"

টন্ডমান সম্মত হন এবং লক্ষ্মীর জন্য একটি কক্ষে থাকার ও ছয় মাসের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। তবে বীরশর্মা গঙ্গাস্নানের পরে আরও তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রায় দুই বছর পর ফিরে আসেন। টন্ডমান তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে লক্ষ্মীর ঘরে যান এবং দেখেন, তিনি ও তাঁর সন্তান মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তখন টন্ডমান সুড়ঙ্গপথে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে যান এবং সব ব্যাখ্যা দেন। স্বামী বলেন, "তোমার রানীদের সঙ্গে লক্ষ্মী ও তাঁর পুত্রকে অস্থি সরোবরে স্নান করাও, তাহলেই তারা জীবিত হবেন।" টন্ডমান নির্দেশ অনুযায়ী

কাজ করলে লক্ষ্মী ও তাঁর পুত্র জীবিত হন এবং টন্ডমান তাঁদের বীরশর্মার কাছে হস্তান্তর করেন।

ভক্ত ভীমের গল্প

রাজা টন্ডমান বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর আদেশে স্বর্ণ পদ্ম তৈরি করে পূজা করছিলেন। তখন কুরুম গ্রামে থাকা ভক্ত ভীম বেঙ্কটেশ্বরের দর্শনে আসেন ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। স্বামী বলেন, “প্রতিদিন ভক্তিভরে আমাকে পূজা করো। যখন টন্ডমান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন, তখন তুমি মোক্ষ লাভ করবে।” ভীম নিজের ঘরে মাটির মূর্তি বানিয়ে মাটির পদ্ম ও তুলসীপাতা দিয়ে পূজা শুরু করেন। একদিন টন্ডমান দেখতে পান, স্বামীর পায়ের কাছে মাটির ফুল ও তুলসীপাতা পড়ে আছে। তিনি জানতে চান, “এই ফুলগুলো কে নিবেদন করেছে?” স্বামী তখন ভক্ত ভীমের কথা বলেন। টন্ডমান ভীমের কাছে গিয়ে প্রণাম করেন ও সব ঘটনা জানান। এরপর বেঙ্কটেশ্বর স্বামী গরুড়ে চড়ে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে এসে ভীম ও তাঁর স্ত্রীকে বিমানে করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান। টন্ডমানও পরবর্তীতে রাজ্যের ভার পুত্র শ্রীনিবাসকে দিয়ে আজীবন স্বামীর সেবা করে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

টন্ডমানের পূর্বজন্ম

রঙ্গদাস নামে একজন ভক্ত তীর্থযাত্রা করতে করতে ভেঙ্কটাচলম যাচ্ছিলেন। পথে তিনি একজন বৈখানস নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিচিত হলেন। উভয়ে ভেঙ্কটাচলমে পৌঁছে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে সেখানেই থেকে সেবা করতে লাগলেন। রঙ্গদাস ফুলগাছগুলির জন্য একটি কুয়া খনন করেন। ফুলগাছগুলির জন্য খনন করা সেই কুয়োকে "ফুলের কুয়া" নামে পরিচিত করা হয়। সেই জলের সাহায্যে মল্লিকা, কন্নেরা, আজা, কুন্দা, মন্দার, মালতি, কমল, গোলাপ এবং জুঁই প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত ফুলের বাগান ও তুলসী বাগান লালন করেন। রঙ্গদাস প্রতিদিন সেই ফুলের মালা ও তুলসী মালা তৈরি করে বৈখানস ব্রাহ্মণকে দিতেন। বৈখানস ব্রাহ্মণ সেই মালাগুলি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, লক্ষ্মী দেবী এবং পদ্মাবতী দেবীকে অর্পণ করতেন।

একদিন এক গন্ধর্ব তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে বেঙ্কটাচলমে এসে পূজা করার পর পুকুরে স্নান করতে যান। রঙ্গদাস তাঁদের কামনার চোখে দেখেন, যদিও পরে নিজেকে সংযত করে ফুলের মালা প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই ঘটনার জন্য তিনি পূজা দিতে দেরি করেন। বৈখানস ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলে রঙ্গদাস কিছু বলেন না। বেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁর মায়ার প্রভাবে রঙ্গদাসের এ অবস্থা দেখে বলেন, "এই জীবনে আমার সেবা করো, পরবর্তী জন্মে রাজা হয়ে ইন্দ্রিয় ভোগ উপভোগ করো, তারপর আমার ভক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে যাবে।" এই রঙ্গদাস পরবর্তীতে চন্দ্রবংশে সুধীর আর নন্দিনীর পুত্র রাজা টন্ডমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে সেবা ও দর্শনীয় স্থান

প্রধান গোপুরম (গেট)

মন্দিরের প্রধান গোপুরামটির উচ্চতা ৫০ ফুট। এটি "পডিকাবলি," "সিংহদ্বার," এবং "মুখ্যদ্বার" নামেও পরিচিত। এই গোপুরামের বাইরের দিক থেকে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়, যাকে "মহা প্রদক্ষিণ" বলা হয়। প্রদক্ষিণের পথে দেখা যায় তিরুমালানাম্বির মন্দির (বাড়ি), অনন্তাচার্যের সমাধি, ফুলের কুয়ো, বরাহ স্বামীর মন্দির এবং স্বামীপুষ্করণী। এখানেই বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদক্ষিণ পথে প্রায় ১৬ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

এই গোপুরামের পথই বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন ও বাইরে আসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানের বিগ্রহগুলো "শঙ্খনিধি" এবং "পদ্মনিধি" নামে পরিচিত। একজন শঙ্খ ধারণ করেন, অন্যজন পদ্ম ধারণ করেন বলেই এই নাম হয়েছে। অনন্তাচার্য বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রতি নিক্ষেপ করা অস্ত্র গোপুরামের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ভক্তরা দর্শন করতে গেলে ডান দিকে "অনন্তাচার্যের অস্ত্র" লিখিত দেখতে পারেন। এটি এখনো দেখা যায়।

গোপুরামের অভ্যন্তরে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়, যা "সাম্পঙ্গি প্রদক্ষিণ" নামে পরিচিত। এখানে লাড্ডু তৈরির জন্য চিনি, ছোলা ডাল, ছোলার গুঁড়ো, গুড়, কর্পূর, চন্দন, কাজু ও কিসমিস সংরক্ষণ করা হয়। এখানেই লাড্ডু তৈরির রান্নাঘরও রয়েছে। রান্নাঘরের কাছে একটি কুয়ো রয়েছে, যেটির জল রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।
সাম্পঙ্গি প্রদক্ষিণ পথে দেখা যায় আয়নার মণ্ডপ, শ্রীরঙ্গ মণ্ডপ, তিরুমলারায় মণ্ডপ, কল্যাণ মণ্ডপ, ধ্বজস্তম্ভ ও ফুলের কুয়ো।

আয়নার মণ্ডপ (অদ্দাল মণ্ডপ)

অদ্দাল মণ্ডপে দুপুর ১২টায় শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সঙ্গে শ্রীমাল্যাপ্পা স্বামীকে দোলায় বসিয়ে দোলানো হয়। একে "দোলোৎসব" বলা হয়। দোলানোর সময় বেদ পাঠ করা হয়। এরপর চিনি, নারকেল, ঘি এবং তিল বা কাজু দিয়ে তৈরি "পঞ্চকজ্জায়ম" নামক একটি মিষ্টি পদ নিবেদন করে আরতি প্রদান করা হয়।

শ্রীরঙ্গ মণ্ডপ

মুসলিম আক্রমণের ভয়ে ১৩২০ থেকে ১৩৬০ পর্যন্ত শ্রীরঙ্গের শ্রীরঙ্গনাথন উৎসব বিগ্রহকে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে রেখে পূজা করা হয়। শ্রীরঙ্গনাথনকে পূজা করার কারণে এই মণ্ডপের নাম হয় "শ্রীরঙ্গ মণ্ডপ।" দীপাবলির সময় এক মাস ধরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব বিগ্রহ শ্রীমাল্যাপ্পা স্বামী শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ মণ্ডপে অবস্থান করে পূজার গ্রহণ করেন।

তিরুমলারায় মণ্ডপ

শ্রীরঙ্গ মণ্ডপের পাশে অবস্থিত এই মণ্ডপটি তিরুমলারায় নামে এক রাজা নির্মাণ করেছিলেন। তাই এর নাম হয় "তিরুমলারায় মণ্ডপ।" ব্রহ্মোৎসবের সময় শ্রীমাল্যাপ্পা স্বামী শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সঙ্গে এই মণ্ডপে এসে সেবা গ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ৬:৩০টা এবং সন্ধ্যা ৫:৩০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এখানে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য মঙ্গলবাদ্য বাজানো হয়।

কল্যাণ মন্ডপ

অনুবাদটি আপনার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়েছে বলে আশা করছি। যদি কোনো সংশোধন বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়, জানাবেন!*কল্যাণ মণ্ডপ প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কল্যাণোৎসব এই মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি "নিত্যকল্যাণম" নামে পরিচিত। এই মণ্ডপেই বছরে

একবার পবিত্রোৎসব, পুষ্পযাগ এবং জ্যৈষ্ঠাভিষেকমের মতো উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

ফুলের কক্ষ

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য প্রতিদিন নিবেদন করা ফুলের মালাগুলি এই কক্ষেই প্রস্তুত করা হয়। স্বামীর জন্য প্রতিদিন ১৪টি মালা নিবেদন করা হয়। সকালে নিবেদিত মালাগুলি সন্ধ্যায় সরিয়ে নতুন মালা নিবেদন করা হয়। প্রতিদিন স্বামীকে যে ১৪টি মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়:

1. মুকুট থেকে দুই বাহু পর্যন্ত সজ্জিত আট হাত মালা। 2. বাহু থেকে দুই পাশে পা পর্যন্ত ঝুলতে থাকা শালিগ্রাম মালা, যার জন্য চারহাতদুটি মালা। 3. গলায় থেকে দুই বাহুতে সজ্জিত তিন ও আধা হাত মালা। 4. স্বামীর বুকস্থানে শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর জন্য এক ও আধাহাতদুটি মালা। 5. স্বামীর হাতে থাকা শঙ্খচক্রের জন্য একহাতদুটি মালা। 6. কোমরে থাকা নন্দক খড়্গের জন্য দুইহাতমালা। 7. কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঝুলতে থাকা তিনটি দণ্ডের মাপ: তিনহাত তিন ও আধা হাত, এবং চারহাত। 8. স্বামীর পায়ের চারপাশে সজ্জিত দুই হাতের দুটি মালা। 9. গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটি মালা এবং তুলসী মালা।

প্রতিবার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় "পুষ্প" সেবার সময়, শুধুমাত্র স্বামীর অলঙ্কার সরিয়ে উপরে উল্লেখিত মালাগুলির সঙ্গে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে বিশেষ ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

এছাড়াও, এই কক্ষেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব মূর্তি এবং মন্দিরের বিভিন্ন আর্চা মূর্তির জন্য ফুলের মালা প্রস্তুত করা হয়।

চম্পা গাছ এবং তেতুল গাছ

রামানুজাচার্য এই গাছগুলিকে পূজা করেছিলেন। অনন্তাচার্য রচিত ‘শ্রী বেঙ্কটেশ্বর ইতিহাস মালা’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে

সাম্পঙ্গী গাছের ফুল বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পূজার জন্য ব্যবহার করা হতো। টন্ডমান যখন মন্দিরের প্রাকার নির্মাণ করছিলেন, বেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁকে সাম্পঙ্গী গাছ এবং চিন্তা গাছ সরিয়ে না ফেলতে বলেছিলেন। তবে যাত্রীদের ভিড়ের কারণে বর্তমানে এই গাছগুলো দেবস্থান কর্তৃপক্ষ সরিয়ে ফেলেছে। বেঙ্কটেশ্বর স্বামী বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মী দেবীকে খুঁজতে পৃথিবীতে এসে এই চিন্তা গাছের নীচে থাকা পিটে অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন।

ফুলের কুয়ো

ফুলের কুয়ো আয়নার মণ্ডপের কাছাকাছি অবস্থিত। এই কুয়োটি রঙ্গদাস দ্বারা খনন করা হয়েছিল। এই রঙ্গদাসই টন্ডমান হিসেবে জন্ম নিয়ে ফুলের কুয়োটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

ধ্বজ স্তম্ভ এবং বলি পীঠ

ধ্বজ স্তম্ভ কাঠ দিয়ে তৈরি। ধ্বজ স্তম্ভ এবং বলি পীঠে সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ধ্বজ স্তম্ভের উপর গরুড়, হনুমান, কালীয়মর্দন মূর্তি এবং শঙ্খচক্রের চিহ্ন রয়েছে। ব্রহ্মোৎসবগুলি ধ্বজারোহনের মাধ্যমে শুরু হয়। ধ্বজারোহনের দিনে গরুড়ের চিহ্নযুক্ত পতাকা ধ্বজ স্তম্ভে উত্তোলন করা হয়।

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করা নৈবেদ্যগুলি মন্দিরের চারপাশে থাকা আটটি বলি পীঠে রাখা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ধ্বজ স্তম্ভের বলি পীঠে রাখা হয়। এই বলি পীঠে দেবতাদের জন্য প্রসাদ নিবেদন করা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত ধ্বজ স্তম্ভটি ১৯৮২ সালে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৪১৭ সালের আগে ধ্বজ স্তম্ভটি বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সামনে গরুড়ের পিছনে অবস্থিত ছিল। যাত্রীদের ভিড়ের কারণে এটি সরিয়ে দ্বিতীয় গোপুরামের বাইরে স্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় গোপুরাম

দ্বিতীয় গোপুরামের অভ্যন্তরে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়। এই প্রদক্ষিণকে "বিমানের প্রদক্ষিণ" অথবা "অঙ্গ প্রদক্ষিণ"

বলা হয়। সুপ্রভাত সময়ে ভক্তরা স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করে ভেজা কাপড়েই গড়িয়ে এই পথে প্রদক্ষিণ করেন, তাই এই পথকে অঙ্গ প্রদক্ষিণ পথ বলা হয়। এই প্রদক্ষিণ পথে রয়েছে বরদারাজ স্বামী মন্দির, গরুড় মন্দির, যজ্ঞশালা, বকুল মালিকা (বকুলমাতা) মন্দির, চরণামৃত (তীর্থ) দেওয়ার স্থান, অর্থ গণনার কক্ষ (পরকমণি), চন্দনের কক্ষ, বিমানের বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন (গর্ভগৃহের উপরের বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন), তাল্লাপাক্কা অন্যামাচার্যের লেখা সংকীর্তন সংরক্ষণের কক্ষ, রামানুজাচার্যের মূর্তি, যোগ নরসিংহ স্বামীর মূর্তি, শ্রীভারি হুন্ডি, বিষ্বকসেন মন্দির এবং সোনার কুয়ো। সোনার কুয়োর কাছে অঙ্কুরার্পণ মণ্ডপ অবস্থিত। এই মণ্ডপে রয়েছে হনুমান, সুগ্রীব, বিষ্বকসেন, গরুড়, আদিশেষ এবং অঙ্গদের মতো উৎসব মূর্তি।

বরদারাজ স্বামী মন্দির

দ্বিতীয় গোপুরাম পার হয়ে বাঁদিকে বরদারাজ স্বামী মন্দির দেখা যায়। বরদারাজ স্বামীর মূর্তিটি পাঁচ ফুট উঁচু। বরদারাজ স্বামীকে প্রতিদিন তিনবার নৈবেদ্য এবং আরতি নিবেদন করা হয়। কাঞ্চিপুরমের বরদারাজ স্বামীর আবির্ভাব দিবসে বিশেষভাবে এই বরদারাজ স্বামীকে অভিষেক এবং আরতি করা হয়।

বিষ্বকসেন মন্দির

"বিষ্বকসেন মন্দিরটি" শ্রীভারি হুন্ডির কাছাকাছি অবস্থিত। বৈখানস আগম অনুসারে বিষ্বকসেন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। বৈষ্ণব কার্যক্রম এবং মন্দির রীতিতে বিষ্বকসেন সর্বপ্রথম পূজিত হন এবং উৎসবগুলিতে তাঁর শোভাযাত্রা পূর্বে হয়। বিষ্বকসেন হলেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক।

রান্নাঘর

বরদারাজস্বামীর মন্দিরের কাছে রয়েছে রান্নাঘর। এই রান্নাঘরেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য ভোজন প্রস্তুত করা হয়। এখানেই বরাহ স্বামী

এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য রান্না করে নিবেদন করার জন্য 'বকুলামাতা' মন্দিরও রয়েছে।

গরুড় মন্দির

দ্বিতীয় গোপুরটি পার হওয়ার পরেই ‘গরুড় মন্দির’ আছে। গরুড় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মুখোমুখি রয়েছেন। গরুড় ছয় ফুট উচ্চতায়, পাখা মেলে, দুই হাত জোড় করে প্রণামরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘন্টা মণ্ডপ

গরুড় এবং জয় বিজয়ের মাঝখানে অবস্থিত মণ্ডপে দুটি বড় ঘন্টা রয়েছে। তাই এই মণ্ডপকে ‘ঘন্টা মণ্ডপ’ বলা হয়। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর নৈবেদ্য নিবেদন করার সময় এই ঘন্টা বাজানো হয়। এই ঘণ্টা মণ্ডপেই প্রতিদিন ভোর তিনটায় ‘সুপ্রভাতম’ পাঠ করা হয়। সুপ্রভাতমের পরে, সেদিনের বার, তিথি, নক্ষত্র, বছর এবং হুন্ডিতে সংগৃহীত অর্থ ঘোষণা করা হয়। প্রতি বুধবার সকালে ভোগ শ্রীনিবাস, শ্রী মালয়াপ্পা স্বামী এবং বিশ্বকসেনদের ‘সহস্রকলশাভিষেক’ করা হয়। শ্রী রামনবমির দিনে সীতা, রাম ও হনুমান এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে শ্রী রুক্মিণী-কৃষ্ণের পূজা করা হয়।

জয় বিজয় এবং স্নাপন মণ্ডপ

গরুড়ের মুখোমুখি জয় ও বিজয় অবস্থান করছেন। এই জয় বিজয়ের পঞ্চধাতুর মূর্তি রামানুজাচার্য স্থাপন করেছিলেন। জয় বিজয়কে পার হওয়ার পরে ‘স্নাপন মণ্ডপ’ রয়েছে। এই মণ্ডপেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অলঙ্কার ও হুন্ডিতে সংগৃহীত অর্থ ভান্ডারে সংরক্ষিত হয়।

রামুলা বারি মেদ (রামুলা মণ্ডপ)

স্নাপন মণ্ডপের পরে যে মণ্ডপটি আসে তাকে "রামুলা বারি মেদ" বলা হয়। একসময় এই মণ্ডপে সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণের বিগ্রহ ছিল, যার কারণে এর নাম হয় "রামুলা বারি মেদ।" বর্তমানে এই সীতা-রাম বিগ্রহকে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর গর্ভগৃহে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

রামানুজাচার্য যখন তিরুপতিতে রামায়ণ তিরুমালানম্বির কাছে শুনছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ তাঁকে এই সীতা-রাম-লক্ষ্মণের বিগ্রহ উপহার দেন। রামানুজাচার্য এই বিগ্রহ তিরুমালানম্বিকে প্রদান করেন, এবং তিরুমালানম্বি এই বিগ্রহ "রামুলা বারি মেদ"-এ রেখে পূজা করতেন।

এই সীতা-রাম-লক্ষ্মণের বিগ্রহ ছাড়াও এখানে ছিল হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, আদিশেষ, গরুড় এবং বিষ্বকসেনের বিগ্রহ। এই বিগ্রহগুলি "অঙ্কুরার্পণ মণ্ডপ"-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

শয়ন মণ্ডপ

"রামুলা বারি মেদ" অতিক্রম করার পরে আসে "শয়ন মণ্ডপ।" শয়ন মণ্ডপে বৈদিক মন্ত্র এবং পুরুষসূক্ত পাঠ করা হয়। রাত্রিকালে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব বিগ্রহ ভোগ শ্রীনিবাসমূর্তিকে সোনার দোলায় শোয়ানো হয় এবং একান্ত সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নৈবেদ্য এই শয়ন মণ্ডপেই নিবেদন করা হয়। বিশেষ নৈবেদ্য গর্ভগৃহে নিবেদন করা হয়। প্রতিদিন অনুষ্ঠিত সুপ্রভাত সেবা, পুষ্পসেবা, সহস্র নামার্চনা সেবা, বুধবারের সহস্র কলশাভিষেক সেবা, বৃহস্পতিবারের তিরুপ্পাভডা সেবা, এবং শুক্রবারের অভিষেক সেবায় অংশগ্রহণকারী ভক্তদেরই শয়ন মণ্ডপ থেকে স্বামীকে দেখার সুযোগ হয়।

কুল শেখর পডি (চৌকাঠ)

শয়ন মণ্ডপ অতিক্রম করলে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর গর্ভগৃহে পৌঁছানো যায়। তবে গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হলে গোড়া পার করতে হয়। এই গোড়াকে "কুল শেখর পাটি" বলা হয়। কারণ কুল শেখর মহারাজ বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "স্বামী! আপনার সামনে চৌকাঠ থাকলে আমি আপনাকে সবসময় দেখতে পারব।" এই কারণে এই গোড়ার নাম হয়েছে "কুল শেখর পাটি।"

গর্ভগৃহ

১৩ ফুটের গর্ভগৃহে বেঙ্কটেশ্বর স্বামী শালগ্রাম মূর্তি হিসেবে ৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থান করেন। এই গর্ভগৃহে সুদর্শন, সীতা রাম লক্ষ্মণ, রুক্মিণী কৃষ্ণের উৎসব মূর্তিও রয়েছে। এছাড়া বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ৪টি উৎসব মূর্তি রয়েছে: 1. ভোগ শ্রীনিবাসমূর্তি 2. কলুভু শ্রীনিবাস মূর্তি 3. উগ্র শ্রীনিবাস মূর্তি 4. মালয়াপ্পা স্বামী এই উৎসব মূর্তিগুলিকে প্রতিদিন অভিষেক করে, পোশাক এবং ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। সেখানে শালগ্রাম এবং অখণ্ড প্রদীপও রয়েছে।

সকালে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে ফুলের মালা নিবেদন করার সময় "দিব্য প্রবন্ধ" অর্থাৎ আলভারদের কীর্তন গাওয়া হয়। দুপুরে পদ্মপুরাণের বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সহস্রনাম পাঠ করে তুলসীপাতা স্বামীর পায়ের কাছে নিবেদন করা হয়। ধনুর্মাসে তুলসীর পরিবর্তে বেলপাতা ব্যবহার করা হয়। বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে শ্রীবৈষ্ণবরা বৈখানস আগম শাস্ত্র অনুসারে পূজা করেন। গর্ভগৃহের শিখরটি গরুড় বৈকুণ্ঠ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এই শিখরটি "আনন্দ নিলয়ম" নামে পরিচিত।

দর্শন

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে প্রথমবার পৃথিবীতে দর্শন করেছিলেন গল্লবংশের সদস্যরা। তারা প্রতিদিন প্রথমে স্বামীকে দর্শন করেন। সকাল তিনটায় বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে পূজা করতে শ্রীবৈষ্ণবরা, অন্যামাচার্য বংশের সদস্যরা, মন্দিরের কর্মকর্তা এবং সেবকরা ঘণ্টা মণ্ডপে উপস্থিত হন। গল্লবংশের সদস্যরা "সোনার বাকিলি" নামক দরজার তালা খুলে দীপ জ্বালিয়ে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দর্শন করেন। পরে পূজারিরা শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিভাদি ভয়ঙ্কর অন্নন দ্বারা রচিত...

কৌসাল্য সুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কৃতব্যং দৈবমাহ্নিকম॥

“কৌশল্যা দেবীর সৎপুত্র হে রাম! পুরুষোত্তম! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে। সকালবেলার পূজা (সন্ধ্যাবন্দনা) সম্পন্ন করার জন্য উঠুন।” (১)

এই শ্লোকটি ‘বাল্মীকি রামায়ণে’ পাওয়া যায়। যখন ঋষি বিশ্বামিত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, তখন প্রথম দিনের সকালবেলায় তিনি এই শ্লোকের মাধ্যমে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছিলেন। প্রতিভাদি ভয়ঙ্কর অন্নন এই শ্লোককে তাঁর রচিত সুপ্রভাতমের (বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে জাগানোর জন্য) প্রথম শ্লোক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ উত্তিষ্ঠ গরুড়ধ্বজ।
উত্তিষ্ঠ কমলাকান্ত ত্রৈলোক্যং মঙ্গলং কুরু॥

“হে গোবিন্দ! উঠুন। গরুড়ধ্বজধারী দেব! উঠুন। হে লক্ষ্মীর প্রিয়তম! উঠুন। তিনটি জগতকে কল্যাণ করুন।” (২)

এই দ্বিতীয় শ্লোকটির মাধ্যমে নরায়ণ, বিষ্ণু অথবা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামের মতো আর্চা বিগ্রহকে মন্দিরে জাগানো হয়।

মাতঃ সমস্ত জগতাং মধুকৈটভারে
বক্ষো বিহারিণী মনোহর দিব্যমূর্তে।
শ্রীস্বামীনি শ্রীতজনপ্রিয় দানশীলে
শ্রী বেঙ্কটেশ দয়িতে তব সুপ্রভাতম॥

“সমস্ত জগতের মা, হে মধুকৈটভ শত্রুকে পরাজিত করা দেবী! বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বুকের মাঝে অবস্থানকারী, সুন্দর দিব্যমূর্তিধারী দেবী! আপনি সমস্ত ভক্তের প্রিয় এবং তাদের ইচ্ছা পূরণকারী। হে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রিয়া, লক্ষ্মী দেবী, আপনার শুভ সকাল হোক।” (৩)

তব সুপ্রভাতম অরবিন্দলোচনে
ভবতু প্রসন্ন মুখচন্দ্রমণ্ডলে।
বিধিশঙ্করেন্দ্র বনিতাভিরর্চিতে
বৃষশৈলনাথ দয়িতে দয়ানিধে॥

"কমলমুখী, চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট হে লক্ষ্মী দেবী! আপনাকে সরস্বতী, পার্বতী এবং শচী দেবী পূজা করেন। আপনি শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রিয়া এবং দয়ার সাগর। হে দেবী, পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (৪)

প্রতিভাদি ভয়ঙ্কর অন্নন এখানে শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর হৃদয়ে অবস্থানরত লক্ষ্মী দেবীকে জাগ্রত করছেন। এরপর তিনি শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে এভাবে জাগ্রত করছেন। তাঁর রচিত শ্লোকগুলোর ভাবার্থ:

"সপ্তর্ষিগণ তাঁদের সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করে, আকাশগঙ্গা থেকে পদ্ম নিয়ে এসে আপনার পাদপদ্মে পূজা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। হে শেষাচলপতি, পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (৫)

"শিব, ব্রহ্মা, কুমারস্বামী, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ আপনার বামন (নরসিংহ, রাম, কৃষ্ণ) প্রভৃতি অবতারের প্রশংসা করছেন। বৃহস্পতি আজকের তিথি-বারাদির ফলাদি পড়ছেন। হে শেষাচলপতি, পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (৬)

"আংশিক প্রস্ফুটিত পদ্ম, সুপারি এবং অন্যান্য ফুলের সুগন্ধ বাতাসে মৃদুভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। হে শ্রী বেঙ্কটেশ্বর, হে শেষাচলপতি, পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (৭)

"হে শেষশৈলপতি, মনোরম খাঁচায় থাকা পোষা টিয়াপাখিরা কিছুক্ষণ আগে পাত্রে অবশিষ্ট থাকা কলা এবং পায়েস খেয়ে মধুর সুরে গান গাইছে। হে শেষাচলপতি, পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (৮)

"ও অনন্ত! নারদ নিজ বিনার মধুর সুরে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, নৃত্য করছেন এবং মধুর ভাষায় আপনার দিব্য চরিত্র বর্ণনা করছেন। হে শেষাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (৯)

"মৌমাছিরা সরোবরের পদ্মফুলের মধু পান করে আপনাকে গুণগান করার জন্য আসছে। হে শেষাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১০)

"হে শেষাদ্রিনাথ বেঙ্কটেশ্বর! গোপ গ্রামগুলির গোপবালারা মাখন চিলাতে ব্যস্ত, এবং সেই চিলানোর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শব্দ ও প্রতিধ্বনির কারণে মনে হচ্ছে যেন মাখনের পাত্র ও দিকগুলি পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব করছে। হে দেব! হে শেষাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১১)

"সূর্যের বন্ধু পদ্মফুলের উপর থাকা ভ্রমররা নিজেদের দেহের উজ্জ্বলতায় পদ্মফুলের নীল রঙ অপহরণ করার চেষ্টা করছে, যা দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ভেরি বাজাচ্ছে। হে শেষাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১২)

"শ্রীমন্ত হে দেব! আপনি সমস্ত লোকের ইচ্ছা পূরণকারী এবং সমস্ত জগতের বন্ধু। হে শ্রীনিবাসা! আপনি লক্ষ্মী দেবীর আবাসস্থল, শোভামণ্ডিত ও দিভ্য স্বরূপধারী। হে বেঙ্কটাচলপতি! আপনি সমগ্র জগতে সমুদ্রের মতো করুণার আধার। হে বেঙ্কটেশ্বর! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৩)

"ব্রহ্মা, শিব, সনন্দন এবং আরও অনেকেই স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, যদিও দ্বাররক্ষীরা তাদের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৪)

"হে বেঙ্কটেশ্বর স্বামী! আপনার বাসস্থান এই পর্বতকে সকলে শেষশৈল, গরুড়াচল, বৃষাদ্রি, বেঙ্কটাদ্রি, নারায়ণাদ্রি, এবং বৃষভাদ্রি নামে সর্বদা ডাকেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৫)

"ঈশান, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিরৃতি, বরুণ, বায়ু এবং কুবের – এই অষ্টদিকপালরা তাদের হাত মাথার উপরে রেখে আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছেন এবং আপনার সেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৬)

"হে দেব! গরুড়, সিংহরাজ, আদিশেষ, গজেন্দ্র এবং অশ্বরাজ আপনার অনুমতি চাইছেন তাদের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৭)

"সূর্য, চন্দ্র, অঙ্গারক, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু – এই নবগ্রহরা আপনার ভক্ত, ভক্তদের ভক্ত হিসেবে রয়েছে। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৮)

"হে স্বামী! আপনার সন্নিধানে যাঁরা আপনার পাদধূলি দিয়ে তাদের মাথাকে পবিত্র করেছেন, তারা কখনো স্বর্গ বা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তারা ভাবেন, যদি এই কল্প শেষ হয় এবং পরবর্তী কল্পে আপনার সেবা করার সুযোগ না থাকে! হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (১৯)

"স্বর্গ বা মোক্ষের পথে যাত্রা করা ব্যক্তিরা আপনার মন্দির, গোপুর এবং শিখর দেখে আনন্দে ভাসেন এবং স্বর্গ বা মোক্ষ ভুলে আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২০)

"হে দেবাদিদেব! আপনি শ্রীদেবী ও ভুমিদেবীর স্বামী। আপনি দয়া প্রভৃতি গুণের সমুদ্র। আপনি সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়দাতা।

অনন্ত এবং গরুড় আপনার পাদসেবা করছেন। হে স্বামী বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২১)

"হে বেঙ্কটেশ্বর! আপনার নাভি পদ্মের মতো। আপনি পুরুষোত্তম, বাসুদেব, বৈকুণ্ঠ, মাধব। আপনি জনতাকে রক্ষা করেন। আপনার হাতে চক্র আছে। আপনি শ্রীবৎস চিহ্নধারী। আশ্রিতদের আপনি কাল্পবৃক্ষের মতো রক্ষা করেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২২)

"কামদেবের অহংকার নষ্টকারী ঐশ্বরিক সুন্দর শরীরধারী হে দেব! আপনার দৃষ্টি কমলকুঁড়ির মতো তরুণীর বক্ষের ওপর ঘুরছে। আপনি গৌরবমণ্ডিত। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২৩)*

"হে বেঙ্কটেশ্বর! আপনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং কল্কি রূপ ধারণ করেছেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২৪)

"হে বেঙ্কটেশ্বর! বৈদিক ভক্তরা পচাকর্পূর, এলাচ এবং সুগন্ধযুক্ত গঙ্গার জল সোনা দিয়ে তৈরি কলসিতে পূর্ণ করে আপনার সেবার জন্য আনন্দের সাথে অপেক্ষা করছেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২৫)

"হে দেব! সূর্য উদিত হচ্ছে। পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে। পাখিরা তাদের কলরব দিয়ে চারদিক মুখরিত করছে। শ্রীবৈষ্ণবরা শুভ মুহূর্ত কামনা করে আপনার সন্নিধিতে অপেক্ষা করছেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২৬) "হে দেব! ব্রহ্মা সহ দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, সনন্দনসহ সাধুজন এবং যোগীরা উপযুক্ত মঙ্গলের সামগ্রী হাতে নিয়ে আপনার সন্নিধিতে উপস্থিত হয়েছেন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২৭)

"হে দেব! আপনি লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল। আপনি সদগুণের মহাসাগর। সংসার সাগর পার করার জন্য উপযুক্ত সেতু। আপনি বেদান্ত দ্বারা উপলব্ধ গৌরবমণ্ডিত। আপনি ভক্তদের অধীন। হে বেঙ্কটাচলপতি! পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, জাগ্রত হোন।" (২৮)

"যে সকল মানুষ সূর্যোদয়ের সময় প্রতিদিন ভক্তিভরে এই সুপ্রভাত স্তোত্র পাঠ করেন, তারা বেঙ্কটেশ্বর স্মরণে সহজে মোক্ষ লাভ করেন।" (২৯)

শ্রী বেঙ্কটেশ্বরের পাদপদ্মে মাথা রেখে সুপ্রভাত পাঠ করে তাকে প্রণাম জানানো হয়। এরপর ভোগ শ্রীনিবাসমূর্তিকে সোনার দোলায় ঘুম থেকে জাগিয়ে তার পাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর বেঙ্কটেশ্বরকে দাঁত মাজার জন্য সাহায্য করা হয়, গঙ্গাজল পান করানো হয় এবং গরুর দুধ নিবেদন করে আরতি প্রদান করা হয়। পরে সোনার দরজা সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয়। তখন বাইরে সুপ্রভাত পাঠ করা পূজারি, টিকেট গ্রহণকারী ভক্ত এবং অন্যামাচার্য বংশের সদস্যরা বেঙ্কটেশ্বর দর্শন করেন।

বৃহস্পতিবার, বেঙ্কটেশ্বরকে কোনো ফুলের মালা, অলঙ্কার বা বড় তিলক ছাড়া কেবল ধুতি এবং উত্তরীয় দিয়ে সাজানো হয়। এই সাজসজ্জাকে "গোপাল বেশ" বলা হয়।

শুক্রবার "নেত্রোৎসব দর্শন" করার সময় অন্যামাচার্য শ্রী বেঙ্কটেশ্বরকে স্তুতি করেন: "শুক্রবার সকালে, আমি আলমেলু মঙ্গাকে বুকধারণকারী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দেখেছি। তাকে অলঙ্কার ছাড়া ধুতি এবং উত্তরীয়ে সুসজ্জিত অবস্থায় অনুপম রূপে দেখেছি," বলে তার কীর্তন পরিবেশন করেন।

অভিষেক

তিরুমালানাম্বি বংশের সদস্যরা আকাশগঙ্গা তীর্থ থেকে সংগ্রহ করা পবিত্র জলের মাধ্যমে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের উৎসব বিগ্রহগুলিকে অভিষেক করেন। এরপর তাদেরকে পোশাক এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করেন। প্রতিটি শুক্রবার বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে অভিষেক করার জন্য খাওয়ারকর্পূর, পনগু, চন্দন, জব্বাদি প্রভৃতি সুগন্ধী উপাদানের সাথে জল ব্যবহার করা হয়। বুকের অংশে অবস্থান করা লক্ষ্মীদেবীর জন্য হলুদও ব্যবহার করা হয়। এরপর ষোলো তোলার খাওয়ার কর্পূর এবং দেড় তোলার কস্তুরী দিয়ে তিলক তৈরি করা হয়। তাঁকে চব্বিশ হাত দৈর্ঘ্য এবং চার হাতের প্রস্থের রেশমি ধুতি, বারো হাতের দৈর্ঘ্য এবং দুই হাতের প্রস্থের রেশমি উত্তরীয়া দিয়ে সাজানো হয়। তাঁকে চৌদ্দটি ফুলের মালা, তুলসীমালা এবং ঊনচল্লিশটি অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত করা হয়। তারপর বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সহস্রনাম পাঠ করে তুলসীপাতা পায়ের কাছে নিবেদন করা হয়।

শয়ন আরতি

তারিগোণ্ডা ভেঙ্কমাম্বা বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে রাতে মন্দির বন্ধ করার সময় আরতি দিতেন। আজও একইভাবে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে আরতি দেওয়া হয় এবং ভোগ শ্রীনিবাসমূর্তিকে সোনার দোলায় শয়ন করানো হয়। অন্নামাচার্য একান্ত সেবার সময় অনেক কীর্তন গেয়েছিলেন। তার মধ্যে দুটি কীর্তনের ভাবার্থ নিম্নরূপ:

“কখনো শেষ না হওয়া আনন্দ দানকারী হে মুকুন্দ! গোবিন্দ! এখানে এসো! কামদেব পরাজিতকারী, তোমার জন্য সোনার পাত্রে দুধ এনে রেখেছি। এখানে এসো! গোপিকারা বলছেন তুমি একজন চোর। এখানে আমার সামনে নৃত্য করো! দেবকীর পুত্র হয়ে তুমি গর্ভর্ধন পাহাড়কে ছাতা হিসেবে উত্তোলন করেছিলে। তুমি কংসের অহংকারকে চূর্ণ করে মথুরাকে জয় করেছ। দৃঢ়চিত্তে ঘুরে বেড়ানো হে মুকুন্দ! এসো। সমস্ত ঐশ্বর্যের দাতা হে মদনগোপাল! তোমার মঙ্গল হোক।” "হে বেঙ্কটরমণা! ষোলো হাজার গোপিকারা তাদের

মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে দেখছে এবং দোলনা দোলাচ্ছে। ভুবন-বিখ্যাত গোপরক্ষক, হে অচ্যুত! অনন্ত! আপনি সোনার প্রাসাদে শয়ন করুন। ভক্তরা আপনাকে স্তুতি করছেন। শ্রীদেবী এবং ভুমিদেবী আপনার পদ সেবা করছেন। এখন স্বস্তি নিয়ে ঘুমান।"

নৈবেদ্য (ভোগ)

সুপ্রভাত সময়ে স্বামীকে মাখন, দুধ এবং চিনি নিবেদন করা হয়। সুপ্রভাত সেবার পরে গুড় মিশ্রিত তিলের গুঁড়া নিবেদন করা হয়। এরপর সহস্রনামার্চনার পরে পুলিওরা, পংগলি, চিনি পংগলি, লাড্ডু, বড়া এবং আপ্পালু নিবেদন করা হয়। এই সময়ে টক দইয়ের ভাত ভাঙা মাটির পাত্রে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পদতলে নিবেদন করা হয়।

দুপুরে অষ্টোত্তর শতনামার্চনার পরে পুলিওরা, পংগলি, টক দইয়ের ভাত, চিনি পংগলি, লাড্ডু, বড়া, আপ্পালু, শুদ্ধ ভাত, রান্না ভাত, সিরা, পায়েস, কেশরিভাত, ক্ষীর এবং কদম্ব নামক পদ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় অষ্টোত্তর শতনামার্চনার পরে চিনি পংগলি, পংগলি, পুলিওরা এবং কদম্ব নিবেদন করা হয়। একান্ত সেবার পরে দুধ, ফল, খেজুর এবং চিনি মিশ্রিত শুকনো ফলের নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।
উৎসব এবং শোভাযাত্রায় আরও নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। বিশেষ পূজার সময় বিশেষ নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যার অষ্টোত্তর শতনামার্চনার সময় নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণের নামগুলো উচ্চারিত হয়: ওঁ দেবকী গর্ভ সম্ভূতায় নমঃ, ওঁ যশোদাক্ষণ ললিতায় নমঃ, ওঁ বসুদেব কৃত স্তোত্রায় নমঃ, ওঁ নন্দ গোপমনোহরায় নমঃ, ওঁ নীলকুন্তলায় নমঃ, ওঁ তৃণাবর্ত বিনাশায় নমঃ, ওঁ গর্গ রোহিত নামাঙ্কিতায় নমঃ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ গোপিকাস্তন্যপায়িনে নমঃ, ওঁ বলভদ্রানুজায় নমঃ, ওঁ বাত্সজিত নমঃ, ওঁ নবনীতাপহর্ত্রে নমঃ, ওঁ বাত্সান্তকায় নমঃ, ওঁ বকদ্বেষিণে

নমঃ, ওঁ মহাজগর চণ্ডাগ্নয়ে নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ কৃষ্ণ সখায় নমঃ।

গোল্লগণ (গোয়ালা সম্প্রদায়)

যারা বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে প্রথমবার পৃথিবীতে দর্শন করেছিলেন সেই গোপাল সম্প্রদায়ের সদস্যরা এখনও প্রতিদিন সকালে প্রথমে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দর্শন করেন। তারা পূজারিদের মন্দিরে আনতে সাহায্য করেন। যখন উৎসবের মূর্তিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় বা বাইরে থেকে মন্দিরে আনা হয়, তখন তারা "শ্রীবাড়ির পথে ছাড় দিন" বলে প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেন।

রামানুজাচার্যের মূর্তি

রামানুজাচার্য শ্রীরঙ্গমে "জীবসমাধি" গ্রহণ করেন। এই সংবাদ শুনে অনন্তাচার্য অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন। সেই শোকের কারণে তিনি বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য ফুলের সেবা করেননি এবং স্বামীর দর্শনেও যাননি। বেঙ্কটেশ্বর স্বামী নিজে অনন্তাচার্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন ফুলমালা ও তুলসীমালা তৈরি করছ না? আমার দর্শনেও কেন আসছ না?" অনন্তাচার্য বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে জানান, "আমাদের গুরুদেব রামানুজাচার্য বৈকুণ্ঠে চলে গেছেন। সেই বেদনায় আমি আপনার সেবা করতে পারিনি।"

বেঙ্কটেশ্বর স্বামী বলেন, "আমার ভক্তরা তাদের ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করেন। তেমনই রামানুজাচার্যও তার ইচ্ছায় শরীর ত্যাগ করেছেন। রামানুজাচার্য শুধু তোমার গুরু নন, আমারও গুরু। তিনি আমাকে শঙ্খ এবং চক্র ধারণ করিয়েছেন। রামানুজাচার্য বৈকুণ্ঠে গেছেন বলে তুমি যতটা দুঃখ পেয়েছ, আমিও ততটাই দুঃখ পেয়েছি। তুমি রামানুজাচার্যের একটি মূর্তি তৈরি করিয়েছ। যদি তুমি সেই মূর্তিটি আমাকে দাও, আমি তা আমার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব।"

এরপর অনন্তাচার্য সেই মূর্তি নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মত হন। বেঙ্কটেশ্বর স্বামী স্বপ্নে সেই অঞ্চলের রাজাকে নির্দেশ দেন যে

অনন্তাচার্যের কাছে থাকা রামানুজাচার্যের মূর্তি মন্দিরের হুন্ডির সামনে স্থাপন করতে। রাজা সেই নির্দেশ পালন করেন। আজও রামানুজাচার্যের মূর্তি মন্দিরের হুন্ডির সামনে দর্শন করা যায়। এই মূর্তির ভঙ্গি এমন যে তিনি "ভাষ্য" লিখছেন বলে মনে হয়। তাই এই রামানুজাচার্যকে "ভাষ্যকার" বলা হয়। অন্নামাচার্য এই রামানুজাচার্যকে এইভাবে প্রশংসা করেছেন:

“এই ভাষ্যকার আমাদের মতো মূর্খদের আচার্য পদ দিয়ে মহৎ করেছেন। হারানো বেদগুলি ব্রহ্মাকে ফেরত দেওয়া শ্রীহরির করুণায় সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে এই ভাষ্যকার কলিযুগে জন্মগ্রহণ করে সেই জ্ঞান সর্বত্র প্রচার করেছেন। “যখন সমগ্র পৃথিবী জলে ডুবে যায়, তখন দেবতাদের আশ্রয় প্রদান করে নবজাতক শিশুর রূপে একটি অশ্বত্থ গাছের পাতায় ভাসমান আদিনারায়ণের করুণায় এই ভাষ্যকার মিথ্যা ধর্মগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। “কোমল পদ্মের মতো হাতে প্রসারিত হয়ে নিজের পায়ের দিকে নির্দেশ করে মুক্তির পথ দেখানো বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর করুণায় এই ভাষ্যকার জন্মগ্রহণ করেছেন। নারায়ণ মন্ত্রের প্রভাবে এই ভাষ্যকার আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।”

শ্রী যোগ নরসিংহস্বামী

যোগ নরসিংহস্বামীর মূর্তি রামানুজাচার্যের মূর্তির পাশে অবস্থিত। তিরুমাল পাহাড়ে থাকা এই যোগ নরসিংহস্বামীকে রামানুজাচার্য মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। এক নরসিংহ চতুর্দশীতে যোগ নরসিংহস্বামীর আর্চা মূর্তির বিষয়ে অন্নামাচার্য এইভাবে প্রশংসা করেছেন:

“নরহরি সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস লক্ষ্মীদেবীকে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে দর্শন দিচ্ছেন এবং সুন্দরভাবে হাসছেন। তিনি পদ্মের ওপর শোভিত শেষনাগের ওপর অবস্থান করছেন এবং যারা তার আশ্রয় নিয়েছেন তাদেরকে বর দান করছেন।

“শেষনাগের গদি এবং সোনার প্রাসাদে অবস্থানকারী নরহরি অপ্সরাদের নৃত্য উপভোগ করছেন। মূল্যবান অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে এবং রাজকীয় জাঁকজমক প্রদর্শন করে, লক্ষ্মী নরসিংহ আমাদের নিকটেই অবস্থান করছেন। “নরসিংহস্বামী লক্ষ্মীদেবীকে তার বাঁ কোলের ওপর বসিয়েছেন। তার ভঙ্গিমা অত্যন্ত অনন্য। তিনি সোনার চুড়ি দিয়ে সজ্জিত, একটি পা নিচে প্রসারিত এবং অন্যটি মোড়ানো অবস্থায় পূজা গ্রহণ করছেন। এই লক্ষ্মী নরসিংহ তিরুমালার শ্রী বেঙ্কটাদ্রি এবং আহোবিল ক্ষেত্রের মতো স্থানে উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত।”

কটাহ তীর্থ মহাত্ম্য

কটাহ তীর্থ হুন্ডির সামনে অবস্থিত। বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে অভিষেক করার পর ব্যবহৃত জল একটি কূপে প্রবেশ করে, যাকে "কটাহ তীর্থ" বলা হয়। “কটাহ তীর্থের মাহাত্ম্য শুধু শিবই জানেন। গঙ্গা, যমুনার মতো সমস্ত তীর্থ এই কটাহ তীর্থে এসে সেবা করে। এই তীর্থে স্নান করলে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয় এবং মোক্ষ লাভ হয়,” সুত গোস্বামী মুনিদের এইভাবে বলেছেন।

তুঙ্গভদ্র নদীর তীরে বসবাসকারী পদ্মনাভের এক পুত্র ছিল কেশব। কেশব মদ্যপান, মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার এবং জুয়া প্রভৃতি অপকর্মে মগ্ন থাকতেন। একদিন তিনি সম্পদের জন্য এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন। ফলে কেশব ব্রহ্মহত্যার পাপে আক্রান্ত হন। কেশব তার পিতা পদ্মনাভের কাছে গিয়ে নিজের পরিস্থিতি জানিয়ে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। পদ্মনাভ ভরদ্বাজ মুনির কাছে গিয়ে তার পুত্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুনি বলেন, “সুবর্ণমুখারি নদীর তীরে অবস্থিত তিরুমালার কটাহ তীর্থে তোমার পুত্রকে স্নান করাও।” পদ্মনাভ সেই নির্দেশ পালন করেন এবং তার পুত্রকে পাপ থেকে মুক্ত করেন।
উপরোক্ত উপ-মন্দিরগুলি ছাড়াও শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে আরও অনেক উপ-মন্দির রয়েছে।

৪. শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী উৎসব

বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে বছরে মোট ৪৩৩টি উৎসব পালন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান উৎসবগুলি হল: নিত্য কল্যাণম, বিশেষ পূজা, অষ্টদল পাদ পদ্মারাধনা, সহস্র কলশাভিষেকম, তিরুপ্পাভড় সেবা, পুষ্পালঙ্কার সেবা, শুক্রবার অভিষেকম, আকাশগঙ্গা তীর্থে অভিষেকম, নিঝপাদ দর্শনম, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, শ্রীরাম নবমী, বরাহ দ্বাদশী, বরদারাজ স্বামীর আবির্ভাব, ব্রহ্মোৎসবম, ডোলোৎসবম, সহস্র দীপালংকরনা, রথ সপ্তমী, বৈকুণ্ঠ একাদশী, পুষ্প যজ্ঞম, পদ্মাবতী পরিণয়ম, পবিত্রোৎসবম, উঞ্জাল সেবা, জ্যৈষ্ঠাভিষেকম, বসন্তোৎসবম, অভিদেয়া অভিষেকম, পুপ্পি পাল্লাড়ি, কোইল আল্বর তিরুমাঞ্জনম, পুরাভিষেকম এবং তেপ্পোৎসবম। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

জ্যৈষ্ঠাভিষেকম

গ্রীষ্মের তাপ প্রশমিত করতে এবং আগামী ঋতুতে ভালো বৃষ্টি কামনা করে বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে জ্যৈষ্ঠ নক্ষত্রের শেষের সময় একটি বিশেষ অভিষেক করা হয়। এই অভিষেক ১০৮টি কলস জলের সাহায্যে দিনে তিন ঘণ্টা করে তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে হওয়ায় একে "জ্যৈষ্ঠাভিষেক" বলা হয়। অভিষেক শেষে, ভগবানকে সজ্জিত করে মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়।

বসন্তোৎসবম

বসন্ত ঋতুতে শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সঙ্গে শ্রী মালয়াপ্পস্বামীর উদ্দেশ্যে যে উৎসব পালন করা হয় তাকে "বসন্তোৎসবম" বলা হয়। গ্রীষ্মের গরম প্রশমনে এই উৎসব আয়োজিত হয়, এজন্য এটিকে "উপশমনোৎসবম"ও বলা হয়। এই উৎসবে সুগন্ধি ফুল ও বিভিন্ন মিষ্টি ফল ভগবানকে নিবেদন করা হয়। আন্নমাচার্য বসন্তোৎসবম সম্পর্কে বলেন:

ওই তীর্থপথগুলো চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। শীতল বাতাস ছাড়াই ফুল বর্ষণ করা হচ্ছে। কেউ নাচছে, কেউ কেউ মিষ্টি সুরে গান করছে। তারপর স্বামী হালকা খাবার গ্রহণ করে তাম্বুল গ্রহণ করে এবং দেবী চন্দনের মস্তক জলে দেবীর সুগন্ধি গ্রহণ করে। এইভাবে, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর এত সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে বসন্ত উপভোগ করছেন, তাই তাদের মধ্যে প্রেম জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক এইভাবে, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর আলামেমাঙ্গা (লক্ষ্মী দেবী) এর সাথে বসন্ত উৎসব উদযাপন করছেন!

বিশেষ পূজা

প্রতি সোমবার সকাল ৬টায় সম্পন্ন হওয়া এই পূজা "বিশেষ পূজা" নামে পরিচিত। এটি কল্যাণ মণ্ডপে শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীসহ শ্রী মালয়াপ্পস্বামীকে উৎসর্গ করা হয়।

সহস্র কলশাভিষেক

প্রতি বুধবার সকাল ৬টায় তিরুমালার স্বর্ণ গেটের সামনে অনুষ্ঠিত হয় এই সেবা। এতে শ্রী মালয়াপ্পস্বামী, শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মূর্তিকে পঞ্চামৃত ও ১০০০ পাত্র জলের মাধ্যমে অভিষেক করা হয়। এটি "সহস্র কলশাভিষেকম" নামে পরিচিত।

তিরুপ্পাভড় বা অন্নকূটোৎসব সেবা

তিরুপ্পাভাড বা অন্নকূটোৎসব সেবা প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় মূল বিগ্রহের সমস্ত গহনা অপসারণ করা হয় এবং পাতলা তিলক দিয়ে ভগবানের চোখ দৃশ্যমান করা হয়। এরপর দরজার গেটে একটি বিশাল পুলিহোড় স্তূপ (তেঁতুল-ভাত) নিবেদন করা হয়, সাথে জিলেপি, জন্তিকলু, নারকেল, চন্দন মিশ্রণ, কুমকুম, প্রদীপ ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। পরে বেদপাঠ ও শ্রীনিবাস গদ্যম পাঠ করা হয়।

পুষ্প সেবা (পূলঙ্গি সেবা)

প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় অনুষ্ঠিত এই সেবাটি একান্তে হয়। পুরোহিতরা ফুলমালার সাহায্যে ভগবানের বিগ্রহকে সাজান। সেবা শেষে ভক্তরা ফুলে সজ্জিত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করতে পারেন।

অষ্টদল পাদ পদ্মারাধনা সেবা

১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সেবা প্রতি মঙ্গলবার সকাল ৯:৩০-এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০৮টি অষ্টদলযুক্ত সোনার পদ্মফুল দিয়ে ভগবানের আরাধনা করা হয়, যেগুলি মূল্যবান রত্ন দ্বারা সজ্জিত থাকে।

তেপ্পোৎসবম

(নৌকা উৎসব) প্রতি বছর পাঁচ দিন ধরে স্বামিপুষ্করিণীতে নৌকায় উত্সব হয়। একে 'তেপ্পোৎসব' বলা হয়। প্রথম দিন একাদশীতে সীতারামলক্ষ্মণ, দ্বিতীয় দিন দ্বাদশীতে রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণ, শেষ তিন দিন শ্রীদেবী-ভূদেবীসহ শ্রী মালয়াপ্প স্বামি তেপ্পোৎসবে বিহার করেন। অন্নমাচার্য এই তেপ্পোৎসব সম্পর্কে অনেক কীর্তন গেয়েছেন। তার মধ্যে একটি কীর্তনের ভাবার্থ:

"আপনার জন্য নানা ধরণের তেপ্পোৎসব হয়েছে। কোনটি আপনার প্রিয়? দুধসমুদ্রে সাপকে নৌকা বানিয়ে তীর্থ পালন করেছিলেন। প্রলয়ে সমুদ্রে মহুয়ার পাতায় ভেসেছিলেন। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে মন্দার পর্বতকে ভাসিয়েছিলেন। যমুনায় কালীয় নাগের ফণায় নেচেছিলেন। ষোলো হাজার নারীর ঘামের নৌকায় ভেসেছিলেন। আজ পুষ্করিণীতে তেপ্পতীর্থ করছেন। এর মধ্যে কোনটি আপনার প্রিয়, প্রভু?"

ব্রহ্মোৎসবম

ব্রহ্মা দেবতা দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ভেঙ্কটাচল পর্বতে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এই উৎসবগুলিকে "ব্রহ্মোৎসব" বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর

স্বামীর মন্দিরে একটি দীপ প্রজ্বলন করেছিলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেই দীপটি কখনও নিভে যায়নি, তাই তাকে "অখণ্ডদীপ" বলা হয়। শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসববিগ্রহ শ্রী মালয়াপ্প স্বামী, শ্রীদেবী ও ভূদেবীরসহ, বিভিন্ন বাহনে শোভাযাত্রা করেন যেমন শেষনাগ বাহন, হংস বাহন, সিংহ বাহন, মুক্তার পালকি বাহন, সর্বভূপাল বাহন, গরুড় বাহন, হনুমান বাহন, গজ বাহন, সূর্যপ্রভা বাহন, চন্দ্রপ্রভা বাহন ও অশ্ব বাহন। শেষ দিনে সুদর্শন চক্রকে স্বামি পুষ্করিণীতে স্নান করানো হয়, একে "চক্রস্নান" বলা হয়। ব্রহ্মোৎসবের প্রতিদিন শোভাযাত্রার আগে শ্রী মালয়াপ্প স্বামী ও শ্রীদেবী-ভূদেবীর চেয়ে আগে সুদর্শনের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রহ্মোৎসব সম্পর্কে আন্নামাচার্য এইভাবে কীর্তন করেছেন:

"রাস্তা জুড়ে উৎসাহে ভাসছেন ভেঙ্কটেশ্বর। আনন্দের সঙ্গে মাথা নত করুন। গরুড়ধ্বজ সহ একটি স্বর্ণরথে শ্রী হরি শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সঙ্গে অবস্থান করছেন। জনসাধারণ, রথের দড়ি ধরে এগিয়ে যান। অপ্সরারা নাচছে, গন্ধর্বরা গান গাইছে। প্রধান সেনাপতি বিষ্বক্সেন উপস্থিত হয়েছেন। জনসাধারণ, দেখুন! শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের শীর্ষ শোভা দেখুন। ওহ জনসাধারণ, 'গোবিন্দ' নামে প্রভুকে স্মরণ করুন।"

"ব্রহ্মোৎসবম বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয়। চারিদিক থেকে ভক্তরা বৃষ্টিতে আসেন। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ দূর-দূরান্ত থেকে এই যাত্রাকে এক প্রকার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। গাঁটরি, ব্যাগ, মাথার বোঝা, সুন্দর গয়না, হাতি, ঘোড়া এবং স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আগমন ঘটে। রাজা, জেলা প্রধান, জগতের শাসক এবং বুদ্ধিজীবীরা সম্পদসহ ভেঙ্কটেশ্বরের দর্শনে বৃষ্টি উপেক্ষা করে আসেন।"

"অপ্সরারা আনন্দে নৃত্য ও সঙ্গীত করছেন। গরুড় বাহনে সোনার রথে শোভাযাত্রা করছেন প্রভু। দেবতা ও মুনিরা সস্নেহে মাথা নত করছেন। পৃথিবীর ভার বহনকারী হরি ইন্দ্রের রথে দিক দখল করছেন। শেঠা, ব্রহ্মা-শিব প্রভুকে সেবা করছেন। আলমেলুমঙ্গার

সঙ্গে ভেঙ্কটেশ্বর রথে আসছেন এবং নারদাদি মুনি প্রভুকে স্তব করছেন।”

“কত বাহনে চড়া শিখেছেন, হে প্রভু!” সেজন্যই আপনার প্রশংসা করছি। পারিজাত অপহরণের জন্য গরুড়ে আরোহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ নারীদের উদ্ধার করতে রথে আরোহণ করেছিলেন। সীতা দেবীর সঙ্গে অযোধ্যা ফিরে আসার সময় কুবেরের পুষ্পক বিমানে আরোহণ করেছিলেন। বানর সেনাপতিদের সম্মুখে হনুমানের ওপর আরোহণ করে রাবণের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। কল্কি অবতারে অন্ধকার দূর করতে ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন। আর এখন ভেঙ্কটাদ্রি পাহাড়ে পালকিতে আরোহন করেছেন।”

“ভক্তদের ইচ্ছা পূরণে দেবদেবতা ঐশ্বরিক রথে আরোহণ করেছেন। ব্রাহ্মণপুত্রদের বাঁচাতে সেদিন রূপোর রথে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। রাম রূপে রেগে দেবেন্দ্রর রথে রাবণের প্রতি আঘাত করেছিলেন। দিক অন্বেষণ করে সীতার সঙ্গে পুষ্পক রথে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। বিষ্ণু রথে আরোহণ করে আকাশ কাঁপিয়ে নারকাসুরের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। শত্রুদের পরাজিত করে রুক্মিণীর সঙ্গে কন্যার রথে আরোহণ করেছিলেন। ভেঙ্কটগিরিতে ভেঙ্কটেশ্বর আলমেলুমঙ্গার সঙ্গে রথে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন।”

“ব্রহ্মোৎসবমে প্রভু প্রথমে বড় আদিশেষ বাহনে শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সঙ্গে আসেন। দ্বিতীয় দিন সকালে ছোট আদিশেষ বাহনে আসেন। হাজার ফণাযুক্ত আদিশেষের মাথাগুলি হীরার মতো ঝলমল করে। আদিশেষ তার ফণাগুলির উপর মাণিক্য ধারণ করে হরিকে ছায়া প্রদান করেন। আদিশেষ হাজার ফণার দুই হাজার জিহ্বা দিয়ে হরিকে স্তব করার অসীম দক্ষতা দেখান। দেবতারা যখনই প্রার্থনা করতে চান, আদিশেষের উপর শয়নরত নারায়ণের কাছে যান। দেবতারা আদিশেষকেই প্রথমে প্রণাম করেন। আদিশেষই ভেঙ্কটেশ্বর ও আলমেলুমঙ্গার জন্য শয্যাপত্র হয়েছেন।” “ধর্মকে ত্যাগ করা রাক্ষসদের সংহারে নিযুক্ত, হে চক্র! হে হরি চক্র! পাতাললোকে লুকিয়ে থাকা হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণকারী চক্র! প্রভুর হাত

ছেড়ে না দিয়ে এই জগতকে রক্ষা করো, হে চক্র! ভেঙ্কটাচলের পথের উপর আলো বিচ্ছুরিত করে ঘুরে বেড়ানো চক্র! তোমাকে আমাদের প্রণাম।"

"হরির রথের সম্মুখভাগে অলংকরণ দৃশ্যমান হচ্ছে। ওই দেখো গরুড়ধ্বজের ঘণ্টাধ্বনি, ঘূর্ণায়মান সোনালী চক্র, শুভ্র ছাতা, রথে বাঁধা তোরণ সব মিলিয়ে সেই রথসারথি। ঐশ্বর্য্যময় ঘোড়াগুলির দ্বারা টানা সেই রথটি মেরু পর্বতের মতো দীপ্তিময়। হরির রথের দুই পাশে ব্রহ্মা প্রভৃতিদেবগণ বেদ পাঠ করছেন। শ্রীহরি দীপ্তিময়ভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছেন। অপ্সরারা নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে কীর্তন করছেন। তিরু পথগুলিতে আলমেলুমঙ্গার সঙ্গে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কোটি কোটি ভক্তের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে আগমন করছেন।
সেই শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরকে প্রণাম জানাও।"

ব্রহ্ম উৎসবে আসা শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিরা খুবই ক্লান্ত। ভেঙ্কটেশ্বর তাদের বিদায় জানালেন, 'হে যম! যাও! হে দিকপালকগণ! নিজ নিজ দিকে যাও। হে নারদ, সনক, সানন্দন প্রভৃতি! যাও এবং আবার এসো। তোমরা সকলে আবার এ-কম-এর সঙ্গে সেবা করেছ এবং পরের তিথিতে। ব্রহ্ম উৎসব।

কল্যাণোৎসব

প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কল্যাণোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে "নিত্য কল্যাণম" বলা হয়। আন্নমাচার্য যখন নিত্য কল্যাণোৎসব পর্যবেক্ষণ করেন, তখন পদ্মাবতী ও ভেঙ্কটেশ্বরের বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক কীর্তন রচনা করেন। এর মধ্যে কয়েকটি কীর্তনের ভাবার্থ এই রকম:

"হে মঙ্গলকামী নারীগণ! বিভিন্ন দিক থেকে দেবতার বিবাহে আসুন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী এবং শ্রী মহালক্ষ্মীর বিবাহের শুভ মুহূর্ত আজ। দেবগণ, ভেরির শব্দ শোনা যাচ্ছে, গরুড়ধ্বজ উড়ছে। সকলেই বিবাহে অংশগ্রহণ করুন। আজ কামদেবের পিতা এবং কমলা

দেবী(পদ্মাবতী দেবী)বিবাহ। ঋষিগণ, এসে চন্দন গ্রহণ করুন। বেদ পাঠকারীগণ, আসুন। এই দম্পতি আপনাদের বর দান করবেন।”

“আলমেলুমঙ্গা ও ভেঙ্কটেশ্বর বিবাহের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। দম্পতিকে বাসিকাম(বিয়ের বিশেষ অলংকার)পরিয়ে দিন। তাদের হাতে তলম্ব্রা দিন। হে মঙ্গলময় নারীগণ, শুভময় গান গাইতে থাকুন। শুভক্ষণটি আগে থেকে জেনে নিন। দ্রুত মঙ্গলাষ্টক পাঠ করুন। বর ও কনের মধ্যে পর্দা টাঙানো, তারা একে অপরকে চোরাকাঁটায় দেখছেন। এবার পর্দা সরিয়ে দিন। উভয়ের গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধুন। দু'জনের হাতে কঙ্কণ দড়ি বাঁধুন এবং তাদের বিবাহমণ্ডপে বসিয়ে দিন। শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ও আলমেলুমঙ্গাকে আশীর্বাদ করুন।”

“বিবাহ মানেই আনন্দ ও উদ্দীপনায় পূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। এর মধ্যে তলম্ব্রার মুহূর্তটি অতুলনীয়! লাজুক কনে পিঞ্জির মধ্যে তলম্ব্রা(হলদি বালা চাল) নিয়ে একটু পাশে ফিরে হেসে ফেলেন। সুপরিচিত সেই যুবতী তার গলায় বড় মুক্তার মালা ধারণ করেছেন। তিনি তার ভবিষ্যৎ স্বামীর নাম বলতে লজ্জা পাচ্ছেন। মঙ্গলসূত্র পরিধানের সময় কনে অত্যন্ত উদ্দীপিত হন। তার মাথায় ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে। শ্রী ভেঙ্কটপতির বুকে আশ্রয় নেওয়া সেই কনে সরাসরি প্রভুর হৃদয়ে পৌঁছান।”

“হে অপ্সরাগণ, আজ আনন্দে নাচুন ও গান করুন।তাম্বুল গ্রহণ করুন। শ্রী রমণির বিবাহে পতপত করে উড়ছে গরুড়ধ্বজ। ঐ দেখুন, ঐশ্বরিক ঢোল বাজছে। দেবগণ, লক্ষ্য করুন। লক্ষ্মীবিভুর বিবাহের অঙ্কুরারোপণ(কোন শুভ কাজ করার আগে বিধি) অনুষ্ঠান চলছে। হে শ্রীবৈষ্ণবগণ, চন্দন ও অক্ষত গ্রহণ করুন। শ্রীসতী-ভেঙ্কটনাথ তলম্ব্রা গ্রহণ করেছেন। হে তীর্থযাত্রীগণ, উৎসর্গ সামগ্রী প্রদান করুন।”

“ঐশ্বরিক মহিমায় পূর্ণ দেবতার জন্য শুভ মঙ্গল কামনা।নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত ষোল হাজার যুবতীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের জন্য শুভ মঙ্গল। শীশুপালের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আশা থাকা সত্ত্বেও রুক্মিণীকে বিবাহ করা শ্রীকৃষ্ণের জন্য শুভ মঙ্গল। দেবতারা ও অসুররা যখন সমুদ্র মন্থন করছিলেন, তখন শ্রীমহালক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রী ভেঙ্কটগিরির ঐশ্বরিক প্রভুর জন্য জয় মঙ্গল, চিরকালীন শুভ মঙ্গল।”

“শুভ মুহূর্তে শ্রীপতি ও শ্রীদেবী ফুলের মালা বিনিময় করেছেন।মঙ্গলকামী নারীরা বিবাহের গান গাইতে গাইতে হরি-শ্রী বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। ঐ সময় দেবতাদের ঢোলের শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়েছে এবং বাসিকাম পরানো হয়েছে। ঋষিরা মঙ্গলাষ্টক পাঠ করছেন। বর ও কনে প্রতিযোগিতায় তলম্ব্রা অর্পণ করেছেন। দেবকন্যারা আরতি প্রদান করছেন। শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর আলমেলুমঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে সকলকে বর প্রদান করছেন।”

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী:

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের দিন রাতে, ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের উৎসব বিগ্রহকে ঘণ্টা মণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। চারপাশে পর্দা টাঙিয়ে অভিষেক ও বস্ত্রাভূষণ দ্বারা বিগ্রহকে সজ্জিত করা হয়। এই সময়ে দিব্য প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। সজ্জা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ভক্তরা রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করেন। এই সময়েই ভাগবত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের অবতার লীলাগুলি পাঠ করার পাশাপাশি নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়। নৈবেদ্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণকে আবার ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। পরদিন সকালে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের শোভাযাত্রা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে ফিরে আসে এবং নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়। দুপুরে এক পালঙ্কে শ্রীদেবী-ভূদেবীর সঙ্গে মালয়াপ্পস্বামীর শোভাযাত্রা এবং অন্য পালঙ্কে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ভেঙ্কটাচল পর্বত (তিরুমলা পাহাড়)

স্কন্দপুরাণ থেকে

ভেঙ্কটাচল পর্বতে বহু তীর্থস্থান রয়েছে।ঋষি যেমন বশিষ্ঠ, কপিল, ভরদ্বাজ, এবং গৌতমের আশ্রম এখানে অবস্থিত। ব্রহ্মা, শিব, গণেশ, কার্তিকেয়, ইন্দ্র, এবং কুবের তাদের পরিবারসহ ভেঙ্কটাচল পর্বতে অবস্থান করেন এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে পূজা ও সেবা করেন।গরুদের মধ্যে কামধেনু, নাগদের মধ্যে শেঠা, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, বর্ণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, গাছদের মধ্যে কাল্পবৃক্ষ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, আলো প্রদানকারীদের মধ্যে সূর্য, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধাতুর মধ্যে সোনা, বৈষ্ণবদের মধ্যে রুদ্র, এবং রত্নের মধ্যে কৌস্তুভম শ্রেষ্ঠ; একইভাবে পর্বতগুলির মধ্যে ভেঙ্কটাচল পর্বত শ্রেষ্ঠ।

ভেঙ্কটাচল পর্বত সাত যোগন (৯১ কিমি) দৈর্ঘ্য এবং এক যোগন (১৩ কিমি) উচ্চ। এই পর্বতের যেখান থেকেই প্রণাম করা হোক না কেন, ভক্তের পাপ ধ্বংস হয় এবং তারা কৈলাশ (স্বর্গ) লাভ করেন। এই পর্বতে ৬৬ কোটি তীর্থস্থান রয়েছে। "ভেঙ্কটাচল" নামের অর্থ পাপ দূরীকরণের পর্বত। ভেঙ্কটাচল পর্বত কৈলাশ, সমস্ত তীর্থস্থান এবং নারায়ণের সমতুল্য। অতীতে নারায়ণ এই পর্বতে বরাহ রূপ ধারণ করে অবস্থান করেন।

"দশবর্ষৈস্তু যৎপুণ্যং ক্রিয়তে তু কৃতযুগে।
ত্রেতাযামেকবর্ষেণ তত্পুণ্যং সাধ্যতে নৃভি:॥

দ্বাপরে পঞ্চমাসেন তদ্দিনেন কলৌযুগে।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং নিমিষেনিমিষে নৃণাম॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে দশ বছর ধরে পুণ্যকর্মের ফল, ত্রেতাযুগে এক বছরে, দ্বাপরযুগে পাঁচ মাসে এবং কলিযুগে পাঁচ দিনে লাভ করা যায়। কলিযুগে ভেঙ্কটাচল পর্বতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন কোটি গুণ বেশি পুণ্য প্রদান করে।

ভেঙ্কটাচল পর্বতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করলে কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থস্থানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং শিবের দর্শনের প্রয়োজনও হয় না। এই পর্বতে ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং শিব পরিবারের সঙ্গে থেকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে সেবা করেন। ভেঙ্কটাচল পর্বতের দিকে আরোহণ করার সময় প্রার্থনাটি এইভাবে হওয়া উচিত: “হে সোনার পর্বত! হে পর্বতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম! হে দেবতাদের দ্বারা পূজিত পর্বত! তোমার চূড়ায় অবস্থানরত শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনের জন্য আমি তোমার উপর আমার পদচিহ্ন রাখছি। আমাকে ক্ষমা করো।”

অঞ্জনাদ্রি

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বাস করতেন এক দম্পতি, কেশরী ও অঞ্জনা দেবী। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। সন্তান প্রাপ্তির জন্য অঞ্জনা দেবী তপস্যা করছিলেন। একদিন, মতঙ্গ মুনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার তপস্যার কারণ কী?” অঞ্জনা দেবী উত্তরে বললেন: “আমার পিতা কেশরী, যিনি একজন রাক্ষস, সন্তানের অভাবে শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন। শিব দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমার পূর্বজন্মের পাপের কারণে সন্তান হচ্ছে না। তবে, আমার জন্য করা তপস্যার ফলে তোমার এক কন্যা হবে। সেই কন্যার এক পুত্র হবে, যার খ্যাতি চোদ্দটি লোকের মধ্যে ছড়াবে।’ এই আশীর্বাদের ফলেই আমার জন্ম হয়।

“কেশরী নামক এক বানর আমার পিতার কাছে এসে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। আমার পিতা সম্মতি দিয়ে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন করেন। আমার বিবাহে পিতা এক কোটি গরু, লক্ষ হাতি, কোটি রথ, ঘোড়া, বহু অলংকার, রত্ন এবং দাসীদের উপহার হিসেবে

দেন। হে মুনিবর, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এই কিষ্কিন্ধ্য এলাকায় এসে বসবাস করি। বিবাহিত জীবনে বহু বছর কেটে গেলেও আমার সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের জন্য বহু ব্রত, যজ্ঞ এবং দান করেও কোনো ফল পাইনি। সেই কারণেই আমি সন্তান লাভের জন্য তপস্যা করছি।"

মতঙ্গ মুনির সঙ্গে অঞ্জনা দেবীর কথোপকথন: মতঙ্গ মুনি অঞ্জনা দেবীকে বললেন, "তুমি ভেঙ্কটাচল পর্বতে গিয়ে স্বামী পুষ্করণীতে ও আকাশগঙ্গা স্নান করো এবং সেই জল পান করো। এরপরে সেখানে বায়ু দেবতার জন্য তপস্যা করো। তাহলে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" অঞ্জনা দেবী মতঙ্গ মুনির কথামতো আচরণ করে আকাশগঙ্গা তীর্থে তপস্যা করলেন। তপস্যার ফলে বায়ু দেবতা তাকে দর্শন দিলেন। তিনি বর চাইতে বললে, অঞ্জনা দেবী বললেন, "আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন।" বায়ু দেবতা বললেন, "আমার দ্বারা তোমার একটি পুত্র জন্মাবে। তার খ্যাতি চোদ্দটি লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।" এইভাবে তিনি তাকে বর দিলেন।অঞ্জনা দেবী যখন কেশরীর সঙ্গে বাস করছিলেন, তখন বায়ু দেবতার আশীর্বাদে হনুমন্তের জন্ম হয়। অঞ্জনা দেবী ভেঙ্কটাচল পর্বতে তপস্যা করেছিলেন বলে ভেঙ্কটাচল পর্বতের নাম অঞ্জনাদ্রি হয়েছে।

বরাহপুরাণ থেকে দশরথ মহারাজ

দশরথ মহারাজ সন্তানের অভাবে ঋষি বশিষ্ঠর কাছে সন্তানের প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠ মুনি তাকে বললেন, "তুমি ভেঙ্কটাচল পর্বতে গিয়ে নারায়ণের জন্য তপস্যা কর।" মহারাজ বশিষ্ঠর কথামতো স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করে নারায়ণের জন্য তপস্যা করলেন। নারায়ণ তাকে দর্শন দিয়ে বললেন, "বর চাও।" মহারাজ নারায়ণকে প্রণাম করে স্তুতি করলেন এবং পুত্র সন্তান প্রার্থনা করলেন। তখন নারায়ণ বললেন, "তোমার পূর্বজন্মের পাপের ফলে তোমার সন্তান হচ্ছে না।" মহারাজ নারায়ণকে বললেন, "সূর্যের উপস্থিতিতে অন্ধকার থাকতে পারে না। তেমনি, তোমার দর্শনের পরও আমার পাপ কীভাবে থাকতে পারে?" নারায়ণ মহারাজের এই

কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন, "তুমি আমাকে দর্শন করে চারটি শ্লোকের দ্বারা স্তুতি করেছ। তার ফলে আমি তোমার চার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব এবং রাবণাসুরসহ অন্যান্য রাক্ষসদের সংহার করব।" এই বলে নারায়ণ বর প্রদান করেন।

শ্রী রাম

শ্রী রাম বনবাসকালে সীতা দেবী ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। শ্রী রাম বানরদের সঙ্গে সীতাকে খুঁজতে ভেঙ্কটাচল পর্বতে পৌঁছান এবং বিভিন্ন তীর্থে স্নান করেন। তখন অঞ্জনা দেবী এসে শ্রী রামকে অতিথি সেবা প্রদান করেন। ভেঙ্কটাচল পর্বতের ঋষিরাও শ্রী রামকে অতিথি সেবা প্রদান করেছিলেন।

বৃষভাচলম

কৃতযুগে বৃষভাসুর নামক এক অসুর দেবতাদের পরাজিত করে ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের নিপীড়িত করতে শুরু করেন। ব্রাহ্মণ, ঋষি এবং দেবতারা নারায়ণকে প্রার্থনা করেন তাদের বৃষভাসুরের থেকে রক্ষা করার জন্য। নারায়ণ তাদের প্রার্থনার গ্রহণ করে বৃষভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভেঙ্কটাচল (বৈকুণ্ঠপর্বত) গমন করেন। সুধর্শন চক্র ধারণ করে বৃষভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই সময় বৃষভাসুর নারায়ণকে বলেন, "হে নারায়ণ! আমি শুনেছি যে আপনি যেসব রাক্ষসকে সংহার করেন তারা মুক্তি লাভ করেন। আমাকেও মুক্তি প্রদান করুন এবং এই পর্বতের নাম বৃষভাচলম হিসেবে আমার নাম করুন।" নারায়ণ তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন এবং বৃষভাসুরকে সংহার করে তাকে মুক্তি প্রদান করেন।

শেষাদ্রি

একবার নারায়ণ আদিশেষকে বলেছিলেন, "তুমি পৃথিবীতে পর্বত রূপে রূপান্তরিত হলে আমি তোমার উপর বাস করব।" আদিশেষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সুবর্ণ মুখারি নদীর তীরে পর্বত রূপ ধারণ করেন।

সেই পর্বতের উপরেই নারায়ণ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামি হিসেবে প্রকাশ হন। সেই কারণেই এই পর্বতের নাম শেষাদ্রি হয়েছে।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ থেকে শেষাদ্রি

দ্বাপরযুগে নারায়ণ আদিশেষকে দ্বাররক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় বায়ু দেব নারায়ণের দর্শন করতে আসেন। আদিশেষ বায়ু দেবকে স্বর্ণের দন্ড দিয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেন। তখন বায়ু দেব বলেন, “হে নির্বোধ! আমাকে কেন আটকাচ্ছেন? আমার নারায়ণের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আমাকে দ্রুত ভিতরে যেতে দিন।” “আমি নারায়ণের আদেশ মেনে চলি। অন্য কারও আদেশ আমি মানি না। সেই জন্য আমি তোমাকে প্রবেশ করতে দিতে পারব না,” আদিশেষ বললেন। তখন বায়ু দেব তাকে বললেন, “হে নির্বোধ! দ্বাররক্ষী জয়- বিজয়রা অহংকারের কারণে ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল এবং রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রাক্ষস রূপে জন্মেছিল। এই বিষয়টি কি তুমি ভুলে গিয়েছ?”

আদিশেষ কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “বড় বড় কথা বলছ! তুমি কি জীবনের মূল্য জান? সমস্ত প্রাণী তাদের সঙ্গে থাকা মৃত্যুকে বুঝতে পারে না। তুমিও তাদের মধ্যে একজন। শক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। আমি সবসময় নারায়ণের অভ্যন্তরীণ প্রাসাদে অবস্থান করি এবং সেই কারণে আমি নারায়ণের কাছে সবার চেয়ে প্রিয়।”

বায়ু দেব উত্তর দেন, “বিড়াল বাড়ির ভিতরে ঘুরলেই কি বাইরে ঘোরাফেরা করা হাতির সমান হয়? অলংকৃত রত্নাবরণ পালঙ্কে একজন সেবক বসে রাজাকে সেবা করলেই কি সে রাজকুমারের সমান হয়ে যায়? তেমনি তুমি নারায়ণের পাশে থেকেও আমার মতো নারায়ণের কাছে প্রিয় হতে পারো না।”

এইভাবে তাদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা চলছিল। তখন নারায়ণ এসে উপস্থিত হলেন। নারায়ণের উপস্থিতি দেখেই আদিশেষ এবং বায়ু দেব

তাকে প্রণাম করেন। পরে আদিশেষ সবকিছু নারায়ণের কাছে খুলে বলেন। তখন নারায়ণ বলেন, “তোমরা দু’জনে নিজের শক্তি পরীক্ষা করো। আদিশেষ, আনন্দাদ্রি (মেরু পুত্র) নামক পর্বতকে ধারণ করো। বায়ু দেব যদি তোমাকে সরিয়ে দিতে পারে, তাহলে বায়ু দেব শক্তিশালী। আর যদি না পারে, তাহলে তুমি শক্তিশালী।”

দু’জনেই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। দেবতারা এই ঘটনা দেখার জন্য জড়ো হন। আদিশেষ আনন্দাদ্রি পর্বতকে আবৃত করেন। বায়ু দেব তার প্রবল শক্তি দিয়ে বায়ু প্রবাহিত করলেও পর্বত বা আদিশেষকে সরাতে পারেননি। প্রবল বায়ুর কারণে সমস্ত জীব ভুগতে থাকে। দেবতারা বায়ু দেবকে ক্রোধ ত্যাগ করতে এবং প্রাণীদের রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বায়ু দেব তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি।

তখন দেবতারা আদিশেষকে ক্রোধ ত্যাগ করতে
এবং প্রাণীদের রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। আদিশেষ দেবতাদের অনুরোধ শুনে তার আবরণ ছেড়ে দেন। প্রবল বায়ুতে আনন্দাদ্রি পর্বত আদিশেষসহ সুবর্ণমুখারি নদীর তীরে চলে আসে। পরে বায়ু দেব তার ভুল বুঝতে পেরে আদিশেষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। এইভাবে আনন্দাদ্রি পর্বত আদিশেষের জন্য এবং আদিশেষের অংশ থেকে জন্ম নেওয়ার কারণে এই পর্বতের নাম হয় শেষাদ্রি।

ভেঙ্কটাচল

কলিযুগে কালাহস্তি নগরে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। একদিন, মাধব দিনের বেলায় তার স্ত্রী চন্দ্রলেখার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। তখন চন্দ্রলেখা মাধবকে বললেন, *“দিনের বেলায় শুধু পশু-পাখিরা মিলিত হয়। মানুষের জন্য এটি ধর্ম-বিরোধী এবং পাপ।”এইভাবে চন্দ্রলেখা তার স্বামীর ইচ্ছা নিবৃত্ত করেন। এরপর মাধব ফল ও কন্দ সংগ্রহের জন্য বনে যান।

বনে তিনি এক বণিতাকে দেখেন। তার পরিচয় জেনে মাধব কামনার বশে তার কাছে নিজের কামনা পূরণের অনুরোধ জানান। তখন

বণিতা তাকে বললেন, *"তুমি ব্রাহ্মণ। এমন কাজের ফলে তুমি নিজ কুল থেকে পতিত হবে এবং পাপে নিমজ্জিত হবে।"তবুও মাধব নিজ কামনার বশবর্তী হয়ে তাকে বলপ্রয়োগ করেন। পরে বণিতা মাধবকে বললেন, *"তুমি ব্রাহ্মণকুল থেকে পতিত হয়েছ। তাই আমার সঙ্গে থেকে মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করে জীবন কাটাও।"মাধব এতে সম্মত হয়ে তার সঙ্গে এমন জীবনযাপন করতে শুরু করেন।মাধব এভাবে জীবনযাপন করতে করতে বারো বছর পর বণিতা মৃত্যুবরণ করেন। বণিতার মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে মাধব পাগলের মতো ঘুরতে থাকেন। কিছুদিন পরে একদল রাজা বরাহ ক্ষেত্রের (ভেঙ্কটাচল) দিকে যাত্রা করেন। মাধবও তাদের সঙ্গে যাত্রা করেন। যখন তিনি 'বৈকুণ্ঠাচলাম'-এ প্রবেশ করেন, তখন তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।তাই এই বৈকুণ্ঠ পর্বতের নাম হয় 'ভেঙ্কটাচলম'। 'ভেঙ্কট' শব্দের অর্থ পাপ নাশকারী।

ভাগবত থেকে বলরাম কথা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে সংঘর্ষ নিশ্চিত হয়েছিল। উভয় পক্ষই বলরামের সহায়তা চাইলে, বলরাম উত্তর দেন, "তোমরা দু'জনই আমার কাছে সমান। তাই তোমাদের কোনো পক্ষকে সহায়তা করতে পারব না।" যখন বলরাম জানতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে সহায়তা করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি দ্বারকায় অবস্থান না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তীর্থযাত্রার জন্য বেরিয়ে পড়েন। বলরাম কৌশিকী, সরযূ, ত্রিবেণী, গৌতমী, গান্ডাকী, বিপষা, শোনা, গোদাবরী, পাম্পা, ভীমা, সুবর্ণ মুখারী এবং ভেঙ্কটাচল পর্বতের তীর্থস্থানগুলিতে যান। তিনি সেখানে স্নান করেন এবং দেবতাদের পূজার্চনা করেন। পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের গরু ও সোনা দান করেন।

কম্ব রামায়ণ থেকে

সুগ্রীব এবং ভেঙ্কটাচলম সুগ্রীব যখন সীতাদেবীর সন্ধানে বানরসেনাকে চারটি দিকে প্রেরণ করেন, তখন বিভিন্ন পর্বতের বর্ণনা দেন। ভেঙ্কটাচলম সম্পর্কে তিনি ভানরসেনাকে এইভাবে নির্দেশ দেন:

“সুবর্ণ মুখারী নদীর তীরে ভেঙ্কটাচল পর্বত অবস্থিত। এই ভেঙ্কটাচল দর্শন করলে সমস্ত পাপ দূর হয় এবং মুক্তি লাভ হয়। এই পর্বতে নারায়ণ বসবাস করেন। ভেঙ্কটাচলমে বাস করা ভক্তরা পাপ এবং পুণ্যের ঊর্ধ্বে থাকেন। তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞানের পূর্ণতায় নারায়ণের সেবা করেন। তারা যেকোনো স্থান থেকে প্রণাম গ্রহণের যোগ্য।”সুগ্রীবের আদেশে যাত্রা শুরু হনুমানের দল ও ভেঙ্কটাচলম হনুমানের নেতৃত্বাধীন দল সীতাদেবীর সন্ধানে ভেঙ্কটাচলমে পৌঁছে। সেখানে ঋষিদের প্রণাম করেন এবং সীতাদেবীর সন্ধানে তল্লাশি চালান। কিন্তু ভেঙ্কটাচলমে সীতাদেবীর সন্ধান না পেয়ে তারা দক্ষিণ দিকে চলে যান।

আন্নামাচার্য

আন্নামাচার্য তিরুমালা পাহাড়ের মহিমা গানে প্রশংসা করেছেন। তাঁর একটি কীর্তনের ভাবার্থ এই রকম:

“তিরুমালা পাহাড় হল দশ হাজার ফণাযুক্ত আদি শেষ। এটি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছে বিস্ময়কর। এটি ঋষি এবং দেবতাদের বাসস্থান হিসেবে এক উপযুক্ত স্থান। সুবর্ণ শিখরযুক্ত ভেঙ্কটগিরিকে প্রণাম করুন। তিরুমালা ক্ষেত্রে সর্বত্র পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান। ভেঙ্কটগিরি মুক্তি প্রদান করে। ভেঙ্কটেশ্বরের বাসভূমি তিরুমালা পাহাড় স্বর্গের সমতুল্য। ভেঙ্কটাদ্রিতে প্রতিটি পথের পাশে ঋষিদের আশ্রম দেখা যায়। সর্বত্র পূজা-অর্চনার দৃশ্য। ফল প্রদানকারী গাছ রয়েছে। ভক্তগণ ভেঙ্কটেশ্বরের দর্শনের জন্য সর্বত্র উপস্থিত রয়েছেন।” ভেঙ্কটাচল পর্বতকে আন্নামাচার্য ছাড়াও বহু আচার্য প্রশংসা করেছেন। আলবাররা এই পর্বতের প্রশংসা করেছেন, যা “আলবারদের স্তোত্র” শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। (শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম থেকে তিরুমালার শীর্ষে পৌঁছাতে ২,৪০০ সিঁড়ি এবং আলিপিরি থেকে ৩,৫৫০ সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়।)

৬. তিরুমালা দর্শনীয় স্থলস

ভোগের সময় ব্যতীত তিরুমালা এবং তিরুপতির প্রায় সমস্ত মন্দির সকাল 5 টা থেকে রাত 8:30 টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

স্বামী পুষ্করণীর মাহাত্ম্য

ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের পাশে, বরাহ স্বামীর মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত একটি কুণ্ডকে "স্বামী পুষ্করণী" বলা হয়। এটি প্রায় দেড় একর আয়তনের একটি জলাশয়। বৈকুণ্ঠ একাদশীর দিন সমস্ত তীর্থ এখানে মিলিত হয় বলে একে "মুক্কোটি তীর্থম" বলা হয়। সকল পুষ্করণীর মধ্যে এটির গুরুত্ব সর্বাধিক, তাই একে "স্বামী পুষ্করণী" নামে অভিহিত করা হয়।

সরস্বতী দেবী (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে): ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবী নদীগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নদী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন সরস্বতী নদী রূপে। একবার পুলস্ত্য মুনি সেই সরস্বতী নদীর তীরে এসে তপস্যা করছিলেন। যেহেতু পুলস্ত্য মুনি তাঁর পুত্রের তুল্য, তাই সরস্বতী দেবী তাঁর কাছে গিয়ে পূজা করেননি। সরস্বতী দেবী পূজা না করায় পুলস্ত্য মুনি তা অপমানজনক মনে করে সরস্বতী দেবীকে অভিশাপ দিলেন: "তুমি যে ইচ্ছা নিয়ে নদী রূপে জন্ম নিয়েছো, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। বিষ্ণুর পদ থেকে উৎপন্ন গঙ্গা নদীই সেই খ্যাতি লাভ করবে।"

তখন সরস্বতী দেবী পাল্টা পুলস্ত্য মুনিকে অভিশাপ দিয়ে বললেন: "তুমি আমাকে অকারণে অভিশাপ দিলে, তাই আজ থেকে তোমার বংশে জন্মগ্রহণকারী সকলে রাক্ষসরূপে জন্ম নেবে।" এরপর পুলস্ত্য মুনি নিজের ভুল বুঝে সরস্বতী দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "আমার অভিশাপ মুক্তির উপায় বলে দিন।" তখন সরস্বতী দেবী বললেন: "তোমার বংশে বিষ্ণুভক্ত বিভীষণ নামে একজন জন্ম নেবে, সে তোমার কীর্তিকে বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠা করবে।"

এরপর সরস্বতী দেবী সমস্ত নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ খ্যাতি লাভের জন্য নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে তপস্যা করলেন। নারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন: "আমি পুলস্ত্য মুনির অভিশাপ উঠিয়ে নিতে পারি না, কিন্তু তোমার কাম্য বরও ফিরিয়ে দিতে পারি না। পুলস্ত্য মুনির অভিশাপ কেবলমাত্র নদীগুলির উপর প্রযোজ্য, তীর্থগুলির উপর নয়। তাই তুমি ভেঙ্কটাচল পর্বতে এক পুষ্করিণী রূপে আবির্ভূত হও। কলিযুগে আমি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী রূপে সেই পুষ্করিণীর তীরে আবির্ভূত হব। তখন ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ তীর্থ আমার দর্শনের জন্য এসে তোমার মধ্যে স্নান করবে এবং তোমার প্রশংসা গাইবে। এইভাবে তুমি সমস্ত তীর্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে খ্যাতি লাভ করবে।" এইভাবে সরস্বতী দেবী নারায়ণের নির্দেশ অনুসারে তীর্থ রূপে পরিণত হন। সেই তীর্থই আজ স্বামী পুষ্করিণী নামে প্রসিদ্ধ।

কাশ্যপের কাহিনি (স্কন্দপুরাণ থেকে): পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারী মহারাজ পরীক্ষিত ধর্মপরায়ণভাবে রাজত্ব করছিলেন। একদিন শিকারে গিয়ে একটি হরিণকে অনুসরণ করতে করতে শমীক ঋষির আশ্রমে পৌঁছান। তিনি প্রণাম করে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই পথে কি হরিণটি গেছে, স্বামী?" ঋষি ধ্যানে থাকায় উত্তর দেননি। ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত রাজা বিরক্ত হয়ে আশ্রমের পাশে মৃত একটি সাপ তুলে তার তীর দিয়ে ঋষির গলায় রেখে দেন। এই ঘটনায় ঋষিপুত্র শৃঙ্গি রাগান্বিত হয়ে রাজাকে অভিশাপ দেন: "সাত দিনের মধ্যে তক্ষক সাপের দংশনে তুমি মৃত্যুবরণ করবে।" এটা জেনে ধন্বন্তরীর শিষ্য কশ্যপ রাজাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে তক্ষক সাপ তাকে ধন প্রদান করে প্রতিরোধ করেন এবং পরে রাজাকে দংশন করে হত্যা করেন। কাশ্যপেরএই ব্যর্থতায় আত্মীয়, ব্রাহ্মণ ও বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি তীব্র দোষারোপের শিকার হন। কশ্যপ এই দোষ সহ্য করতে না পেরে তিনি শাকল্য মুনির কাছে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দেন। মুনি বলেন, "তোমার পক্ষে পরীক্ষিত মহারাজকে বাঁচানো সম্ভব ছিল।

চিকিৎসকের ধর্ম হলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগীকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। যদি কেউ লোভ বা ঈর্ষার কারণে তা না করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যার সমতুল্য পাপের ভাগীদার হয়।" কশ্যপ তার পাপ থেকে মুক্তির সমাধান জানতে চাইলে শাকল্য মুনি বললেন, "সুবর্ণমুখী নদীর তীরে ভেঙ্কটাচল পর্বতে অবস্থিত স্বামী পুষ্করিণীতে স্নান করে বরাহ স্বামী ও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন কর, তাহলে তোমার পাপ বিনষ্ট হবে।" কাশ্যপও তাই করলেন এবং তার পাপ থেকে মুক্তি পেলেন।

ধর্ম গুপ্ত কি কথা: চন্দ্রবংশীয় রাজা নন্দ তপস্যার জন্য বনে গমন করেন এবং তার পুত্র ধর্মগুপ্তকে রাজ্যের ভার দেন। একদিন ধর্মগুপ্ত শিকারে গিয়ে রাতে একটি গাছে আশ্রয় নেন, যেখানে একটি ভাল্লুক বাস করছিল। পরে একটি সিংহ এসে নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাল্লুক বলেন, "ভয় পেও না। আমি তোমাকে ক্ষতি করব না। তুমি আমার উরুতে শুয়ে রাতের প্রথম ভাগে বিশ্রাম নাও, পরে আমি বিশ্রাম নেব।" পরে সিংহ ভাল্লুককে ফুঁসলিয়ে বলে, "রাজাকে ফেলে দাও, আমি তাকে খেয়ে নেব।" ভাল্লুক জবাব দেয়, "বিশ্বাসঘাতকতার পাপ বহু যজ্ঞ করেও মোচন হয় না। আমি তা করব না।" কিন্তু যখন রাজা ঘুম থেকে উঠে সেই একই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভাল্লুককে ফেলে দেন, ভাল্লুক গাছের ডাল ধরে নিজেকে রক্ষা করে বলেন, "আমি ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, এর ফলে তুমি পাগল হয়ে পড়তে পারো।"

ভাল্লুক সিংহকে বলেন, "তুমি একসময় যক্ষ ছিলে এবং আপনি আপনার পত্নী নগ্নভাবে গৌতম ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করেছিলে, তাই ঋষির অভিশাপে তুমি সিংহে পরিণত হও।" এই কথার মাধ্যমে সিংহের অভিশাপ মোচন হয় এবং সে পুনরায় যক্ষ রূপে ফিরে আসে। যক্ষ বলেন, "তুমি আমার পূর্বজন্ম প্রকাশ করেছ বলেই আমি মুক্ত হয়েছি।" তারপর যক্ষ ভাল্লুককে প্রণাম করে তার নিজস্ব লোকালয়ে ফিরে যান।

ধর্মগুপ্ত যখন পাগল হয়ে রাজ্যজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে বনে নিয়ে গিয়ে তাঁর পিতা নন্দকে জানালেন, "আপনার

পুত্র ধর্মগুপ্ত পাগল হয়ে গিয়েছেন।” এই কথা শুনে নন্দ পুত্রকে জৈমিনি ঋষির আশ্রমে নিয়ে যান ও পাগলামির কারণ জানতে চান। জৈমিনি ঋষি তখন তাঁকে ঘটনার সমস্ত বিবরণ দেন। নন্দ জৈমিনি ঋষিকে প্রার্থনা করে বলেন, “আমার পুত্র যে পাপ করেছে এবং যে ভাল্লুকের অভিশাপে সে কষ্ট পাচ্ছে, তা দূর করার উপায় বলুন।” জৈমিনি ঋষি বলেন, “তুমি যদি ভেঙ্কটাচল পর্বতের স্বামী পুষ্করণীতে তোমার পুত্রকে স্নান করাও, তবে সে পাপ ও অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।” নন্দ তাঁর কথামতো কাজ করেন এবং পুত্রকে পুষ্করণীতে স্নান করান। ফলস্বরূপ, ধর্মগুপ্ত তাঁর পাপ ও অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

সুমতি: মহারাষ্ট্রে সুমতি নামে এক ব্রাহ্মণ খারাপ সঙ্গের প্রভাবে এক বারঙ্গনার সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি মদ্যপান ও চুরির মতো কাজেও জড়িয়ে পড়েন। একদিন ধন চুরির উদ্দেশ্যে তিনি এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন, যার ফলে তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপে দোষী হন। এই দুর্দশার কথা তিনি তাঁর পিতা যজ্ঞদেবকে জানান। যজ্ঞদেব তাঁকে দুর্বাসা মুনির কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর পুত্রকে পাপমুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করেন। দুর্বাসা মুনি বলেন, “ভেঙ্কটাচল পর্বতের স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করাও।” যজ্ঞদেব সেই পরামর্শ মেনে পুত্রকে সেখানে স্নান করান এবং সুমতি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন।

বরাহ স্বামী মন্দির

বরাহ স্বামী যখন হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, তখন ঋষিরা তাঁকে প্রার্থনা করে বলেন, “স্বামী! আপনি পৃথিবীতে অবস্থান করুন, আমাদের রক্ষা করুন এবং অন্যদেরও দর্শন দিন।” বরাহ স্বামী বলেন, “আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করব,” এবং তিনি ভেঙ্কটাচলে অবস্থান শুরু করেন।পরবর্তীতে, ভৃগু মহর্ষি নারায়ণকে পরীক্ষা করলে লক্ষ্মী দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী ছাড়া বৈকুণ্ঠে থাকতে না পেরে নারায়ণ বরাহ স্বামীর কাছে ভেঙ্কটাচলে আসেন। বরাহ স্বামী তাঁকে এই আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে নারায়ণ সব ব্যাখ্যা

করেন এবং বরাহ স্বামীর কাছে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত ভেঙ্কটাচলে থাকার অনুমতি চান।

বরাহ স্বামী বলেন, “যথাযথ মূল্য দিলে আমি তোমাকে স্থান দেব।” নারায়ণ বলেন, “এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে লক্ষ্মী অর্থাৎ ধন নেই, তাই আমি তা দিতে পারব না। তবে ভবিষ্যতে কলিযুগে যারা আমার দর্শনে আসবে, তারা তোমার প্রথম দর্শন করবে। তারা তোমার জন্য পূজা, অভিষেক এবং নৈবেদ্য প্রদান করবে। এটাই আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রাপ্য ধন।” এই প্রস্তাবে বরাহ স্বামী সম্মত হন এবং নারায়ণকে একশো হাত স্থান প্রদান করেন। (এই কারণেই আজও ভক্তরা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনের আগে বরাহ স্বামীর দর্শন করে থাকেন এবং পূজা-নৈবেদ্য নিবেদন করেন।)

স্কন্দপুরাণ থেকে: ভেঙ্কটাচল পর্বতে বাসকারী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর একনিষ্ঠ ভক্ত বাসু একদিন নারায়ণপুরের শাসক তন্ডমানের কাছে এসে বলেন “হে রাজা! একদিন একটি সাদা বরাহ (শূকর) আমার ধানের ক্ষেত ধ্বংস করছিল। আমি তাকে তাড়াতে গেলে সে স্বামী পুষ্করণীর কাছে একটি গর্তে পালিয়ে যায়। আমি সেই গর্ত খনন করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমার ছেলে ঘটনাটি দেখে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে প্রার্থনা করে। তখন সেই বরাহ আমার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমার ছেলের মাধ্যমে বলে ওঠে ‘হে নিষাদ রাজা, তুমি তন্দমানের কাছে গিয়ে বলো: হে রাজা! এই গর্তটি কালো গরুর দুধ দিয়ে অভিষেক করো। সেই গর্ত থেকে একটি সুন্দর কালো পাথর বের হবে। সেই পাথর দিয়ে আমার একটি মূর্তি তৈরি করো, যেখানে বরাহ মুখ থাকবে, আমার বাম উরুর ওপর ভূমি দেবী বসে থাকবেন এবং আমি দাঁড়িয়ে থাকব।’আমার জ্ঞান ফেরার পর আমার ছেলে সবকিছু আমাকে জানায়।”

তুমি তণ্ডমান বসুর কথা শুনে বলেন, “তুমি যেমন বলছ, আমি তেমনই করব।” এরপর তিনি মন্ত্রীকে আদেশ দেন, “আমাদের কালো গরুগুলিকে ভেঙ্কটাচলে নিয়ে যাও।” পরে তন্দমান অন্তঃপুরে রানী

এই ঘটনার কথা জানান এবং বিশ্রাম নিতে যান। সেই রাতে তন্দমান স্বপ্নে দেখেন, তার অন্তঃপুর থেকে স্বামী পুষ্করণীর একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। সকালে উঠে তিনি সত্যিই সেই সুড়ঙ্গটি আবিষ্কার করেন। তিনি সেই পথ ধরে স্বামী পুষ্করণীতে পৌঁছে বরাহ স্বামীর নির্দেশমতো কালো গরুর দুধ দিয়ে গর্তটি অভিষেক করেন। তখন সেই গর্ত থেকে একটি সুন্দর কালো পাথর বের হয়, যার দ্বারা বরাহ স্বামীর সঙ্গে ভূমি দেবীর মূর্তি তৈরি করে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০০ সালে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের মহন্ত প্রয়াগদাস ক্ষতিগ্রস্ত বরাহ স্বামীর মন্দিরটি পুনরুদ্ধার করেন। বর্তমানে এই মন্দিরে মূল মূর্তি, ভূমি দেবীর সঙ্গে বরাহ স্বামীর অর্চা মূর্তি, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অর্চা মূর্তি এবং শালগ্রাম শিলা বর্তমান। ব্রহ্মোৎসবের শেষ দিনে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁর পত্নী শ্রীদেবী এবং ভূমি দেবীর সঙ্গে বরাহ স্বামীর দর্শনে যান।

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দির

(ভবিষ্যোত্তর পুরাণ থেকে): পদ্মাবতী দেবীর সঙ্গে বিবাহের পর ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী কয়েকদিন অগস্ত্য মুনির আশ্রমে অবস্থান করেন। একদিন তন্দমান সেখানে গিয়ে প্রণাম করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁকে আলিঙ্গন করে আগমনের কারণ জানতে চান। তন্দমান বলেন, "হে স্বামী! আপনার দর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। আপনি যোগীদের অধিপতি, আপনি সৃষ্টিকর্তা, আপনি ব্রহ্মাকে নিয়োগ করেন এবং লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে বিচরণ করেন। আমি আপনাকে সেবা করে আমার জীবন সার্থক করতে চাই।" তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বলেন, "হে রাজা! আমি ভেঙ্কটাচলে অবস্থান করার জন্য একটি অনন্য মন্দির নির্মাণ করতে চাই, যেখানে থাকবে তিনটি প্রাকার, দুটি গোপুরম, সাতটি দরজা, পুষ্পমালা বোনার ঘর, রান্নাঘর, যজ্ঞশালা, পোশাকের ঘর, তেলের ঘর, ভোজনশালা এবং গহনার ঘর।" তিনি আরও বলেন, "মন্দির নির্মাণের স্থানে যে তেতুলবৃক্ষটি আছে, সেটি আমার বাসস্থান, এবং চম্পক বৃক্ষটি লক্ষ্মী দেবীর বাসস্থান। তাই এই

গাছগুলি সরিও না; ঋষিদের সঙ্গে তুমিও এগুলিকে পূজা করো।" তন্দমান স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি শ্রীনিবাসমঙ্গাপুরম থেকে মন্দির পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী এক শুভ মুহূর্তে দেবতাদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং পদ্মাবতী দেবীকে তাঁর বক্ষস্থলে স্থান দেন। তিনি তাঁর বাম হাত কোমরে রাখেন এবং ডান হাতে ভক্তদের পদবন্দনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এরপর তিনি অর্চা মূর্তি রূপে স্থিত হন।

গোল্লা মণ্ডপ

রামানুজাচার্য একবার এক বছরের জন্য কপিল তীর্থে নান্মাল্বরের মন্দিরে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি তিরুমল নম্বির কাছ থেকে ১৮ বার রামায়ণ শ্রবণ করেন। সেই সময় টণ্ডুরুকোল্ডি নামে এক ভক্ত প্রতিদিন তাঁকে গরুর দুধ দান করতেন। বিদায়ের সময় রামানুজাচার্য তাঁকে অর্থ প্রদান করতে চাইলে, তিনি বলেন—স্বামী! আমি অর্থ চাই না, আমাকে মোক্ষ দান করুন।"

রামানুজাচার্য বলেন, "মোক্ষ কেবল ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীই দিতে পারেন। তুমি তাঁকেই প্রার্থনা করো। টণ্ডুরুকোল্ডি অনুরোধ করেন, "আমি জানি না, স্বামী আমার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হবেন কি না। অনুগ্রহ করে আপনি তাঁর নামে একটি চিঠি লেখেন, যেখানে আমার জন্য মোক্ষ প্রার্থনা থাকবে।" রামানুজাচার্য তখন চিঠিতে লেখেন, "ওহে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী! এই নারী আমাকে প্রতিদিন দুধ প্রদান করেছেন এবং বিনিময়ে মোক্ষ প্রার্থনা করছেন। অনুগ্রহ করে তাঁকে মোক্ষ দান করুন।" টণ্ডুরুকোল্ডি তিরুমলায় এসে স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করেন এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন। এরপর তিনি সেই চিঠি স্বামীর পদতলে রেখে কাঠ সাজিয়ে একটি চিতায় প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেন। তাঁর এই ভক্তিতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুষ্পক বিমানে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান। তিনি যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই স্থানেই বর্তমানে গোল্লমণ্ডপ নামক মণ্ডপটি অবস্থিত, যা মন্দিরের প্রথম গোপুরমের সামনে।

তিরুমল নম্বির মন্দির (গৃহ)

শ্রীবৈষ্ণবদের একজন প্রধান যমুনাচার্য, তাঁর শিষ্য তিরুমল নম্বিকে তিরুমলায় প্রেরণ করেন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা করার জন্য। তিনি জীবনব্যাপী সেই সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রার্থনা করে বলেন—হে স্বামী! আমি আমার গুরু যমুনাচার্যের নির্দেশ অনুসারে আপনাকে সেবা করেছি। যদি কোনো ভুল করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন।”ভক্তদের প্রতিও তিনি বলেন,“আমি যদি কারো প্রতি কোনো অন্যায় করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন।”ভক্তরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের ডান দিকে তাঁর গৃহে একটি মূর্তি স্থাপন করেন, যা তিরুমল নম্বির মন্দির নামে পরিচিত।

অনন্তাচার্যের বৃন্দাবন (সমাধি)

একবার রামানুজাচার্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রসঙ্গে আলোচনা করে বলেন, “নাম্মাল্বর তাঁর এক কীর্তনে লিখেছেন যে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ফুল খুবই পছন্দ করেন। তোমাদের মধ্যে কে তিরুমলায় গিয়ে ফুল সেবা করতে ইচ্ছুক?”তখন অনন্তাচার্য উঠে বলেন, “গুরুদেব! আমি যাব এবং স্বামীর জন্য ফুল সেবা করব।”রামানুজাচার্য অনুমতি দেন এবং অনন্তাচার্য তিরুমলায় গিয়ে মন্দিরের পেছনে একটি কুটির নির্মাণ করেন। সেখানে একটি কূপ খনন করেন এবং ফুল ও তুলসীর বাগান তৈরি করেন। আজীবন তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য ফুল ও তুলসী নিবেদন করেন। এখানেই তাঁর সমাধি, যা অনন্তাচার্যের বৃন্দাবন নামে পরিচিত

তারিগণ্ডা ভেঙ্গমাম্বা বৃন্দাবন (সমাধি)

তারিগণ্ডা কৃষ্ণাইয়ার পাঁচ পুত্র জন্মানোর পর তিনি তিরুমলায় যান এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে প্রার্থনা করেন, “আমাকে একটি কন্যা প্রদান করুন।” ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায় কৃষ্ণাইয়ার একটি কন্যাসন্তান জন্মায়। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি তার কন্যার নাম রাখেন ভেঙ্কম্মা। সেই ভেঙ্কম্মাই “ভেঙ্গামাম্বা” নামে পরিচিত। ভেঙ্গামাম্বার বিবাহের কয়েকদিন পর তার স্বামী মারা যান। তিনি তিরুমলায় ফিরে যান এবং ভেঙ্কটেশ্বর

স্বামীর সেবার উদ্দেশ্যে ফুল ও তুলসী মালা প্রস্তুত করতে একটি বাগান তৈরি করেন। বাগানের জন্য তিরুমলায় একটি কূপ খনন করতে শুরু করেন। কিন্তু একটি বড় পাথর বাধা সৃষ্টি করে। তখন ভেঙ্গামাম্বা কূপে প্রবেশ করে সেই পাথর পূজা করেন এবং গঙ্গা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন।

পাথরটি দুটি ভাগে ভেঙে যায় এবং জল বের হয়। সেই কূপের জল দিয়ে তিনি বাগান পরিচর্যা করেন এবং প্রতিদিন ফুল ও তুলসী মালা তৈরি করে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করেন। তিরুমলা তিরুপতি দেবস্থানম কর্তৃক প্রদত্ত বিনামূল্যের সেবা ভবনের সামনে সেই কূপটি দেখা যায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে, ভেঙ্গামাম্বা বাগানের পাশে একটি সমাধি নির্মাণ করেন এবং সেই সমাধিতে প্রবেশ করে শরীর ত্যাগ করেন। এখনও তার সমাধিটি সেখানে বিদ্যমান।

হাথিরাম বাবাজি বৃন্দাবন (সমাধি)

হাথিরাম বাবাজি তার গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে তিরুমলায় আসেন। তাঁর দর্শনের জন্য হাজার হাজার ভক্ত ভিড় করেন। এত ভক্ত সমাগমের কারণে তাঁর সাধনায় সমস্যা হতে পারে বলে তিনি চিন্তা করেন। তখন তিনি পাপনাশনের দিকে যাওয়ার পথে গোগরভ তীর্থ এবং আকাশগঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে বেণুগোপাল স্বামীর মন্দির নির্মাণ করেন। এরপর তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। বেণুগোপাল স্বামীর সেবা করতে করতে দীপাবলির দিন তিনি জীবসমাধিতে প্রবেশ করেন। হাথিরাম বাবাজি শুধুমাত্র সেখানে থাকা রায় গাছের পাতা খেতেন। এখনও সেই গাছটি সেখানে বিদ্যমান।

আকাশগঙ্গা তীর্থ মহিম

তিরুমল নম্বি প্রতিদিন পাপনাশন তীর্থ থেকে জল নিয়ে এসে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অভিষেক করতেন। একদিন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী এক বালকের রূপ ধারণ করে তিরুমল নম্বির সামনে এসে বলেন, “দাদু! দাদু! তৃষ্ণা পেয়েছে। জল চাই।”

তিরুমল নম্বি উত্তরে বলেন, “এই জল আমি পাপনাশন থেকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য নিয়ে আসছি। যদি তোমাকে এই জল দিই, তাহলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। আমি দ্বিতীয়বার পাপনাশনে গিয়ে জল নিয়ে আসা পর্যন্ত স্বামীর অভিষেকে দেরি হয়ে যাবে। তাই তুমি পাপনাশনে গিয়ে জল পান কর।” এই কথা বলে তিনি চলে যান।

তিরুমলানম্বি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, বালকের রূপে এসেছেন স্বয়ং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী। সেই দিন থেকেই তিনি ঐ জলেরই সংগ্রহ করতেন। পাহাড় থেকে জল প্রবাহিত হওয়ার কারণে ঐ জলের নাম হয়েছে "আকাশগঙ্গা"। আজও তিরুমলানম্বির বংশধররাই আকাশগঙ্গা থেকে সেই জল রূপার কলসিতে হাতিতে চড়িয়ে নিয়ে আসেন। যেদিন আকাশগঙ্গা উৎপত্তি লাভ করেছিল, সেই দিন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব বিগ্রহকে আকাশগঙ্গার নিকটে নিয়ে গিয়ে সেখানেই উৎসব পালন করা হয়।

জাবালি তীর্থের মাহাত্ম্য

কাবেরী নদীর তীরে দুরাচারি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, যিনি মদ্যপান, চুরি এবং বারঙ্গনার সঙ্গে জীবনযাপন করতেন। একদিন, একটি রাক্ষস তাকে অধিকার করে। সেই রাক্ষস বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ভেঙ্কটাচল পর্বতে এসে জাবালি তীর্থে স্নান করেন। এই স্নানের ফলে তিনি রাক্ষসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কৈলাসে (বৈকুণ্ঠে) প্রবেশ করেন। পরে দুরাচারি জাবালি মুনির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, “আমি কাবেরী নদীর তীরে থাকি এবং পতিত ব্রাহ্মণ। আমি এখানে কীভাবে এসেছি?” জাবালি মুনি উত্তরে বলেন, “একজন রাক্ষস তোমাকে অধিকার করে বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। সেই রাক্ষস এখানে আমার বাসস্থানের এই তীর্থে স্নান করায় তার রাক্ষসত্ব দূর হয়ে যায় এবং সে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে। তুমিও এই তীর্থে স্নান করেছ। সেই কারণে তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়েছে।” এরপর দুরাচারি তাঁর জীবনের বাকি সময় এখানে থাকেন। তিনি জাবালি

তীর্থে স্নান করেন এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ভক্তি সহকারে সেবা করেন। মৃত্যুর পর তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

পাপনাশন তীর্থের মাহাত্ম্য

ভদ্রমতি: ভদ্রমতি নামে এক ব্রাহ্মণের ছয় জন স্ত্রী এবং দুইশো সন্তান ছিল। কিন্তু ধন না থাকায় তাঁরা সবাই উপবাসে ছিলেন। ভদ্রমতি তাঁর এই কষ্টের জন্য দুঃখিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ছোট স্ত্রী বলেন, "হে স্বামী! সুবর্ণ মুখারী নদীর তীরে ভেঙ্কটাচল নামে এক পর্বত আছে। সেই পর্বতে পাপনাশন নামে একটি তীর্থ রয়েছে। সেখানে স্নান করলে পূর্বজন্মের পাপ দূর হয়, এমন কথা আমার পিতা নারদ মুনি থেকে শুনেছেন। আমরা সবাই সেখানে গিয়ে স্নান করি।" ভদ্রমতি তাঁর স্ত্রীর কথামতো পরিবারের সবাইকে নিয়ে পাপনাশন তীর্থে স্নান করেন এবং তাঁর দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পান।

সুমতি:দৃঢ়মতি নামে এক শূদ্র ব্রাহ্মণদের কাছে যান এবং তাদের কাছে তিনি প্রার্থনা করেন, "আমাকে বেদ শিক্ষা দিন।" ব্রাহ্মণরা তাকে বলেন, "বেদ অনুসারে শূদ্রদের বেদ শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ। তাই তুমি এখানে থেকে ব্রাহ্মণদের সেবা করো। এতে তোমার শুভ হবে।" কিন্তু দৃঢ়মতি এই উপদেশ শোনেননি। তিনি বনে একটি আশ্রম স্থাপন করেন এবং ব্রাহ্মণের মতো নিত্যকর্ম, জপ-হোম ও তপস্যা করতে শুরু করেন। একদিন, সুমতি নামে এক ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা করতে করতে দৃঢ়মতির আশ্রমে পৌঁছান। দৃঢ়মতি তাকে অতিথি সেবা প্রদান করেন এবং বলেন, "আমাকে বেদ শিক্ষা দিন।" সুমতি দৃঢ়মতিকে বেদ শিক্ষা দেন। শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দেওয়ার কারণে সুমতি মৃত্যুর পর নরক ভোগ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন পশুর জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তারপর শূদ্র, বৈশ্য, ও ক্ষত্রিয় জন্ম লাভ করেন। এর পরে তিনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মের সময় সুমতিকে ব্রহ্মরাক্ষস অধিকার করে। সুমতি তার পিতার কাছে যান এবং তার এই সমস্যার কথা জানান। তখন তার পিতা অগস্ত্য মুনির কাছে যান এবং বলেন, "আমার পুত্র কোনো পাপ করেনি। তারপরও কেন ব্রহ্মরাক্ষস তাকে অধিকার করেছে?" অগস্ত্য

মুনি সুমতির পূর্বজন্মের কথা জেনে বলেন, “শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দেওয়ার কারণে তাকে এত জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ব্রহ্মরাক্ষসকে যম পাঠিয়েছেন। তোমার পুত্র যদি ভেঙ্কটাচলে পাপনাশন তীর্থে স্নান করেন, তবে শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দেওয়ার পাপ এবং ব্রহ্মরাক্ষস থেকে মুক্তি লাভ করবে।” সুমতির পিতা সেই নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন এবং সুমতি তার পাপ এবং ব্রহ্মরাক্ষস থেকে মুক্তি লাভ করেন।

হাথিরাম বাবাজি সমাধি, জাবালি তীর্থ, আকাশগঙ্গা তীর্থ এবং পাপনাশন তীর্থ তিরুমলা থেকে সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

চক্র তীর্থের মাহাত্ম্য

পদ্মনাভ নামে এক ব্রাহ্মণ ভেঙ্কটাচলে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাকে দর্শন দেন। তখন পদ্মনাভ বিষ্ণুকে প্রার্থনা করে বলেন, “আমাকে মুক্তি প্রদান করুন।” বিষ্ণু উত্তর দেন, “তুমি এখানে এই তীর্থে স্নান করো এবং আমার ভক্তি সাধন করো। তাহলে তুমি মুক্তি লাভ করবে।” এই আশীর্বাদ দিয়ে বিষ্ণু অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর পদ্মনাভ বিষ্ণুর নির্দেশ অনুযায়ী তীর্থে থেকে তপস্যা করতে থাকেন। একদিন, এক রাক্ষস পদ্মনাভকে হত্যা করতে আসে। পদ্মনাভ বিষ্ণুর কাছে তার রক্ষা কামনা করেন। তার ভক্তকে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু তার সুধর্শন চক্র পাঠান। সুধর্শন চক্র সেই রাক্ষসকে হত্যা করে পদ্মনাভকে রক্ষা করেন। তখন পদ্মনাভ সুধর্শনের স্তব করেন। সুধর্শন সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, “আমি আজ থেকে এই তীর্থে অবস্থান করব এবং তোমাকে রাক্ষসদের থেকে রক্ষা করব। আমি এই তীর্থে থাকার কারণে এর নাম চক্র তীর্থ হবে। এখানে স্নানকারীরা তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাবেন।” এই কথা বলে সুধর্শন চক্র সরবর প্রবেশ করেন।

একসময় কিছু ঋষি শ্রীরঙ্গমে বাস করছিলেন এবং রঙ্গনাথের সেবা করছিলেন। একদিন, ঋষিরা ঋষি বসিষ্টের সঙ্গে কাবেরী নদীতে স্নান করতে যান। সেই সময়, সুন্দর নামে এক গান্ধর্ব তার স্ত্রীর সঙ্গে

কাবেরী নদীতে নগ্নভাবে স্নান করছিলেন। ঋষিদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরর স্ত্রীরা দ্রুত তাদের পোশাক পরেন, কিন্তু সুন্দর পোশাক পরেননি। তখন ঋষি বাসিষ্ট সুন্দরকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, “আমাদের দেখে তুমি পোশাক পরোনি। তাই তুমি রাক্ষসে রূপান্তরিত হও।” সুন্দরের স্ত্রীরা ঋষি বসিষ্টকে প্রার্থনা করে বলেন, “আমাদের স্বামীর অভিশাপ মোচনের উপায় বলুন।” ঋষি বসিষ্ট উত্তর দেন, “যখন এই সুন্দর ভেঙ্কটাচলে তপস্যারত পদ্মনাভকে হত্যার উদ্দেশ্যে যাবে, তখন পদ্মনাভ বিষ্ণুকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করবেন। বিষ্ণুর পাঠানো সুধর্শন চক্র দ্বারা সুন্দর মারা যাবে এবং তার অভিশাপ মোচন হবে।”

এই কথা শুনে সুন্দর পদ্মনাভ এবং সুধর্শনকে তার অভিশাপের কথা জানান এবং তাদের প্রণাম করে তার নিজ লোকের দিকে ফিরে যান।

শ্রীবারি পাডালু (ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পদচিহ্ন)

ভৃগু মহর্ষি নারায়ণকে পরীক্ষা করার পর লক্ষ্মী দেবী বৈকুণ্ঠ ছেড়ে চলে যান। লক্ষ্মী দেবী ছাড়া বৈকুণ্ঠে থাকতে না পেরে নারায়ণ বেণ্কটাচলমে আসেন। বেণ্কটাচলমে নারায়ণ অবতরণ করার স্থানে তাঁর পদচিহ্ন পড়ে। এই পদচিহ্নগুলোকে শ্রীভারি পদ বলা হয়। বেণ্কটাচল ক্ষেত্রের ব্রহ্মাদিদেবতারা যখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামিকে দর্শন করতে আসেন, তাঁরা প্রথমে এই শ্রীভারি পদগুলিতে মাথা নত করে প্রণাম করেন। চক্রতীর্থ থেকে শ্রীভারি পদগুলি তিরুমালা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হাথিরাম বাবাজীর সমাধি, জাবালি তীর্থ, আকাশগঙ্গা তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ, চক্রতীর্থ এবং তিরুমালার শ্রীভারি পদগুলির জন্য তিরুমালা দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ বাসের ব্যবস্থা করেছে।

রামকৃষ্ণ তীর্থ মাহাত্ম্য

রামকৃষ্ণ নামে এক ঋষি ভেঙ্কটাচল পর্বতে তপস্যা করছিলেন। তিনি স্নানের জন্য একটি হ্রদ তৈরি করেছিলেন। তিনি যখন বিষ্ণুর তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর শরীর বাল্মিকার(সাপের ঘর) আবৃত ছিল। তার

তপস্যার ভয়ে ইন্দ্র বৃষ্টি ঘটান, কিন্তু তপস্যা ভঙ্গ করতে না পেরে চলে গেলেন। পরে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে বললেন, "আপনার দ্বারা খনন করা এই হ্রদটি আপনার নামে বিখ্যাত হবে। এতে যারা স্নান করবে তাদের পাপ বিনষ্ট হবে। আপনি যখন আপনার দেহ ত্যাগ করবেন তখন আপনি মোক্ষলাভ করবেন।"পাপনাশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে রামকৃষ্ণ তীর্থে যাওয়া যায়। এই জায়গাটি জঙ্গলে অবস্থিত হওয়ায় শুধুমাত্র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এখানে যাওয়া যায়।

কুমারধারা তীর্থের মাহাত্ম্য

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ : একবার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বালকের রূপে ভেঙ্কটাচল পর্বতে বিচরণ করছিলেন। তখন শতবর্ষ বয়সী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার হারিয়ে যাওয়া পুত্রকে ডাকছিলেন “কৌণ্ডিন্য! তুমি কোথায় আছো?” বালকের রূপে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলেন “এখানে তো কেউ নেই, আপনি কাকে ডাকছেন?” দুঃখভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আরেকবার বিলাপ করতে লাগলেন “হে পুত্র! তুমি কোথায় গেলে? এখন আমি আশ্রমে কেমন করে ফিরব? নিত্যকর্ম কেমন করে সম্পন্ন করব?” তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বললেন “হে ব্রাহ্মণ! তোমার শরীর শিথিল হয়ে গেছে, চুল সাদা হয়ে গেছে, ত্বকে ভাঁজ পড়েছে, দৃষ্টি ম্লান হয়ে গেছে। তবুও কি তুমি বেঁচে থাকতে চাও?”

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন “আমি এখনো দেবঋণ শোধ করতে পারিনি, তাই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।”
এই উত্তর শুনে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাত ধরে এক তীর্থের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাকে সেখানে স্নান করতে বললেন। স্নান করতেই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুবক হয়ে গেলেন। এরপর বালকের রূপে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী নিজের বিষ্ণুরূপ প্রকাশ করে বললেন “এখন তুমি গৃহে গিয়ে নিত্যকর্ম সম্পাদন করো।”বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুবক রূপ লাভ করার কারণে ঐ তীর্থকে ‘কুমারধারা তীর্থ’ বলা হলো।

কুমারস্বামীর কথা : দেবতা ও অসুরের যুদ্ধে তারকাসুরকে হত্যা করার কারণে কুমারস্বামী ব্রহ্মাহাত্যের পাপে দোষী হন। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে কুমারস্বামী তাঁর পিতা শিবের কাছে গিয়ে তাঁর নির্দেশনা চান। শিব বললেন, "নারায়ণের নাম জপ করলে সমস্ত পাপ নাশ হয়। তাই তুমি সুবর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত ভেঙ্কটাচল পর্বতে যাও। সেখানে অনেক তীর্থস্থান আছে। তুমি সেই তীর্থস্থানগুলোতে স্নান করো এবং কুমারধারা তীর্থস্থানে 'ওম নমো ভেঙ্কটেশায়' মন্ত্র জপ করো।"

ওম নমো ভেঙ্কটেশায়' জপ করে তপস্যা কর।" দেবতাদের সেনাপতি কুমারস্বামী, শিবের নির্দেশ অনুসারে ভেঙ্কটাচলে পৌঁছেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানে স্নান করেন এবং কুমারধারা তীর্থে দিনে তিনবার স্নান করেন, 'ওম নমো ভেঙ্কটেশায়' মন্ত্র উচ্চারণ করেন, এবং অনুগ্রহ করে ১২ বছর তপস্যা করে দর্শন দেন। বললেন, তুমি তোমার পিতার কথায় বিশ্বাস করে আমার তপস্যা করেছ। এখন আমার কাছে বর চাও।" কুমারস্বামী নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁকে নমস্কার করে নানাভাবে তাঁর প্রশংসা করে বললেন, "হে ভেঙ্কটচলপতি! হে নারায়ণ! সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত প্রভু! হে ভক্তের দুঃখ দূরকারী ভগবান!" তিনি প্রার্থনা করলেন, "তারকাসুরকে বধ করে আমি ব্রহ্মহত্যা পাপ করেছি। দয়া করে এই পাপ ধ্বংস করুন।" নারায়ণ বললেন, "যে এই ভেঙ্কটাচল পর্বতে যায়, তার পাপ ধ্বংস হয়। আপনি আমার জন্য তপস্যা করেছেন, তাই আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। তুমি এখানে থাক এবং কলিযুগের শেষ পর্যন্ত আমার সেবা কর।" এই বলে নারায়ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এই তীর্থস্থানে পৌঁছতে পাপনাশন থেকে ছয় কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। বনে অবস্থানের কারণে, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারিতে শুধুমাত্র মাঘ মাসের পূর্ণিমা দিনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

তুম্বুর (গোন) তীর্থ মহিমা

একবার নারদ মুনি এবং তুম্বুরু তাঁদের বীণা সহ নারায়ণ ভগবানের স্তব করতে করতে আকাশপথে ভ্রমণ করছিলেন। তখন নারদ মুনি রত্নখচিত তুম্বুরুর বীণা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বীণা কোথা থেকে পেয়েছ?" তখন তুম্বুরু বললেন, "আমি প্রাচীনবর্হি নামে এক রাজাকে স্তব করেছিলাম, সেই রাজা আমাকে এই বীণা উপহার হিসেবে দিয়েছেন।" তখন নারদ মুনি বললেন, "মানুষের স্তব করা সৎপুরুষেরা নিন্দা করে। সেজন্য তোমার মত লোকের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করব না। তুমি একজন মানুষের স্তব করেছ বলে তুমি পৃথিবীতে পতিত হও।" এই বলে নারদ মুনি তুম্বুরুকে শাপ দিলেন।

নারদ মুনির অভিশাপের ফলে তুম্বুরু ভেঙ্কটাচল পর্বতের গোন তীর্থে পতিত হলেন। স্বর্গলোকে ফিরে যেতে না পারায়, তুম্বুরু গোন তীর্থে স্নান করে নারায়ণ ভগবানের জন্য তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ তুম্বুরুর কাছে আবির্ভূত হলেন এবং বললেন, "বর চাও।" তখন তুম্বুরু বললেন, "নারদ মুনির অভিশাপ থেকে মুক্তি চাই এবং এই গোন তীর্থ যেন আমার নামে পরিচিত হয়।" নারায়ণ বললেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে," এবং অন্তর্ধান হলেন। সেই দিন থেকে গোন তীর্থের নাম 'তুম্বুরু তীর্থ' হয়ে গেল। তুম্বুরু তীর্থে যেতে পাপনাশন থেকে ছয় কিলোমিটার হাঁটতে হয়। এটি অরণ্যে অবস্থিত হওয়ায় শুধু জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাসের মাঘ পূর্ণিমার দিনেই সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

পান্ডব তীর্থ মাহাত্ম্য

পান্ডবেরা বনবাসের সময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুযায়ী এক বছর ধরে বেঙ্কটাচলম-এ বাস করেছিলেন। পাণ্ডবদের স্নান করা কুন্ডটিকে "পান্ডব তীর্থ" নামে অভিহিত করা হয়। এই পাণ্ডব তীর্থটি বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দির থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং রাস্তাসুবিধা উপলব্ধ। তিরুমালায় উল্লিখিত পাণ্ডব তীর্থ ছাড়াও আরও অনেক তীর্থস্থান রয়েছে যেমন - ইষ্টসিদ্ধি, কর্মসিদ্ধি, বট, ঔদুম্বর, গরুড়, গন্ধর্ব, কুব্জ, দশপ্রাচেতস, গরুড়, গান্ধাভ, শেষ, বাসুকি, দেব,

বিষ্ণুবর্ধন, কর্মকাণ্ড, কৃষ্ণ, ঋণমোচন, পার্জন্য, মেঘ, সংকর্ষণ, বাসুদেব, নারায়ণ, যক্ষ, কাল, গোমুখ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পিতৃ, আর্ষেয়, বৈশ্বদেব, অস্থি, আঞ্জনেয়, শুদ্ধোদক, অষ্টভৈরব, বিল্ব, বিষ্ণু, সর্ব, শরভ, মেহ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ফলগুনী, ভরদ্বাজ, আকাশগঙ্গা, বরুণ, সারস্বত, কুমারিকা, শক্, অঙ্গ, ঋষ্যশৃঙ্গ, অষ্টাদশ, দশাবতার, হলায়ুধ, সপ্তর্ষি, গজকোণ, বিম্বক্ষেণ, বায়ু, শিলাতোরণ, বজ্র, পাঁচায়ুধ, হলায়ুধ, নৃসিংহ, কাশ্যপ, কামদেব, অগ্নি, দৈব, দেবল, বিশ্বামিত্র, ভার্গব, দুরারোহন, অগ্নি, গৌতম, অষ্টাবক্র এবং ক্ষেত্রপালশিলা।

৭. তিরুপতিতে দর্শনীয় স্থানসমূহ

গোবিন্দরাজ স্বামীর মন্দির

পূর্বে কাবেরী নদীর তীরে, কণ্ব মহর্ষি নারায়ণের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেছিলেন। নারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন বর চাইতে। কণ্ব মহর্ষি বর চেয়ে বলেন, "আপনি এখানে থেকে সকল মানুষকে দর্শন দিন।" তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী, নারায়ণ গোবিন্দরাজ স্বামী নামে প্রকট হন।

তামিলনাড়ুর চিদম্বরমে নটরাজ স্বামীর নামে পূজিত হওয়া শিবের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরেই গোবিন্দরাজ স্বামীর মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিছু সময় পর চিদম্বরমে কুলোত্তুঙ্গ নামে এক রাজা শাসন করতেন। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রিকে বলেন, "বিষ্ণু যেহেতু সমুদ্রে শয়ন করেন, তাই নটরাজ মন্দিরে থাকা গোবিন্দরাজ স্বামীর মূর্তিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে।"

মন্ত্রি সমস্যায় পড়ে রাজ্যের সৈনিকদের এই আদেশ জানান। সৈনিকরা গোবিন্দরাজ স্বামীর মূর্তিটিকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন গোবিন্দরাজ স্বামীর ভক্তরা তাঁদের পাপ ও পূণ্যের শিক্ষা দেন এবং মূর্তিটিকে তিরুপতিতে নিয়ে যান। সেই ঘটনা তাঁরা রামানুজাচার্যের কাছে জানান। রামানুজাচার্য তিরুপতিতে পার্থসারথি মন্দিরের পাশেই একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করেন এবং ১১৩০ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দরাজ স্বামীর প্রতিষ্ঠা করেন। যেমনভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পূজা, প্রসাদ নিবেদন ও উৎসব হয়, ঠিক তেমনভাবেই গোবিন্দরাজ স্বামীর ক্ষেত্রেও তা করা হয়। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় যে ১০৮টি 'দিব্যদেশ' (তীর্থস্থান)হিসেবে পূজা করে, তার মধ্যে গোবিন্দরাজ স্বামীর মন্দিরও একটি। তিরুপতির পূর্বে নাম ছিল

শ্রীপদপুরম। রামানুজাচার্য গোবিন্দরাজ স্বামীর প্রতিষ্ঠা করার পর শ্রীপদপুরমের নাম তিরুপতি রাখা হয়। 'তিরু' মানে শ্রী (লক্ষ্মী), 'পতি' মানে স্বামী। তাই 'তিরুপতি' মানে লক্ষ্মীদেবীর স্বামী।

তিরুপতির গোবিন্দরাজ স্বামীর উপর অন্নমাচার্য তাঁর বহু কীর্তন নিবেদন করেছেন। তার কয়েকটি কীর্তনের ভাবনা: "তিরুপতি ক্ষেত্রের এই গোবিন্দরাজ স্বামী আমাদের কাছে বটপাত্রশায়ী রূপে উপস্থিত। তাঁর চরণের নিকট শ্রীদেবী ও ভূমিদেবী অবস্থান করছেন। নাভিকমল থেকে তাঁর পুত্র ব্রহ্মা উদ্‌ভূত। তিনি আদিশেষের উপর শুয়ে ভক্তদের করুণার মাধ্যমে দেখছেন। তাঁর দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র, তৃতীয় হাতে একটি পদ্ম এবং চতুর্থ হাতটি মাথার নীচে রেখে তিনি শুয়ে আছেন।"

"ভ্রেপল্লিতে (গোকুল) শিশু হিসেবে আপনি এমনভাবে শুয়ে থেকে দুধ পান করেছিলেন! যখন গোপীরা আপনাকে দোলনায় শুইয়ে জোলার (কীর্তন) গেয়েছিল, তখনও আপনি এমনভাবে শুয়ে শুনেছিলেন! মথুরায় কুব্জার বাড়িতে আপনি এমনভাবেই ঘুমিয়েছিলেন! দ্বারকায় সত্যভামার সাথে কথা বলতে এমনভাবে সময় কাটিয়েছিলেন! ষোলো হাজার স্ত্রীদের হৃদয়কে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করে আপনি যা উপভোগ করেছেন, তিরুপতিতে শ্রীদেবী ও ভূমিদেবীর সাথে তা উপভোগ করছেন!"

"গোপীদের সাথে প্রেমলীলা করে ক্লান্ত হয়েছেন? বৃন্দাবনে গরু চরাতে ক্লান্ত হয়েছেন? গোপদের সাথে গুচ্চকা (গুলি) খেলে ক্লান্ত হয়েছেন? গোবর্ধন পর্বত ধরে রাখতে ক্লান্ত হয়েছেন? এই গোবিন্দরাজ স্বামী কেন এখানে শুয়ে রয়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। তিরুমলায় দাঁড়িয়ে থাকা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তিরুপতিতে ঘুমিয়ে আমাদের দর্শন দিচ্ছেন।"

গোবিন্দরাজ স্বামীর শরণাপন্ন হলে গোবিন্দের অনুগ্রহ লাভ হয়। ভূমিদেবী ও লক্ষ্মীদেবীর স্বামী হিসেবে গোবিন্দের সেবা করুন।

গোবিন্দরাজ স্বামী নন্দব্রজে গরু ও গোপিও ইন্দ্রের শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত তুলে তাঁদের নিচে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনিই সেই গোবিন্দ, যাঁকে বহু গোপীরা কামনা করতেন। গরু চরানোর জন্য তিনি "গোবিন্দ" নামে প্রসিদ্ধ হন। এই গোবিন্দই পরে মথুরায় গিয়ে দুষ্ট কংসকে বধ করেন এবং তাঁর পিতা-মাতা, দেবকী ও বসুদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন।

যখন ভয়ঙ্কর কালীয় নাগ যমুনা নদীকে বিষাক্ত করে তুলেছিল এবং প্রাণনাশ ঘটাচ্ছিল, তখন গোবিন্দ তাকে পরাজিত করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন এবং সকলকে রক্ষা করেন। তাঁর বীরত্বের প্রতীক সুধর্শন চক্র দিয়ে তিনি শিশুপালসহ আরও বহু রাক্ষসকে বধ করেন। তাঁর গুরু সান্ধীপনি এবং মা দেবকীর ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি সমুদ্র পেরিয়ে অনেক আগেই মৃত পুত্রদের পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করেন।

পার্থসারথি মন্দিরে প্রবেশের পর প্রথম গোপুরম পার করলেই দেখা যায় – বেদান্ত দেশিকা, মণবালা মহানুনি, বরবরমুনি, আলবার, রঙ্গনাথ স্বামী, সীতা-রাম-লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী দেবী, রামানুজাচার্য, অনন্তাচার্য, তিরুমলানম্বি, গোদাদেবী, কল্যাণ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী এবং নৃসিংহ স্বামীর মন্দির। গোদাদেবী ও তিরুমলানম্বির মন্দিরগুলি রামানুজাচার্য প্রতিষ্ঠা করেন। রামানুজাচার্যের মন্দিরটি তাঁর শিষ্যরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই গোবিন্দরাজ স্বামীর মন্দিরটি তিরুপতি রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কোদণ্ডা রাম মন্দির

কোদান্দরাম স্বামীর মন্দির এবং তার মাহাত্ম্য কোদান্দ রাম স্বামীর বিষয়ে স্থানপুরাণে বলা হয়েছে:

শ্রী রামচন্দ্র যখন রাবণকে বধ করার পর অযোধ্যার পথে গমন করছিলেন, তখন তিনি কিছু সময় তিরুপতিতে কাটান এবং তিরুমালার স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করেন। এই সময় জাম্বুবান তিরুপতিতে শ্রী রামচন্দ্রের বিশ্রামের স্থানে সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণের আর্চামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন।

জাম্বুবান সীতা দেবীকে রামচন্দ্রের ডান পাশে এবং লক্ষ্মণকে তাঁর বাঁ পাশে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সামনে গরুড়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দ্বাপরযুগে জনমেজয় মহারাজ এই মন্দিরের পুনরুদ্ধার করেন এবং শ্রী রামের পূজা করেন।

কোদান্দ রাম স্বামীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্নামাচার্য বহু কীর্তন রচনা করেছেন। তার একটি কীর্তনের ভাবনা:"যদিও শ্রী রামচন্দ্র দশরথ মহারাজের পুত্র, তিনি মোক্ষ প্রদানকারী নারায়ণ। তিনি সাধারণ মানুষের মতো প্রকট হলেও তিনি শ্রী হরি। ধনুক ভাঙার দক্ষতা তাঁর অসাধারণ শক্তি। রাজা হয়েও তিনি তাঁর পায়ের ধূলিতে পাথরী অহল্যাকে নারী হিসেবে রূপান্তরিত করেছেন। সাধারণ মানুষের মতো তিনি জীবনযাপন করলেও তাঁর অসাধারণ মাহাত্ম্য তাঁকে মহান করে তুলেছে।"

"এই পৃথিবীতে শ্রী রাম সাধারণ মানুষের মতো বাসিষ্ঠ মুনিকে গুরু করেছিলেন। তবুও তিনি জটায়ুকে মোক্ষ প্রদান করেন। সীতা দেবীকে উদ্ধারের জন্য তিনি বানরদের দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেন এবং রাবণকে বধ করেন। নারায়ণ রাক্ষসদের ধ্বংস করার জন্য দেবতাদের বানর হিসেবে জন্ম নিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই নারায়ণ (শ্রী রামচন্দ্র) রাক্ষস বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করেছিলেন। এখন সেই শ্রী রামচন্দ্র বেঙ্কটাচলমে তাঁর আবাস গড়েছেন। তাঁর দর্শন করুন।"

হাথিরাম বাবাজির শিষ্য ধর্মদাস সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণের জন্য রৌপ্য মুকুট তৈরি করেন এবং শ্রী রামের জন্য একটি রৌপ্য ধনুক

উৎসর্গ করেন। তিনি ধ্বজস্তম্ভে সোনার আবরণ দেন। মহান্ত ভগবান দাস সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণের জন্য বহু সোনার গহনা তৈরি করেন। মহান্ত প্রয়াগ দাস মন্দির প্রাঙ্গণকে অত্যন্ত সুন্দর করে তোলেন।

জাম্ববান হনুমানকে প্রতিষ্ঠা না করায়, এখানে গর্ভগৃহে হনুমানের আর্চামূর্তি নেই। কিছুদিন পর ভক্তরা প্রথম গোপুরমের বাইরে একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে হনুমানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হনুমানের জন্মদিনে, সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণ হনুমান মন্দিরে যান এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সেখানেই তাঁরা পূজা গ্রহণ করেন এবং পরে ফিরে আসেন।

অন্নামাচার্য হনুমানকে এইভাবে তাঁর কীর্তনে কীর্তিত করেছেন: "মহাবীর, ও হনুমান! তোমার লেজ উঁচু করে সামনে বাড়িয়ে চলার আকৃতি বিস্ময়কর। তুমি রাক্ষসদের বধ করে সীতাকে রামের আঙটি দিয়ে শান্তনা দিয়েছ। তুমি ভক্তদের আশ্রয়দাতা। তুমি তিরুপতির নীচে উপস্থিত হয়ে ভক্তদের করুণার দৃষ্টিতে দেখছ, যারা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরকে সেবা করতে আসছেন।"

কোদান্ড রাম স্বামীর মন্দিরটি গোবিন্দরাজ স্বামীর মন্দির থেকে আধা কিলোমিটার দূরে এবং রেলস্টেশন থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কপিল তীর্থ

(একবার ভগবান শিব ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন নিয়ে, তাঁর পূজা করে, স্তব করে প্রার্থনা করলেন, "স্বামী! আমাকে এই ভেঙ্কটাচলে বাস করার অনুমতি দিন।" তখন স্বামী শিবজীকে বললেন, "ভেঙ্কটাচল পর্বতের অগ্নিকোণে নিচে বাস করো।") ভেঙ্কটাচল পর্বতের নিচে পাতাল লোকেতে কপিল মহর্ষি শিবলিঙ্গের পূজা করতেন। সেই শিবলিঙ্গের পাশেই কপিল তীর্থও অবস্থিত। (শিবজীর ইচ্ছা অনুসারে কপিল মহর্ষি পূজিত শিবলিঙ্গ এবং কপিল তীর্থ ভূমিতে প্রকাশ পায়।)

সেই কপিল তীর্থে দেবতারা স্নান করে শিবজীর পূজা ও স্তব করেন। এই কপিলেশ্বরই তিরুমলা ধামের ক্ষেত্রপাল।

এই কপিল তীর্থেই নম্মালওয়ার, ভেনুগোপালস্বামী, নরসিংহস্বামী এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরগুলি অবস্থিত। নম্মালওয়ারের মন্দিরে রামানুজাচার্য এক বছর ধরে বাস করেন। সেই সময়ে তিনি তিরুমলানম্বি থেকে ১৮ বার রামায়ণ শ্রবণ করেন। গোবিন্দরাজস্বামীর ব্রহ্মোৎসবের শেষ দিনে সুদর্শন সহ শ্রীদেবী, ভূদেবীকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দরাজস্বামীকে কপিল তীর্থস্থিত ভেনুগোপালস্বামী মন্দিরে নিয়ে আসা হয়, সেখানে অভিষেক করে, বস্ত্র ও অলংকারে শোভিত করে, নৈবেদ্য নিবেদন করে পূজা করা হয়। শেষে সুধর্শন চক্রকে কপিল তীর্থে স্নান করানো হয়। একে 'চক্রস্নান' বলা হয়। একইভাবে কোদণ্ড রামস্বামীর ব্রহ্মোৎসবের শেষ দিনে সুধর্শন সহ সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কোদণ্ডরামস্বামীকে কপিল তীর্থস্থিত ভেনুগোপালস্বামী মন্দিরে নিয়ে আসা হয়, যেখানে অভিষেক করে, বস্ত্র ও অলংকারে শোভিত করে, নৈবেদ্য নিবেদন করে পূজা করা হয়। শেষে সুধর্শন চক্রকে কপিল তীর্থে স্নান করানো হয়।

এই কপিল তীর্থ রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিরুমলা যাওয়ার পথে তিন কিলোমিটার দূরে অলিপিরিতে অবস্থিত।

ইসকন রাধাগোবিন্দ মন্দির

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চৈতন্য সংঘ (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৯৭৪ সালে তিরুমলা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দর্শন করেন। তিনি তিরুমলায় থাকা অসাধারণ সুবিধাগুলি দেখে তাঁর শিষ্যদের বলেন যে, আমাদেরও এমন মন্দির তৈরি করতে হবে, যা বালাজি (ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী) মন্দিরের মতো সোনার গোপুরম সহ বিশিষ্ট সুবিধা নিয়ে জ্বলজ্বল করবে।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে, তাঁর শিষ্যরা আলিপিরিতে ইসকন রাধাগোবিন্দ মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে রাধা গোবিন্দ ছাড়াও অষ্ট সখীর মূর্তি আছে। প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ইসকন মন্দিরে ভগবদ্গীতা, ভাগবত, রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো গ্রন্থও পাওয়া যায়।

এই ইসকন মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, বলরাম পূর্ণিমা, শ্রীরাম নবমী, নরসিংহ চতুর্দশী, গোবর্ধন পূজা, গৌরপূর্ণিমা, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী প্রভৃতি অনেক উৎসব উদযাপন করা হয়।
সকাল ৮:৩০ - ভাগবত প্রবচন। সন্ধ্যা ৮:০০ - ভগবদ্গীতা প্রবচন। পূজার সময়সূচি: সকাল ৪:৩০ - মঙ্গল আরতি। সকাল ৭:৩০ - দর্শন আরতি। দুপুর ১২:৩০ - রাজভোগ আরতি। সন্ধ্যা ৪:০০ - ধূপ আরতি। সন্ধ্যা ৭:০০ - সন্ধ্যা আরতি। রাত ৮:৩০ - শয্যা আরতি।

ভোগের সময়সূচি: ভোর ৪:১৫ - পরমান্ন এবং দুধ দিয়ে প্রস্তুত করা ক্ষীরান্ন নিবেদন করা হয়।
সকাল ৭:১৫ - ফল এবং ফলের রস নিবেদন করা হয়। সকাল ৮:১৫ - চপাটি, ভাত, ডাল, তরকারি, দই এবং রসম নিবেদন করা হয়। দুপুর ১২:০০ - ঝাল, নোনতা, তেতো, মিষ্টি, তীক্ষ্ণ এবং টক এমন ছয়টি স্বাদের ২৬ ধরনের রান্না নিবেদন করা হয়। এটিকে রাজভোগ নৈবেদ্য বলা হয়। বিকাল ৩:৩০ - চপাটি, ভাত, ডাল, দুই ধরনের তরকারি, দই এবং রসম নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যা ৬:৩০ - ফল এবং ফলের রস নিবেদন করা হয়। রাত ৮:২০ - দুই ধরনের হালকা খাবার নিবেদন করা হয়। রাত ৯:৩০ - দুধ নিবেদন করা হয়।

কীর্তন (ভজন) সময়সূচি: ভোর ৪:৩০ - মঙ্গলারতিতে, সকাল ৭:১৫ - দর্শন আরতিতে,
সন্ধ্যা ৭:০০ - সন্ধ্যা আরতিতে ভক্তরা কলিযুগের ধর্ম অনুযায়ী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে এই মহা মন্ত্র গেয়ে কীর্তন করেন। মঙ্গলারতি শেষ হওয়ার পরে

এই হরে কৃষ্ণ মহা মন্ত্রকে তুলসী জপমালায় দুই ঘণ্টা ধরে জপ করা হয়।

ইসকন মন্দিরের ভক্তরা রাধা-কৃষ্ণের ভক্তিসাধনা করেন এবং অন্য শহর, গ্রাম এবং বাড়িতে হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন করে বক্তৃতা দেন। ভক্তদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যযোশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতি গণা ॥

ঐশ্বর্য, শক্তি, কীর্তি, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণ সম্পূর্ণরূপে যার মধ্যে উপস্থিত, তিনিই ভগবান। (বিষ্ণুপুরাণ ৬.৫.৪৭)

এই শ্লোকটি বেদব্যাসের পিতা পরাশর মহর্ষি বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ করেছেন। ভগবান এই পার্থিব জগতে প্রতিটি যুগে অবতীর্ণ হন। কেউ ভগবানকে অবতারণ করার নির্দেশ দেন না, তবুও ভগবান দুঃখিত জীবদের প্রতি করুণা দেখানোর জন্য এই জগতে আসেন। ভগবান কীভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তা নিয়ে পণ্ডিতেরাও বিস্মিত হন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ভগবদ্গীতায় (৪.৭-৮) বলেছেন, “ধর্ম রক্ষার জন্য, দুর্জনদের ধ্বংস করার জন্য এবং সাধুদের রক্ষার জন্য আমি প্রতিটি যুগে অবতীর্ণ হই।” ভগবানের অবতারের বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং তা সমস্ত আচার্য দ্বারা স্বীকৃত।

ভগবান যেমন শক্তিশালী, তেমনি ভগবানের নামও সমান শক্তিশালী। তাই, শিশুদের অর্থহীন নাম না দিয়ে ভগবানের নাম রাখুন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীনিবাস, বেঙ্কট, বালাজি, বেঙ্কটেশ্বর, শ্রীরাম, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী প্রভৃতি। তবে, ভগবানের এই শক্তিশালী নামগুলি লক্ষ্মী ওয়াইনস, বেঙ্কটেশ্বর ওয়াইনস, বেঙ্কটেশ্বর মটন শপ, বালাজি চিকেন শপ-এর মতো নাম রাখার জন্য ব্যবহার করা ভগবানের প্রতি অপরাধ। তাই, ভগবানের পবিত্র নামগুলি এই ধরণের কাজে ব্যবহার

করবেন না এবং আপনার শিশুদের অর্থহীন নাম না দিয়ে ভগবানের নাম রাখুন। পাশাপাশি সর্বদা ভগবানের নাম জপ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, বিশেষ করে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে” এই মহামন্ত্র প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করুন।

যদি কেউ অপরাধমূলক কাজ করে, তবে সেই অপরাধের ফল শুধু তার উপরই নয়, বরং সাহায্যকারী ব্যক্তির উপরও পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, যারা মদ্যপান করে শুধু তারাই নয়, যারা তা তৈরি করে, বিক্রি করে, অনুমতি দেয় তাদেরও পাপফল ভোগ করতে হয়। যারা সঠিকভাবে সন্তানদের লালনপালন করেন না, তারাও সেই পাপের অংশীদার হয়, শাস্ত্র তা বলে। তাই, শাস্ত্রে বর্ণিত এই চারটি ধরণের পাপমূলক কাজ এড়িয়ে চলুন এবং যারা পাপমূলক কাজ করে তাদের সাহায্য করবেন না। এই পাপমূলক কাজগুলি হলো: মদ্যপান করা, জুয়া খেলা, মাংস খাওয়া এবং ব্যভিচার করা।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান কলিযুগে অনেকেই মানুষকে ঠকানোর জন্য নিজেদের ভগবানের অবতার হিসেবে ঘোষণা করেন। যারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, তারা তাদের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে প্রতারিত হন। যিনি নিজেকে ভগবান বলে দাবি করেন, তার মধ্যে পরাশর মহর্ষি উল্লেখিত ছয়টি গুণ আছে কিনা তা লক্ষ্য করা উচিত। যে ব্যক্তি এই ছয়টি গুণ সম্পূর্ণরূপে ধারণ করেন না, তাকে প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। শাস্ত্রের ভিত্তিতে ভগবানের বিষয়ে জানতে ব্যর্থ হলে, সেই প্রতারকের সাথে আমাদেরও নরকে যেতে হবে।

শাস্ত্রে বিশ্বাস না করে যদি আমরা পাপমূলক কাজ করি, তাহলে জীবিত অবস্থায়ই মানুষ আমাদের নিন্দা করবে। মৃত্যুর পরে নরক ভোগ করে, আমাদের একাধিকবার পশু, পাখি, পোকামাকড় ইত্যাদি রূপে জন্ম নিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ভগবদ্গীতার ১৬ম অধ্যায়ের ২৩ম শ্লোক এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪০ম শ্লোকে উল্লেখ করেছেন যে, যারা শাস্ত্রকে অনুসরণ করেন না, যারা অজ্ঞ এবং শাস্ত্রের প্রতি

আন্তরিক না, তারা ভগবানের জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হন এবং তাদের পতন ঘটে। তারা এই পৃথিবীতে বা পরলোকে সুখ লাভ করতে পারেন না। তাই জীবিত অবস্থায় শাস্ত্রে নির্দেশিত নিয়ম পালন করে উজ্জ্বল জন্মের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

ভাগবতে (১.৫.১৭) নারদ মুনি বেদব্যাসের সাথে বলেছেন, "যারা ভগবানের ভক্তি অনুশীলন করেন, তারা সময়ের সাথে মোক্ষ অর্জন করতে না পারলেও তাদের কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যারা পরিবারিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, তাদের কাজ মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে যায়। ফলে এই ধরনের কাজে কোন লাভ নেই।"

এই পৃথিবীতে কেউ স্থায়ীভাবে একসাথে বাস করতে পারেন না। আমরা স্থায়ীভাবে আমাদের শরীরে থাকতে পারি না। আমাদের সকলকেই একদিন মারা যেতে হবে। মৃত্যুর পরে স্ত্রী, সন্তান এবং অন্য আত্মীয়দের সাথে আমাদের সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। সবাই একা জন্মগ্রহণ করেন এবং একা মারা যান। মৃত্যুর পরে করা পাপ বা পূণ্যের ফল একাই ভোগ করতে হবে।

মহাভারতের বনপর্বে, ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) দৌপদী ও ভীমসেনের সাথে বলেছিলেন, "যেসব ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও আত্মীয়রা একতায় ভালোবাসা ভাগ করে, তারা সম্পদের জন্য নিজেদের ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে শত্রুর মতো একে অপরকে হত্যা করে।" সম্পদ যত বেশি অর্জিত হয়, ততই তা অর্জনের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ সম্পদ থাকে, ততক্ষণই সম্মান লাভ হয়, কিন্তু যখন সম্পদ থাকে না, তখন কেউ কদর করে না। সম্পদশালীদের নিজ সন্তানদের থেকেও ভয় থাকে, অন্যদের কথা ছেড়েই দিন। সম্পদ থেকে হিংসা, মিথ্যা, প্রতারণা, কামনা, ক্রোধ, চিন্তা, অহংকার, বিরোধ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, হিংসা, ব্যভিচার, জুয়া এবং মদ্যপানের মতো অনেক খারাপ গুণাগুণ সৃষ্টি হয়।

যে সম্পদ এত দোষ সৃষ্টি করে, তা ভগবানের কাছে চাওয়া কি ন্যায়সংগত? ভাগবতে (১০.৬০.৫৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "ব্রত, তপস্যা এবং পূজার মাধ্যমে আমাকে পাওয়ার পরেও যারা ভগবদ্ধাম চায় না এবং সংসার জীবনের লাভ বা ঐহিক সুখ চায়, তারা দুর্ভাগ্যবান। এই ঐহিক লাভগুলি নরকেও পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন এমন লোকের জন্য নরকই সঠিক স্থান।"
একই কথা কপিল ভগবান ভাগবতে (৩.৩০.৩-৫) তাঁর মায়ের কাছে বলেছেন, "একজন মূর্খ মনে করে তার শরীর, পরিবার, সম্পদ এবং ঘর স্থায়ী। প্রতিটি জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করার জন্য শরীর ছাড়তে চায় না। শুধু পৃথিবীর জীবই নয়, নরকে যন্ত্রণা ভোগকারী জীবনও তাদের শরীর ছেড়ে দিতে চায় না।"

ভাগবতে (১০.৫১.২০) দেবতারা মুচুকুন্দ মহারাজকে বলেছিলেন, "মোক্ষ ছাড়া অন্য কোনো বর চাইলে আমাদের থেকে চাইতে পারো, মোক্ষ কেবল নারায়ণই দিতে পারেন।"

অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, পৃথু মহারাজ এবং ভরত মহারাজ প্রভৃতি শুদ্ধ ভক্তরা এবং রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, অনন্তাচার্য, চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং মাধবেন্দ্রপুরীর মতো আচার্যরা ভক্তি ও মুক্তি চেয়েছিলেন, কিন্তু কখনও সম্পদ বা ঐহিক বাসনা চাননি। তারা সকলেই আমাদের জন্য আদর্শ এবং তাদের চাওয়া বরই ভগবানের কাছ থেকে আমাদের চাওয়া উচিত। ভগবদ্গীতায় (৩.৯) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "হে কুন্তীপুত্র! বিষ্ণুর জন্য কর্ম করো। এভাবে তুমি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জন্য কর্ম করার কথা বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কেবল ভক্তি নয়। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের জন্য যে কোনো কাজ করা হলেও তা ভক্তি হয়ে ওঠে। তাহলে যদি আমরা স্নান করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি এবং ধূপ, প্রদীপ, ফুল ও তুলসী পাতা নিবেদন করি, তবে স্নানের সময়টিও ভক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে, স্নান করে পরিষ্কারভাবে রান্না করে তা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে, রান্নার সময়, বাসন মাজার সময়, বাজার

থেকে রান্নার সামগ্রী আনার সময়, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা আহারকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করার সময়, উপকরণ সংগ্রহের জন্য বাজারে যাওয়া ও উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার সময় এই সবই ভক্তিসেবার অংশ হয়ে ওঠে।

গৃহস্থদের উচিত তাদের উপার্জিত অর্থ প্রথমে পরিবারের প্রয়োজনীয়তায় ব্যয় করা এবং বাকিটা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যয় করা। তাহলে অনুগ্রহ করে জাগ্রত হন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন বর্তমান মানবজন্ম কতটা মূল্যবান। সমস্ত জীবের মধ্যে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ। আরও জানা যায়, অনেক কোটি জন্মের পুণ্যের ফলেই ভারতভূমিতে জন্ম লাভ করা যায়, যেমনটি বিষ্ণুপুরাণে (২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ২৩তম শ্লোক) বলা হয়েছে।

মানবজন্মও অন্যান্য প্রাণীর মতো ক্ষণস্থায়ী হলেও মোক্ষ লাভের সুযোগ রয়েছে। তাই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে মৃত্যুর আগে সেই মুক্তি অর্জন করুন, যা অন্য কোনো জীব করতে পারে না।

যদি এই জন্মে কৃষ্ণভক্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হন, তবে পরবর্তী জন্মে ভক্তদের পরিবারে জন্ম নিয়ে পুনরায় কৃষ্ণভক্তি করার সুযোগ পাবেন। (ভগবদ্গীতা ৬.৪১-৪২) তাই এই ক্ষণস্থায়ী মানবজন্মকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির জন্য ব্যবহার করুন।

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করা এবং দ্বাপরযুগে ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করার মাধ্যমে যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেই সেই ফল অর্জন সম্ভব। (ভাগবত ১২.৩.৫২)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

১৬টি নামবিশিষ্ট এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কলিযুগের সমস্ত দোষ দূর করে। চারটি বেদ যতই অনুসন্ধান করা হোক, এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু নেই। এইভাবেই ভগবদ্গীতা এবং ভাগবত সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভক্তরা এই ধরনের শিক্ষা দিয়ে বহু পরিবারকে মদ্যপান, মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার এবং জুয়ার মতো পাপমূলক কাজ ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তারা মন্দিরে থাকা ভক্তদের মতো রাধাকৃষ্ণের ভক্তি অনুশীলন করেছেন।

ইসকন রাধাগোবিন্দ মন্দিরের মতো ইসকনের বিশ্বে এক হাজারেরও বেশি মন্দির রয়েছে এবং হাজার হাজার প্রচারকেন্দ্র রয়েছে। তাই আপনাকে অনুপ্রাণিত করছি যে, আপনার কাছে থাকা ইসকন মন্দিরে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গ লাভ করে ভক্তি অনুশীলন করবেন।
ইসকন রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে চার কিলোমিটার এবং কাপিল তীর্থ থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

আলিপিরিতে শ্রীবারি পাদপদ্ম (ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ফুট আইকন)

রামানুজাচার্য একবার এক বছর ধরে তিরুপতির কাপিল তীর্থে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময়ে তিরুমলানম্বি সকালে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা করে তিরুমালা থেকে তিরুপতি এসে রামানুজাচার্যকে রামায়ণ শুনিয়ে সন্ধ্যায় তিরুমালায় ফিরে যেতেন। তবে দুপুরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন না করতে পারায় তিরুমলানম্বি বিচলিত হয়েছিলেন। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী আলিপিরির পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ির কাছে তাঁর পাদচিহ্ন রাখেন এবং বলেন, "এই পাদপদ্মের দর্শন করলে আমার দর্শন করার মতোই।" তিরুমলানম্বি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে প্রতিদিন দুপুরে সেই পাদপদ্মের পূজা করতেন।

এই আলিপিরিতে শ্রীবাড়ি পাদপদ্ম ইসকন মন্দির থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

পদ্মাবতী দেবী মন্দির - পদ্মা সরোবর

তীরুচানূরের আলমেলুমঙ্গা মন্দিরে থাকা দেবীকে স্থল পুরাণ অনুযায়ী, শাস্ত্র অনুসারে এবং আর্চনাদি প্রথার ভিত্তিতে লক্ষ্মী দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্নামাচার্যও তাঁর সংগীতগুলিতে আলমেলুমঙ্গাকে বারবার শ্রীমহালক্ষ্মী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই লক্ষ্মী দেবী পদ্ম সরোবর থেকে পদ্মে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে তাঁকে পদ্মাবতী দেবী বলা হয়। লক্ষ্মী দেবী চতুর্ভুজা। দুটি হাতে তিনি পদ্ম ধারণ করেন এবং অপর দুটি হাতে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করেন। তামিল ভাষায় 'আলার' অর্থ ফুল, 'মেল' অর্থ উপরে এবং 'মঙ্গাই' অর্থ সুন্দর নারী। আলমেলুমঙ্গা মানে "পদ্মে দীপ্ত সুন্দরী।"

পদ্ম সরোবর: পদ্মাবতী দেবী মন্দিরের পিছনেই পদ্ম সরোবর অবস্থিত। ভৃগু মহর্ষি নারায়ণের বক্ষস্থলে প্রহার করায় লক্ষ্মী দেবী পাতালের কাপিল মহর্ষির আশ্রমে চলে যান। সেখানে কাপিল মহর্ষি লক্ষ্মী দেবীর পূজা করতেন। নারায়ণ লক্ষ্মী দেবীকে খুঁজতে পৃথিবীর কোহালপুরে অগস্ত্য মুনির প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে যান। সেখানে মুনিদের সাথে নারায়ণও লক্ষ্মী দেবীর পূজা করতেন। এভাবে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়।

একদিন আকাশবাণীর মাধ্যমে লক্ষ্মী দেবী নারায়ণকে বললেন: দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণা নদীর কাছে অবস্থিত সুবর্ণমুখারী নদীর তীরে একটি সরোবর খনন করুন এবং স্বর্গের সোনার পদ্মগুলি সেই সরোবরে রাখুন। সেখানে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করুন। সেখানে দেবীর দর্শন হবে।

আকাশবাণীর নির্দেশ অনুযায়ী নারায়ণ কৃষ্ণা নদী এবং সুবর্ণমুখারী নদীতে স্নান করেন এবং শুকদেবের আশ্রমের কাছে একটি সরোবর খনন করেন। এরপর নারায়ণ বায়ু দেবকে ডেকে স্বর্গ থেকে সোনার

পদ্ম আনার জন্য বলেন। নারায়ণের আদেশ অনুযায়ী, বায়ু দেব স্বর্গ থেকে সোনার পদ্মগুলি নিয়ে আসেন। সেই পদ্মগুলি শুকিয়ে না যায় বলে নারায়ণ সেখানে সূর্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। (আজও এই সূর্য দেবালয় পদ্মাবতী দেবী মন্দিরের পাশে অবস্থিত।) এরপর নারায়ণ সেই সোনার পদ্মগুলি সরোবরে রেখে বারো বছর ধরে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করেন। কার্তিক মাসে শুক্রবার লক্ষ্মী দেবী পদ্ম সরোবর থেকে উদ্‌ভূত হন। দেবতারা তাঁদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে লক্ষ্মী দেবীর স্তব করেন।

লক্ষ্মী দেবী তাঁর গলায় থাকা ফুলের মালা নারায়ণের গলায় পরিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। নারায়ণ লক্ষ্মী দেবীর সাথে ভেঙ্কটাচলমে যান এবং পদ্ম সরোবরে বলেন: “সরোবর! আমি তোমার তীরে লক্ষ্মী দেবীকে পেয়েছি। তুমি আজ থেকে পদ্ম সরোবর নামে পরিচিত হবে। তুমি লক্ষ্মী দেবীর প্রিয় হবে। তোমায় স্নান করলে মানুষের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যাবে।” নারায়ণ এই বলে তাঁকে আশীর্বাদ করে ভেঙ্কটাচলমে চলে যান।

যখন লক্ষ্মী দেবী ভেঙ্কটাচলমে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সাথে যাচ্ছিলেন, তখন দেবতারা লক্ষ্মী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন: “হে দেবী! আপনি এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই এই স্থানে অর্চা মূর্তি রূপে রূপান্তরিত হয়ে ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করুন।” লক্ষ্মী দেবী তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করতে অর্চা মূর্তিতে পরিণত হন।
পদ্মাবতী দেবীর প্রতিদিন সুপ্রভাত সেবা, সহস্র নামর্চনা, কল্যাণোৎসব, উঞ্জল সেবা এবং একান্ত সেবা অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার অষ্টদল পদ্মপদ্মারাধনা, শুক্রবার অভিষেক এবং বৃহস্পতিবার তিরুপ্পাবড়া সেবা মতো উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও পদ্মাবতী দেবীর ব্রহ্মোৎসব এবং নবরাত্রি উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মাবতী দেবী অবতীর্ণ হওয়া কার্তিক শুক্ল পঞ্চমীর দিনে, তিরুমালা থেকে গজ বাহনে আসা চক্রতালভার সহ পদ্মাবতী দেবীকে পদ্ম সরোবরে স্নান করানো হয়। এটি এখানকার একটি বিশেষ প্রথা।

কার্তিক মাসে পদ্মাবতী দেবীর ব্রহ্মোৎসব উদযাপন করা হয়। ব্রহ্মোৎসবের একদিন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদিত ফুলের মালা, কুমকুম, হলুদ, সুগন্ধি দ্রব্য, শাড়ি, ব্লাউজ, লাড্ডু এবং বড়া প্রভৃতি প্রসাদ পদ্মাবতী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়।

অন্নামাচার্য পদ্মাবতী দেবীর স্তবকীর্তন রচনা করেছেন। তাঁর এক কীর্তনের ভাবানুবাদ: "পদ্মাবতী দেবী মহারাষ্ট্রের কোহালপুরে শ্রী মহালক্ষ্মী, নারায়ণপুরে শ্রী পদ্মাবতী, তিরুচানূরে আলমেলুমঙ্গা এবং তিরুমালা ক্ষেত্রের শ্রীনিবাসের বক্ষস্থলে অবস্থানকারী ব্যূহ লক্ষ্মী রূপে থেকে তাঁর দর্শন লাভকারীদের ইচ্ছা পূরণ করেন। যদি ও এই জগন্মাতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত, তিনি আসলে শ্রীনিবাসের মূল পত্নী। আলমেলুমঙ্গার হৃদয়ে নারায়ণ অবস্থান করেন, নারায়ণের হৃদয়ে আলমেলুমঙ্গা অবস্থান করেন। আশা করি, তাঁরা দুজনই আমার হৃদয়ে অবস্থান করবেন!"

কৃষ্ণ বলরাম উপ মন্দির: পদ্মাবতী দেবীর মন্দিরে কৃষ্ণ এবং বলরামের একটি উপ মন্দির রয়েছে। বলরাম মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তীর্থযাত্রা করছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, কৃষ্ণ বলরামকে খুঁজতে শুকদেবের আশ্রমে পৌঁছান। শুকদেব কৃষ্ণকে অতিথি সেবা করেন এবং বলরামের তীর্থযাত্রা সম্পর্কে অবগত হয়ে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন, "যতক্ষণ বলরাম এখানে না আসেন, ততক্ষণ আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।" শুকদেবের অনুরোধ মেনে কৃষ্ণ সেখানে অবস্থান করেন। বলরাম তীর্থযাত্রার পর শুকদেবের আশ্রমে পৌঁছান এবং কৃষ্ণ ও বলরাম মিলিত হন। কৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার পর, শুকদেব তাঁদের সম্মানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

সুন্দররাজ স্বামী (শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী) উপ মন্দির: এই মন্দিরটি কৃষ্ণ এবং বলরামের মন্দিরের পাশে অবস্থিত। সুন্দররাজ স্বামীর উচ্চতা আট ফুট এবং তিনি শ্রীদেবী ও ভুমিদেবী সহ অবস্থান করেন।

এখানে সুন্দররাজ স্বামী, শ্রীদেবী এবং ভুমিদেবীর উৎসব মূর্তিও রয়েছে।

এই পদ্মাবতী দেবীর মন্দির তিরুপতি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী পদ্মাবতী দেবীকে বিয়ের পর অগস্ত্য মুনির আশ্রমে ছয় মাস অবস্থান করেন। সেই স্থানে বর্তমানে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দির অবস্থিত। এই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে কল্যাণ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বলা হয়। এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অগস্ত্য মুনির আশ্রম অবস্থিত। শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম থেকে তিরুমালার পথে ২৪০০টি সিঁড়ি রয়েছে। এই সিঁড়িগুলি তুণ্ডমান নামে একজন চক্রবর্তী নির্মাণ করেছিলেন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী পদ্মাবতী দেবীর সাথে এই সিঁড়ি পথ ধরে ভেঙ্কটাচলমে যান।

এই শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম তিরুপতি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সুবর্ণ মুখারী (স্বর্ণ মুখি) নদী ও অগস্ত্যেশ্বর মন্দির

পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করে ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী শাসন করছিলেন। সেই সময়ে, একবার নারদ মুনি এসে পাণ্ডবদের সুনন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভাইয়ের কাহিনি বর্ণনা করেন এবং বলেন: "তোমাদের স্ত্রী দ্রৌপদী, প্রতি বছর একেকজন স্বামীর সাথে থাকবে। যখন দ্রৌপদী তার স্বামীর সাথে একান্তে থাকবে, তখন বাকি পাণ্ডবরা সেই ঘরে প্রবেশ করবে না। যদি কেউ প্রবেশ করে, তবে তাকে এক বছর ধরে তীর্থযাত্রা করতে হবে" এই শর্ত পাণ্ডবরা মেনে নেন।

একবার এক ব্রাহ্মণের গরু চোরেরা চুরি করে। ব্রাহ্মণটি অর্জুনের কাছে এসে গরুগুলো রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। অর্জুন অস্ত্র আনতে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন। একই সময়ে ধর্মরাজ দ্রৌপদীর

সাথে সেই ঘরে ছিলেন। অর্জুন নারদ মুনির দেওয়া শর্ত স্মরণ করেন। তবুও ব্রাহ্মণের গরুগুলো রক্ষা করার জন্য অস্ত্র নিয়ে চোরদের বধ করেন এবং গরুগুলো ব্রাহ্মণকে ফেরত দেন। পরে অর্জুন ধর্মরাজকে বলেন, "নারদ মুনির শর্ত অনুযায়ী আমি এক বছর তীর্থযাত্রা করব।"

ধর্মরাজ অর্জুনকে বলেন, "তুমি ব্রাহ্মণের গরু রক্ষা করার জন্য ঘরে প্রবেশ করেছিলে। ব্রাহ্মণদের জন্য মিথ্যা বললেও তা সত্য হয়; পাপ করলেও তা পুণ্য হয়। তাই তোমার তীর্থযাত্রা করার প্রয়োজন নেই।" তখন অর্জুন উত্তর দেন, "ধর্মকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয় বলে আপনিই বলেছেন। তাই আমাকে তীর্থযাত্রার অনুমতি দিন।" ধর্মরাজ তাঁর অনুরোধ মেনে নেন।

অর্জুন তীর্থযাত্রা করতে করতে সুবর্ণমুখারী নদীতে পৌঁছান। সেখানে প্রণাম করে পূজা করেন, স্নান করেন এবং দান-ধর্ম করেন। পরে তিনি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যান এবং মুনিকে প্রণাম করেন। ভরদ্বাজ মুনি অর্জুন এবং তাঁর পরিবারকে কামধেনু গরুর মাধ্যমে অতিথি সেবা করেন। অর্জুন ভরদ্বাজ মুনির কাছে জিজ্ঞাসা করেন, "এই সুবর্ণমুখারী নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? এই নদীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানান।" তখন ভরদ্বাজ মুনি এইভাবে উত্তর দেন: একদিন অগস্ত্য মুনি সকালে তাঁর দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করে শিবের পূজা করতে যাচ্ছিলেন। তখন আকাশবাণী হয়: "হে মুনিবর! এই স্থানে কোনো নদী নেই। এখানে বসবাসকারী মানুষের জন্য একটি নদী আনুন।" আকাশবাণীর কথা শুনে অগস্ত্য মুনি ব্রহ্মার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে অগস্ত্য মুনিকে বর চাইতে বলেন। অগস্ত্য মুনি বলেন, "এই স্থানে কোনো নদী নেই, তাই মানুষের কল্যাণের জন্য একটি নদী দান করুন।"

ব্রহ্মা গঙ্গা দেবীকে স্মরণ করেন, তখনই গঙ্গা দেবী উপস্থিত হন। ব্রহ্মা গঙ্গা দেবীকে অগস্ত্য মুনির ইচ্ছার কথা জানান এবং মুনির সাথে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ব্রহ্মার আদেশ অনুযায়ী, গঙ্গা দেবী

অগস্ত্য মুনির সাথে রওনা দেন। পথে গঙ্গা দেবীকে দেখে মানুষ প্রণাম করে পূজা করেন। এটি দেখে বায়ু দেব বলেন, “যেমন মানুষ সোনা পাওয়ার আনন্দ পায়, তেমনি এই গঙ্গা দেবী এখানকার মানুষের জন্য সোনা সমান। তাই এই গঙ্গার নাম সুবর্ণমুখারী হবে।” ভরদ্বাজ মুনি অর্জুনকে এভাবেই সুবর্ণমুখারী নদীর নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

সুবর্ণমুখারী নদীতে সংযুক্ত অন্যান্য নদীগুলি: মহানদী, আগ্রপথ, এবং কাল্বা। কাল্বা নদী ভেঙ্কটাচল পর্বত থেকে প্রবাহিত। (সুবর্ণমুখারী নদী শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরমের কাছে অবস্থিত। এই নদীর তীরে অগস্ত্য মুনির আশ্রম এবং অগস্ত্যেশ্বর শিবালয়ও অবস্থিত।)

এই সুবর্ণমুখারী নদী শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরম থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অগস্ত্যেশ্বর শিবালয়ের পাশেই প্রবাহিত।

৮. আলবারদের রচিত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর স্তুতি

আলবার মানে “ভগবানের দিব্য গুণে নিমগ্ন বিশুদ্ধ ভক্ত আচার্যগণ”। আলবাররা রচিত ‘দিব্য প্রবন্ধ’-এর মধ্যে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উপর রচিত পাসুরালু সারাংশ নিচে দেওয়া হলো:

শ্রী পোয়িগাই আলওয়ার

পোয়িগাই আলবার কাঞ্চিপুরমের কাছে একটি কুণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাবিষ্ণুর ধারণ করা পাঞ্চজন্য শঙ্খের অবতার। পোয়িগাই আলবার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে এইভাবে স্তব করেছেন:

সম্পদ কামনা করা ব্যক্তিদের পাপ এবং মহাবিষ্ণুকে পূজা করা ভক্তদের পাপ তিরুমালা ক্ষেত্র মুহূর্তের মধ্যেই বিনষ্ট করে। গৃহ, পত্নী, সন্তান, ধনসম্পদ এবং পদমর্যাদার মতো অস্থায়ী সম্পদ দানকারী দেবতা এবং বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন ধূপদীপ, সুগন্ধিযুক্ত ফুল, পবিত্র জল ও নৈবেদ্য ভেঙ্কটাচলে অবস্থানকারী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করেন।
লাল ঠোঁট দিয়ে শঙ্খ বাজানো ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তিরুমালা ক্ষেত্রকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন। মহাবিষ্ণু সমুদ্রের নীলাভ জলে রঙ শরীর নিয়ে বরাহ অবতারে ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধারে করেছিলেন। কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করে গোকুলবাসীদের রক্ষা করেন এবং কংসকে বধ করেন। সেই মহাবিষ্ণুই আজ তিরুমালায় ভক্তদের দর্শন দিচ্ছেন এবং আশীর্বাদ করছেন।

ক্ষীরসাগরে শয়নরত বিষ্ণু, নৃসিংহরূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। এখন তিনিই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী রূপে তিরুমালায় অবস্থান করছেন। বৈকুণ্ঠের অধিবাসী নারায়ণের মহিমা হাজার হাজার যুগে চিন্তা করলেও কেউ বুঝতে পারে না। পৃথিবীতে অসংখ্য

অবতার ধারণ করা সেই নারায়ণই এখন ভেঙ্কটাচলে অবস্থান করছেন। সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করা পুন্যশীল মহাবিষ্ণু, তিরুমালা ক্ষেত্র থেকে মুক্তি প্রদান করছেন। যারা ভক্তিভরে তাঁকে সেবা করেন, তাঁরা অবশ্যই মোক্ষ লাভ করেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিরুমালায় অবস্থানরত শ্রীনিবাসের ধ্যান করলে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বাদশী তিথিতে সুশ্রী নারীরা মালা পরিধান করে ধূপ এবং প্রদীপ সহযোগে স্বামীকে পূজা করেন। ধূপ থেকে উত্থিত ধোঁয়া আকাশের তারাগুলিকে আড়াল করে। তিরুমালা সেই পর্বত, যেখানে রাম, মায়াবী স্বরূপে আসা মৃগমারীচকে বধ করেছিলেন।

হে মনা! পুরুষোত্তম মহাবিষ্ণু সব সময় আমাদের রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। নারায়ণ ভক্তদের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ক্ষীরসাগরে শয়নরত স্বামী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী রূপে তিরুমালায় অবস্থান করছেন। সেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীই আমার হৃদয়ে সর্বদা অবস্থান করেন। জেনে রাখো!"

শ্রী পুদত্ত আলওয়ার

পুদত্ত আলওয়ার তামিলনাড়ুর মহাবলিপুরামের কাছাকাছি মাধবী নামে একটি ফুলে আবির্ভূত হন। তিনি মহাবিষ্ণুর অস্ত্রগুলির মধ্যে কাউমোদকি নামক গদার অবতার। পুদত্ত আলভার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে এইভাবে বন্দনা করেছেন:

দেবতা এবং বৈকুণ্ঠ লোকের ভক্তদের দ্বারা প্রশংসিত সুন্দর গুণাবলীসম্পন্ন নারায়ণ ধর্ম রক্ষার জন্য বহু অবতার গ্রহণ করেছেন। যারা সেই সময়ে তার দর্শন পাননি, তাদের জন্য তিরুমলায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভক্তদের দুঃখ দূর করে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। উঁচুতে গিয়ে ঘন বাঁশ এবং অন্যান্য গাছপালায় শীতল হওয়া পার্বত্য অঞ্চল তিরুমলা ক্ষেত্র। মহর্ষি এবং দেবতাদের দ্বারা দেবদেবতা হিসেবে প্রশংসিত, তিনি দুধের সমুদ্রে বিশ্রাম নিয়েছেন এবং রাক্ষস কেশিকে ঘোড়ার রূপে বধ করেছেন। তিরুমলায় তিনি ভক্তদের জন্য দাঁড়িয়ে তার দর্শন দিচ্ছেন। বাঁশের

ঝোপে পূর্ণ তিরুমলার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে আমি সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করছি। আমার জিহ্বা সদা এই স্বামীর লীলাকে বন্দনা করবে।

তিরুমলায় সর্বদা অবস্থানকারী, দেবতাদের পূজার গ্রহণকারী মহাবিষ্ণুর পদ ধ্যানকারী ভক্তরা কখনো সম্পদে আনন্দিত হন না বা তা হারালে দুঃখিত হন না। নীল রত্নের মতো দেহকান্তিসম্পন্ন, দর্শনকারী ভক্তদের দুঃখ দূরকারী পুরুষোত্তম, করুণার অমৃত বিতরণকারী সুবৃহৎ হাতের অধিকারী মহাবিষ্ণু তিরুমলায় অধিষ্ঠিত। বহু তীর্থস্থানযুক্ত তিরুমলার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ভক্তরা ধ্যান নিজেকে ভুলে যায় । ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উপস্থিতি তিরুমলা ভক্তদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

তিরুমলায় বসবাসরত বাঁদরেরা সূর্যোদয়ের সময় জেগে উঠে পদ্মফুলে পূর্ণ সরোবরগুলিতে স্নান করে। এরপর তারা সদ্য ফোটা সুবাসিত ফুল সংগ্রহ করে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করে প্রণাম জানায়। ও হৃদয়! তুমি সেই বাঁদরদের মতোই ভক্তিভরে পদ্মফুল নিয়ে বেরিয়ে পড়, এ পৃথিবীর অলঙ্কারসম তিরুমলায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর নাম জপ করে স্বামীর পদপ্রান্তে পৌঁছানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো। তিরুমলার পাহাড়ে একটি হাতি নরম বাঁশ কেটে মধুর মধ্যে ডুবিয়ে তার প্রিয় স্ত্রী হাতিদের দেয়। এমন এক পবিত্র তীর্থস্থান তিরুমলা, যেখানে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী অধিষ্ঠিত।

শ্রী পেয় আলওয়ার

পেয় আলওয়ার চেন্নাইয়ের মাইলাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাবিষ্ণুর অস্ত্র নন্দক খড়্গের অবতার। পেয় আয্ওয়ার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে এইভাবে স্তব করেছেন:

তিরুমালার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির পদযুগলের দর্শন শুধু চারটি বেদের জন্যই নয়, এক সাধারণ ভক্তর জন্যও সুলভ। দেবলোকের বাসিন্দারা তাঁদের মুকুট সহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর পদযুগলের সামনে। যিনি পুরুষোত্তম ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির পদযুগলকে হৃদয়ে

ধারণ করেন, তাঁর কামনা-বাসনা দূর হয়, এবং তরুণীদের আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষাও নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাঁর জন্য শেশাদ্রিতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামিকে লাভ করা সহজ হয়।

তুলসীর মালা ধারণ করা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামি যেখানে বিরাজমান, সেই দিব্য স্থান দুটি: সর্বদা স্বামিকে ধ্যান করা আমার হৃদয় এবং পবিত্র দিব্য ক্ষেত্র তিরুমালা। পূর্বে একবার মহাবিষ্ণু বরাহরূপে অবতরণ করে তাঁর দাঁত দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য উত্তোলন করেছিলেন। সেই মহাবিষ্ণুই এখন তিরুমালা পর্বতে প্রকাশ হয়েছেন।

একটি পরিষ্কার পাথরের উপর বসে থাকা একটি স্ত্রীবানর আকাশের চাঁদকে দেখে একটি পুরুষ বানরকে বলে, “ওই চাঁদটা এনে দেবে?” – এইরকম দৃশ্য তিরুমালায় প্রতিদিন ঘটে। পূর্বে বিষ্ণু বামনরূপে বলিচক্রবর্তীর কাছে গিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এই ভু-মণ্ডলকে দান হিসাবে লাভ করেছিলেন। সেই বিষ্ণুই এখন তিরুমালায় প্রকাশ পেয়েছেন।

তিরুমালার একটি স্বচ্ছ সরোবরে একটি পুরুষ বানর এসে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে করে সেখানে আরেকটি বানর আছে, ভয়ে গাছের উপর উঠে পড়ে ও বেলগাছের ফল সংগ্রহ করতে হাত বাড়ায়। এই দৃশ্য প্রতিদিন তিরুমালায় দেখা যায়। পূর্বে কৃপা করে হাতের লাঠি হিসেবে ব্যবহৃত করে ভৎসাসুরকে হত্যা করেছিলেন কৃষ্ণ – সেই কৃষ্ণই এখন তিরুমালায় প্রকাশিত হয়েছেন।

যখনই কোনো পর্বতের কথা হয়, আমার কন্যা সাথে সাথে তিরুমালার পর্বতের গৌরব করে। সুরভি নামক ফুল এক হস্তী দেবাদিদেব তিরুমালাবাসীকে নিবেদন করে। তিরুমালা ছাড়া আর কোনো স্থান না জানা কুরব জনজাতির যুবরা হাতে চুড়ি পরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির উদ্দেশ্যে নৃত্য করছে। মহাবিষ্ণু কৃষ্ণরূপে একটি হাঁড়ি মাথায় নিয়ে নৃত্য করেছিলেন – সেই মহাবিষ্ণুই এখন তিরুমালায় বাস করছেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর স্তব করাই আমাদের জিহ্বার কল্যাণ। তিরুমালার এই দিব্য ভূমি বিশাল, বহু শিখর দ্বারা প্রসিদ্ধ।

শ্রী তিরুমলিশৈ আলওয়ার

তিরুমলিসৌ আ|লওয়ার চেন্নাইয়ের কাছাকাছি তিরুমলিসৌ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহাবিষ্ণুর অস্ত্রের মধ্যে সুধর্শন চক্রের এক অবতার। একবার তিরুমালিসাই আলওয়ার তিলক ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পাননি। চারপাশে খুঁজে দেখলেও তা পাওয়া যায়নি। স্বপ্নে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তিরুমালিসাই আলওয়ারকে একটি জায়গার কথা জানিয়ে বলেন, "তুমি সেখানে গেলে তিলক পাবে।" ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পরামর্শ অনুযায়ী সকালে সেখানে গেলে তিনি তিলক পেয়েছিলেন।

তিরুমলিসৌ আলওয়ার এইভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে বন্দনা করেছিলেন:

"সংঘের মধ্যে অবস্থান করা শ্রীমন্নারায়ণকে সর্বদা পূজা করা এবং এর মাধ্যমে আশীর্বাদ কামনা করা আমার লক্ষ্য। শ্রীমন্নারায়ণ, যিনি আমার পরমলক্ষ্যের জন্য বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তিরুমালায় অবস্থান করেছেন, তাঁকে পূজায় অবহেলা করব না! (আমি তা করব না!) রোগ আমার কাছাকাছি না আসুক, এই স্বামী আমাকে রক্ষা করেছেন এবং সমস্ত শুভকাজ প্রদান করে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তিরুমালায় বসবাসকারী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে চোখের আনন্দ হিসাবে দর্শন করার কামনা করি এবং মুখে তাঁকে প্রার্থনা করি।"

বর্ষাকালে তিরুমালার জলপ্রপাতগুলোতে প্রবাহ বেশি থাকার সময় বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন সেই জলে ভেসে আসে। হাতির দল সেই রত্নগুলোকে আগুন ভেবে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রত্ন থেকে আসা আলোকে বাজ মনে করে সাপ তাদের গর্তে ঢুকে লুকিয়ে পড়ে। এমন তিরুমালার বাসিন্দা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দর্শন করার জন্য আমি আকুল। আমি তিরুমালার প্রশংসা করার সময় বুঝেছিলাম আমাকে বৈকুণ্ঠপদে আশীর্বাদ করা হয়েছে। এই রহস্য জানার পরে আমি সর্বদা পবিত্র তিরুমালাকে ধ্যান করি। আমি ভেদগুলিতে উল্লেখিত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পায়ে চিরস্থায়ীভাবে আবদ্ধ।

শ্রাবণ নক্ষত্রের সময় ভক্তরা যে স্তোত্র পাঠ করেন, সেই শব্দ তিরুমালায় প্রতিধ্বনিত হয়। এমন তিরুমালার বাসিন্দা পরন্ধামা! আপনি যদিও আমার হৃদয়ে আছেন, আমি তিরুমালায় গিয়ে আপনার পূজা করতে চাই। ও মানবগণ! আপনার পাপ দূর করতে চাইলে আকাশ ছুঁতে চাওয়া শিখর এবং চৌদ্দ লোকের মধ্যে উল্লেখিত তিরুমালায় যান এবং সেই পবিত্র স্থানের আরাধনা করুন। তিরুমালা সেই পবিত্র স্থান যা আমাদের শত্রু, অর্থাৎ পাপ দূর করতে সক্ষম। পদ্মে জন্মানো ব্রহ্মা ও তিন চোখবিশিষ্ট শিব প্রত্যেক দিন পুষ্প দিয়ে তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পায়ে পূজা করেন। সর্বদা যুবক নারণায়ণ তিরুমালায় দাঁড়িয়ে সবাইকে আশীর্বাদ করেন। যেমন কাটা গাছ নড়তে পারে না, তেমনি ভক্তরা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পায়ে হাত তুলে প্রণাম করে এবং নড়তে পারে না। ঠাণ্ডা জলপ্রবাহযুক্ত তিরুমালা দেবতাদের এবং মানুষের জন্য এক বিশাল সম্পদ।

যালি প্রাণী, সিংহ, স্বর্ণখনি, মাণিক্য, মুক্ত, সুগন্ধময় সুন্দর ফুল, হরিণ, বানর, শিকারি এবং আকাশ ছোঁয়া শিখরসহ তিরুমালা স্থির হয়ে আছে। ইন্দ্রনীল মণির মতো তিরুমালায় বাসকারী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী পূজিত হন। ভক্তরা কোনো ইচ্ছা ছাড়াই তিরুমালায় এসে ভক্তিভরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পূজা করেন। পবিত্র তিরুমালা দর্শন করলেই দেহের অসাধারণ কষ্ট এবং ভয়ঙ্কর পাপ ধ্বংস হয়। দেবতাদের রক্ষা করতে শ্রীমন্নারায়ণ চক্র ধারণ করে তিরুমালায় স্থিত হন। কেউ কেউ মৃত্যুর পরে মোক্ষ পেতে তিরুমালায় এসে ভক্তিভরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে সুবাসিত ফুল দিয়ে পূজা করেন। তাদের থেকে যারা ভগবানের ইচ্ছা বুঝে ভক্তিভরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে ধ্যান করেন এবং ভক্তদের সেবা করেন, তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হন এবং সুখী হন।

শ্রী নম্ম আলওয়ার

নম্ম আলওয়ার তামিলনাড়ুর তিরুনলভেলি জেলার আলওয়ার তিরুনগরিতে জন্মগ্রহণ করেন। বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুভক্ত বিশ্বক্সেন নম্ম

আলওয়ার রূপে অবতীর্ণ হন। নম্ম আলওয়ার এইভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে বন্দনা করেছেন:

"সারথি! আমাদের রথ দ্রুত চালাও। তুমি জিজ্ঞাসা করছো আমরা কোথায় যাবো? ঠিক আছে, আমি বলছি শোনো। আমাদের পবিত্র তিরুমালা ক্ষেত্রে যেতে হবে। তিরুমালায় বৈকুণ্ঠনাথ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী রূপে দেখা দিচ্ছেন। ঝকঝকে মুক্তোর মালার মতো জলপ্রপাত রয়েছে এমন পবিত্র তিরুমালার দিকে আমাদের রথ দ্রুত নিয়ে চলো। আমার মেয়ের মাথার চুল এখনও ছোট। সে পোশাক ঠিকভাবে পড়তে জানে না। শিশুর মতো কথা বলে। চোখ এক স্থানে স্থির না রেখে মাটিতে এদিক-ওদিক ঘোরে। এইভাবে শিশুর মতো থাকা সত্ত্বেও, সে স্পষ্ট এবং গম্ভীরভাবে 'তিরুভেঙ্গড়ম' (তিরুমালা) নাম উচ্চারণ করে, যেখানে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী অবস্থান করছেন।

ভক্তদের বাসস্থান তিরুমালায় থাকা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী আমাদের পৃথিবীর সকল জীবের জীবনরক্ষা। তিরুমালায় অবস্থান করা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ফুল পছন্দ করেন।

'হে পিতা! শীতল তিরুমালায় বসবাসকারী আমার স্বামী! লঙ্কার রাজ্য জয়কারী! সাতটি মহাবৃক্ষ ভেদ করতে পারা বাণের অধিকারী কোদণ্ডপাণি! তিরুমালায় তুলসী মালা পরা প্রিয়তম আমার প্রভু! অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকালে সকলকে রক্ষা করা সেই আপদবন্ধু! তিরুমালায় অবস্থানকারী পরমাত্মা! আপনাকে প্রণাম।'

এইভাবে যাঁরা প্রার্থনা করেন, তাঁদের পাপ এবং পাপ করতে বাধ্য করা কর্মফলগুলি আগুনে পড়া তুলার মতো পুড়ে যায়।" সুগন্ধ ছড়ানো ফুল, পবিত্র জল এবং দীপ্তিময় প্রদীপ নিয়ে দেবতা ও দেবতাদের নেতা বিক্সকসেন তিরুমালেশকে প্রণাম জানাচ্ছেন। এমন তিরুমালেশ যে তিরুমালা ক্ষেত্রে অবস্থিত, তিনি আমাদের মুক্তি প্রদান করতে পারেন। গোবর্ধন পর্বত তুলে কুম্ভবৃষ্টির হাত থেকে গরু ও বৃন্দাবনের বাসিন্দাদের রক্ষা করা নারায়ণ এবং বালী চক্রবর্তীর

কাছ থেকে পৃথিবী তিনটি পদক্ষেপে মাপ নিয়ে দান হিসেবে নেওয়া সেই নারায়ণ, তিরুমালায় বাস করেন। তিরুমালা শিখরে প্রণাম জানালে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। যাঁরা তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পদপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করে তাঁর প্রশংসা করেন, তাঁদেরকে সেই স্বামী জন্ম ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন।

আদিশেষের বিছানা গ্রহণ করে জগদ্রক্ষক ও বৈকুণ্ঠপতি তিরুমালায় বসবাস শুরু করেন। আপনার আয়ু শেষ হওয়ার আগে, শরীরের শক্তি চলে যাওয়ার আগে তিরুমালায় যান এবং পদ্মনাভ তিরুমালেশকে প্রণাম করুন। তামিলনাড়ুর উত্তর দিকে অবস্থিত পবিত্র তিরুমালা ক্ষেত্রে মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তির অর্থ জানেন না এমন মূঢ়রা আমাকে পাগল বলে অপবাদ দিলেও আমি তা উপেক্ষা করে সার্বান্তর্যমী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ১০৮ নাম জপ করে ঘুরে বেড়াই। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর নাম গেয়ে, নাচিয়ে, জপ করে ও প্রশংসা করে থাকা ভক্তদের দেবতারা সেবা করেন। আপনাদের আমার উপর শত্রুভাব থাকলেও, আমার কথা অসন্তোষজনক হলেও শুনুন। তিরুমালায় অবস্থানকারী আমার পিতা ও দেবতা দেবাদিদেবের উপস্থিতিতে আমি অন্য কারো প্রশংসা করতে পারি না। বৈকুণ্ঠের নারায়ণ তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর রূপে আবির্ভূত হওয়ার জন্য পৃথিবী জীবিত, উজ্জীবিত থাকে।

শ্রী কুলশেখর আলওয়ার

কুলশেখর আলওয়ার কেরালার শ্রী তিরুবাঞ্জিক্কুলাম নামক পবিত্র স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহাবিষ্ণুর গলায় থাকা 'কৌস্তুভমণি' গহনার এক অবতার। কুলশেখর আলওয়ার এইভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে বন্দনা করেছেন:

"ভূদেবীকে বিয়ে করতে সাতটি ষাঁড়কে পরাজিত করা কৃষ্ণকে সর্বদা সেবা করতে চাই। শরীরে পেশী গঠনের জন্য যে ধরনের সম্পদ প্রয়োজন তা আমি চাই না। বাম হাতে শঙ্খ ধারণ করা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী যিনি তিরুমালার পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছেন, তাঁর কাছে

এক বক হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছি। যুবতী রম্ভা ও অন্যান্য অপ্সরারা আমার চারপাশে নৃত্য করবে এবং ইন্দ্রলোকের বিলাসিতাগুলি উপভোগ করার সুযোগ থাকলেও আমি এমন ধরনের সুখ ইচ্ছা করি না। পৃথিবীতে চক্রবর্তী হিসেবে শাসন করার সুযোগ থাকলেও সেটি আমার পছন্দ নয়। সুবাসিত ফুল ও মধুভরা বনভূমি সহ তিরুমালার পুকুরে মাছ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছি।

বৈকুণ্ঠের মতো দেখতে তিরুমালায় ভক্তদের সাথে শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের নেতৃত্বাধীন দেবতারা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনের জন্য প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন। এমন একটি তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর তাম্বুল (পানের পাতা) যেখানে ফেলা হয় সেই স্বর্ণপাত্রটি ধরে রাখার সেবক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছি। যেমনভাবে দেবতারা অনন্তপদ্মনাভকে দুধের সমুদ্রে অবস্থান করার সময় বন্দনা করেছিলেন, তেমনিভাবে তিরুমালার মৌমাছিদের গুঞ্জন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বন্দনার মতো শোনায়। এমন একটি তিরুমালায় চম্পক গাছ হয়ে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য চাই।"
দর্শকদের ভয় জাগায় এমন হাতির উপর সবার প্রশংসিত হয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা, রত্ন-গহনা অর্জন করার ইচ্ছা কিংবা পৃথিবীতে একজন চক্রবর্তী রাজা হিসেবে শাসন করার ইচ্ছা এসব আমার নেই। আমার প্রিয় প্রভু ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বসবাস করেন এমন তিরুমালায়, সেখানকার এক অপ্রধান গাছ হয়ে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

রম্ভা ও ঊর্বশীর মতো অপ্সরাদের কোমরের মতো বিদ্যুৎ রেখার মতো আকর্ষণীয় সৌন্দর্য কিংবা তাঁদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা আমার নেই। তিরুমালায় একটি শিখর হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা করছি। চাঁদের মতো সাদা ছাতা মাথায় নিয়ে জনসাধারণের দ্বারা প্রশংসিত হওয়া একজন চক্রবর্তী রাজা হিসেবে হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। সুরভিত ফুল ও সৌন্দর্যপূর্ণ তিরুমালায় একটি পুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

চন্দ্রকে মাথায় ধারনকারী শিব, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র তাঁদের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তখন তিরুমালায় অবস্থানকারী শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করেন। ভক্তদের পদধূলি যেখানে নিয়মিত পড়ে, তিরুমালার পথে একটি সড়ক হয়ে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। ভয়ঙ্কর পাপগুলি যা সমূলে ধ্বংস করতে পারে, সেই পরন্ধামা, অনন্ত, মহাপুরুষ, তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর! মুনিবৃন্দ, দেবতারা এবং ভক্তরা নিয়মিত আপনার দর্শন করেন। যাঁরা নন্দনকানন ও উর্বশীর আলিঙ্গন লাভ করেন তাঁদের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। আমি তিরুমালায় একসাধারণ বস্তু হয়ে জন্মগ্রহণ করতে চাই যেখানে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী অবস্থান করেন।"

শ্রী পেরিয়া আলওয়ার

পেরিয় আলওয়ার শ্রী ভিল্লিপন্তুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি গরুড়ের অংশ। পেরিয় আলওয়ার এইভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বন্দনা করেছিলেন:

"হে চাঁদ, তোমার সুন্দর, শীতল কিরণ দশ দিকজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরীরের দীপ্তির কারণে তোমার আলো ম্লান হয়ে গেছে। পাহাড়ে ভরপুর তিরুমালার শ্রীনিবাস তাঁর দুই হাত তুলে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এক শিশু, তাঁর হাত ব্যথা পাওয়ার আগে বিলম্ব না করে ছুটে এসো!

সুগন্ধময় ফুলে পূর্ণ তিরুমালার শ্রীনিবাস, তোমার পছন্দের ছাতা এবং জুতো আমি প্রস্তুত করেছি। কিন্তু তুমি সেগুলি না নিয়েই বাছুরদের চারণে ভয়ঙ্কর বনে চলে গিয়েছ। বনের ভয়াল পরিবেশে বাছুরদের পেছনে ছুটে তোমার কোমল পায়ের তলাও লাল হয়ে গেছে। আমার ছোট্ট প্রিয় প্রভু, তুমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

উঁচু শৃঙ্গ সহ তিরুমালার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর, যে মহাপুরুষ সমস্ত জীবকে মুক্তি দিতে অবতীর্ণ হয়েছেন! যশোদার দ্বারা বাঁধা দামোদর, ভক্তদের

দোষ ক্ষমা করে তাঁদের রক্ষা করা সেই আশ্রয়স্থল! আমি আমার আত্মা ও দেহে তোমার চক্র দিয়ে মুদ্রা এঁকেছি। এখন আমি তোমার করুণার অপেক্ষায় আছি।"

শ্রী তিরুপ্পাণ আলওয়ার

তিরুপ্পাণ আলওয়ার শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নারায়ণের শ্রীবৎস অংশ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। তিরুপ্পাণ আলওয়ার এইভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বন্দনা করেছেন:

"অত্যন্ত পবিত্র ও বিশ্বজগতের আদিদেব, সুগন্ধময় ফুলে ভরা তিরুমালা ক্ষেত্রে ভেঙ্কটেশ্বর রূপে অবস্থান করছেন। তিনি ফলের প্রত্যাশা না করে করুণার বৃষ্টির মতো আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন। সেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী আমাকে তাঁর ভক্তদের ভক্ত করে তুলেছেন।

তিরুমালায় বাঁদরেরা সর্বদা এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। দেবতারা তিরুমালায় এসে সুগন্ধময় ফুল দিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে পূজা করেন। সেই স্বামীই শ্রীরঙ্গে আদিশেষের উপর শায়িত রয়েছেন।"

শ্রী তিরুমঙ্গাই আলওয়ার

তিরুমঙ্গাই আলওয়ার তামিলনাড়ুর তিরুক্কুরাইয়ের কাছাকাছি আলিনাদর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নারায়ণের শারঙ্গ ধনুকের এক অবতার। তিরুমঙ্গাই আলওয়ার এইভাবে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে বন্দনা করেছেন:

"বিশাল দুধের সাগরে শয়ন করা মহাবিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কুরুন্দা নামক গাছের রূপ ধারণ করা অসুর ও বকাসুরের রূপ ধারণ করা অসুরকে ধ্বংস করেছেন। এখন তিনি লাল মাছে পূর্ণ পুকুরের মাধ্যমে পবিত্র তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী হিসেবে স্থিত আছেন। যিনি তাঁর নাম উচ্চারণ করেন তাঁদের মুক্তি দেন এই শ্রীমন্নারায়ণ তিরুমালার পবিত্র স্থানে অবস্থান করছেন।

হে মন! তুমি তিরুমালায় পৌঁছাও এবং হরি নাম জপ করো।যে মা-বাবা আমাকে লালন-পালন করেছেন তাঁদেরই আমার গতি বলে মনে করতাম। সুন্দর স্ত্রীকে সর্বস্ব ভেবেছিলাম, সন্তানদেরই অবলম্বন মেনেছিলাম। এই সমস্ত বন্ধনে আটকে দুঃখ ভোগ করেছি। আমি কুকুরের মতো নিকৃষ্ট জন্মের অধিকারী। কিন্তু এখন আমি জানি একমাত্র তুমি শাশ্বত। আমি তোমার দর্শন করার অপেক্ষায় রয়েছি। সুগন্ধময় ফুল এবং বাঁশে ভরা তিরুমালায় অবস্থান করা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, আমাকে তোমার ভক্ত হিসেবে গ্রহণ করো।

হে তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী! হরিণের চোখের মতো আকর্ষণীয় চোখবিশিষ্ট নারীদের সৌন্দর্যের দাসত্বে আমি নরকে যাওয়ার যোগ্য এমন বহু পাপ করেছি। আমার পাপগুলি জানার পর আমি প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমাকে তোমার ভক্ত হিসেবে গ্রহণ করো। গর্জনকারী মেঘের কারণে শীতল তিরুমালার পাহাড়ে অবস্থানকারী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, আমি লক্ষ্যহীনভাবে পাপের কর্মে বহু হত্যাকাণ্ড করেছি। ভিক্ষা করতে আসা লোকদের প্রতি করুণা না দেখিয়ে কঠোর আচরণ করেছি এবং তাঁদের অপমান করেছি। হে প্রভু! তোমার নাম শুনার পর আমি তোমার শরণাগতি নিয়েছি। হে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, আমাকে তোমার ভক্ত হিসেবে গ্রহণ করো।

এই পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। বহু রূপে, বহু আকৃতিতে জন্ম নিয়েছি। কোনো জন্মেই পুণ্যকর্ম করিনি। আমি এইভাবে জীবনের উদ্দেশ্য জানার অপারগতায় বারবার জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" "ভূমিতে অবস্থিত তিরুমালায় উপস্থিত তিরুমালেশ্বর! এই জন্মে আমি তোমার পদ আশ্রয় নিয়েছি। আমাকে তোমার ভক্ত হিসেবে গ্রহণ করো।

বহু পাপকর্ম করার পর আমি এই বয়সে পথহারা হয়ে তোমার পদপদ্ম আশ্রয় নেওয়ার জন্য এসেছি। আমি জানি না কীভাবে

তোমার প্রশংসা করব। উঁচু শৃঙ্গ সহ তিরুমালায় বসবাসকারী শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর! আমার পিতা হয়ে, আমার পাপ মুছে দাও এবং আমাকে রক্ষা করে তোমার ভক্ত হিসেবে স্থাপন করো। পাঁচটি উপাদান পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা তৈরি এই শরীরটি রোগে ভুগছে, তোমার দিকে যাওয়ার পথটি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, তোমার সঙ্গে থাকা আমার সম্পর্ক অনেক। পরমধাম! আমি তোমার পদে আশ্রয় নিয়েছি। আমাকে দয়া করে তোমার ভক্ত হিসেবে গ্রহণ করো।

আমি ছোট বেলায় অনেক পাপ করেছি। যৌবনে নারীদের সন্তুষ্ট করতে এবং তাঁদের দাসত্ব করতে অনেক নিষিদ্ধ কাজ করেছি। এখন রোগ ও দারিদ্র্য নিয়ে আমি দুর্ভোগে ভুগছি। আমি পূর্বজন্মে বহুবার সুখভোগ করেছি। কিন্তু সেই সব জন্মে আমার পাপকর্মের ফলস্বরূপ আবার জন্ম নিতে হয়েছে। হে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী! এই জন্মে তোমার করুণার আশায় আমি একটি ব্রত শুরু করেছি। তবে আমার মনকে স্থির রাখতে পারছি না। হে পরমধাম! আমাকে এই জন্ম ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করে তোমার ভক্ত হিসেবে স্থাপন করো। যত তপস্যা করা হোক, এই মানবজন্ম থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অসীম করুণাযুক্ত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী যাঁরা তাঁকে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁদের তাঁর ধামে নিয়ে যান এবং এই জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন।"

শ্রী গোদা দেবী (অন্ডাল)

গোদা দেবী শ্রীভিলিপুত্তুরের বিষ্ণুচিত্তের তুলসী বাগানে আবির্ভূত হন। তিনি ভূদেবীর অংশ ছিলেন। গোদা দেবী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রশংসা করেছেন এভাবে:

হে কামদেব! আমি তিনবার সুগন্ধি ফুল দিয়ে তোমাকে পূজা করেছি। হে কামদেব! আমি রাগ করে আপনাকে দোষারোপ করার আগে, ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, যিনি ফুলে শোভা পাচ্ছেন, গোবিন্দের নাম ধারণ করেছেন, তিনি অলৌকিক কর্মের কর্তা, বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে

এবং তিরুমালায় একটি চক্র পরিহিত সমস্ত জীবের কাছে উপস্থিত হন, দৌড়ে এসে আমাকে বিয়ে করুন এবং আপনাকে আলিঙ্গন করতে অনুপ্রাণিত করুন।

হে চম্পক, যে কোকিল ফুলের মধু পান করে মধুর কণ্ঠে গান গায়! সেই বৈকুণ্ঠবাসী, যিনি হাতে শ্বেতপাঞ্চজন্য শঙ্খ ধারণ করেন, তিনি তিরুমালায় তাঁর দিব্য রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে দর্শন দিচ্ছেন। তিনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন এবং আমাকে ব্যথা দিয়েছেন এবং আমার ব্যথাকে আনন্দ হিসাবে দেখছেন। আরে কোকিল! তিরুমালা নিবাসী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে তোমার মধুর কন্ঠে আমন্ত্রণ জানান, তাঁকে আমার কাছে আসার আহ্বান জানান।

ঘন কালো মেঘ! যিনি আকাশে কুম্ভ মতো ছড়িয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মীনাথ মহাবিষ্ণু কি আপনার সাথে তিরুমালার পবিত্র ঝর্ণা থেকে ঝরে পড়া জলপ্রপাতের কাছে আছেন? ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছ থেকে আমার বিচ্ছেদের অশ্রু বৃষ্টির স্রোতের মতো প্রবাহিত হচ্ছে। লক্ষ্মীনাথের আমাকে এভাবেকষ্ট দেওয়া কি ঠিক? "বর্ষাকালে তিরুমালা পৌঁছে ঠান্ডা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া কালো মেঘগণ! যুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী নারায়ণকে চিরকাল স্মরণ করি। বর্ষাকালে লতার পাতা ঝরে পড়ার মতোই আমি ভেঙ্কটেশ্বরের বিরহে ক্ষীণ হয়ে পড়ছি।

এই দীর্ঘ জীবনের যাত্রাপথে একদিনও কি ভেঙ্কটেশ্বর আমাকে ভালো কথা বলেছিলেন? (বলেননি, তাই না?) উঁচু শিখরসহ তিরুমালাকে নিবাস করে যেসব হাতি গর্জন করছে (ডাকছে), সেইভাবে গর্জনকারী মেঘগণ! হাজার মাথার অধিকারী আদিশেষের উপর শুয়ে, বিশাল বিষ্ণু কি একবারও আমাকে ভালো কথা বলবেন না? সেই স্বামীকে স্মরণ করে ক্ষীণ হয়ে পড়া এক নিরপরাধ নারীকে কি তিনি রক্ষা করতে পারেন না?”

৯. তিরুমলায় শুদ্ধ ভক্তদের লীলা

শ্রী যামুনাচার্য

যামুনাচার্য তামিলনাড়ুর মধুরাইয়ে ৯১৬ সালে শ্রীবৈষ্ণব পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত নাথমুনির পুত্র ঈশ্বরমুনির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নাথমুনি তাঁর পুত্র ঈশ্বরমুনির সঙ্গে এবং বৌমার সঙ্গে কিছু বছর বৃন্দাবনের যমুনা তীরে বাস করতেন। যমুনা তীর থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর ঈশ্বরমুনির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু নাথমুনি যমুনা তীরে বাস করেছিলেন, সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে তিনি তাঁর নাতির নাম রাখেন 'যামুনা'।

একটি উপদেশ সভায় যামুনাচার্য তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলেন: "তিরুমালায় শ্রীনিবাস ভগবানকে নানা রকম ফুল দিয়ে অলংকৃত করলে নম্মাল্বর অতীব আনন্দ পান। 'পরাঙ্কুশ দিব্যশূর' নামে পরিচিত নম্মাল্বরের মতে, এটি শ্রীনিবাস ভগবানের প্রতি একজন ভক্তের পক্ষ থেকে অতি উচ্চতর সেবা। পূর্বে আমি তিরুমালায় গিয়ে কয়েকদিন শ্রীনিবাস ভগবানকে ফুলসেবা করেছিলাম। তবে শীতল আবহাওয়া ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সহ্য করতে না পারায় আমি তিরুমালা থেকে ফিরে এসেছিলাম। সেই কারণে আমার পক্ষে শ্রীনিবাস ভগবানের সেবা করার সুযোগ অল্পদিনই ছিল। তাই কেউ যদি তিরুমালায় গিয়ে শ্রীনিবাস ভগবানের সেবা করে এবং ফুলসেবা করেন, তবে আমরা নম্মাল্বরের উপদেশকে সম্মান জানাই।"

কিছুক্ষণ পরে 'তিরুমালা নম্বি' নামক এক শিষ্য উঠে দাঁড়িয়ে যামুনাচার্যের উদ্দেশ্যে বলেন, "গুরুদেব! আপনি যেমনটি বলেছেন, আমি তিরুমালায় গিয়ে শ্রীনিবাস ভগবানের সেবা করব।" যামুনাচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিরুমালা নম্বিকে আলিঙ্গন করে বলেন, "শ্রীনিবাস ভগবানের সেবা করো এবং সেই ভগবানের কৃপা লাভ করো।"

শ্রী তিরুমালা নম্বি

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর শুদ্ধভক্তদের মধ্যে তিরুমালা নম্বি একজন। তিরুমালা নম্বি ৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে 'শ্রীশৈলপূর্ণ' বলেও ডাকা হয়। তিরুমালা নম্বির গুরু ছিলেন যামুনাচার্য। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবার উদ্দেশ্যে যামুনাচার্য তিরুমালা নম্বিকে ভেঙ্কটাচল পর্বতে পাঠান। তিরুমালা নম্বির বোনের নাম কান্তিমতী দেবী। রামানুজাচার্য এই কান্তিমতী দেবীর কাছেই জন্মগ্রহণ করেন। তিরুমালা নম্বি রামানুজাচার্যের জন্মজন্মান্তর বিশ্লেষণ করে তাঁর নাম রাখেন ‘ইলাই আল্বর’।

তিরুমালা নম্বি প্রতিদিন 'পাপনাশনম' থেকে জল নিয়ে এসে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অভিষেক করতেন এবং ফুল দিয়ে সাজাতেন। একদিন তিনি পাপনাশনম থেকে জল নিয়ে আসছিলেন, তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী একটি বালকের রূপে এসে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, “দাদু! দাদু! আমি খুব পিপাসার্ত, একটু জল দিন।” তখন তিরুমালা নম্বি বলেন, “এই জল পাপনাশনম থেকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য নিয়ে যাচ্ছি। যদি তোমাকে এই জল দিই তবে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। আমি আবার পাপনাশনমে গিয়ে জল আনতে গেলে স্বামীর অভিষেকে দেরি হবে। তাই তুমি পাপনাশনমে গিয়ে জল খাও।” এই কথা বলে তিনি এগিয়ে যান।

বালকের রূপে থাকা স্বামী পেছন থেকে একটি তীরে কুন্ডে ছিদ্র করেন এবং সেই জল পান করেন। এই ঘটনায় তিরুমালা নম্বি দুঃখ প্রকাশ করেন। তখন বালক একটি তীর দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করেন এবং সেই পাহাড় থেকে জল প্রবাহিত হতে থাকে। বালক তখন বলেন, “দাদু! এখন থেকে আর পাপনাশনম থেকে জল আনার দরকার নেই। এই পাহাড় থেকে যে জল বের হচ্ছে, সেটিই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অভিষেকের জন্য নিয়ে যান।” এই কথা বলেই বালক তিরুমালা নম্বির চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যান। তখন তিরুমালা নম্বি নিশ্চিত হন যে সেই বালকই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ছিলেন। সেই থেকে তিনি সেই জলই ব্যবহার করতে থাকেন। যেহেতু জল

পাহাড় থেকে উৎসারিত হচ্ছিল, সেই কারণে সেই জলের নাম হয় 'আকাশগঙ্গা'। আজও তিরুমালা নম্বির বংশধররাই আকাশগঙ্গা থেকে সেই জল রূপার কলসিতে করে হাতির পিঠে করে নিয়ে আসেন। আকাশগঙ্গার আবির্ভাবের দিন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব বিগ্রহকে আকাশগঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

একবার রামানুজাচার্য এক বছরের জন্য তিরুপতির কপিলতীর্থে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তিরুমালা নম্বি প্রতিদিন সকালে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা শেষ, তিরুমালা থেকে তিরুপতি এসে রামানুজাচার্যকে রামায়ণ উপদেশ দিতেন, এবং সন্ধ্যাবেলায় আবার তিরুমালায় ফিরে যেতেন। কিন্তু দুপুরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দর্শন করতে না পারার কারণে তিরুমালা নম্বি দুঃখবোধ করতেন। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী আলিপিরি অঞ্চলে পাহাড়ে ওঠার সিঁড়িগুলোর কাছে নিজের পায়ের ছাপ রেখেছিলেন এবং তিরুমালা নম্বিকে বলেছিলেন, "এই পায়ের ছাপ দর্শন করলেই তা আমার দর্শনের সমান।" তিরুমালা নম্বি খুব আনন্দিত হয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঐ পায়ের ছাপ দর্শন করে পূজা করতেন।

একবার তিরুমালা নম্বির শিষ্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মালা নিজে পরে ফেলেন। সেই রাতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তিরুমালা নম্বির স্বপ্নে এসে এই ঘটনা জানালেন। এরপর তিরুমালা নম্বি শিষ্যকে তিরস্কার করে বললেন, "আজ থেকে এই পাহাড়ের উপরে কেউ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মালা ব্যবহার করা চলবে না।" এরপর থেকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য নিবেদিত মালাগুলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে একটি কুয়োয় ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তিরুমালা নম্বি দেহত্যাগের সময় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে স্বামী! আমি আমার গুরু যামুনাচার্যের আদেশ অনুসরণ করে আপনার সেবা করেছি। এখন আমি আমার দেহ ত্যাগ করছি। যদি আমার দ্বারা আপনার সেবায় কোনো ভুল হয়ে থাকে,

তবে আমাকে ক্ষমা করুন।” উপস্থিত ভক্তদের দিকেও মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, “আমি যদি আপনাদের কারোর প্রতিও কোনো অপরাধ করে থাকি, তবে আমায় ক্ষমা করুন।” এই প্রার্থনার পর তিনি শরীর ত্যাগ করেন। ভক্তরা তাঁর বাসগৃহেই তিরুমালা নম্বির বিগ্রহ প্রতিস্থাপন করেন। সেই বাড়িটিকেই এখন ‘তিরুমালা নম্বি মন্দির’ বলা হয়।

তিরুমালা নম্বির আবির্ভাব দিনে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী শ্রীদেবী ও ভূদেবীর সঙ্গে তিরুমালা নম্বি মন্দিরে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং সেখানকার পূজাগ্রহণ করে পুনরায় ফিরে যান। উৎসবসময়ে যখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব বিগ্রহ তিরুমালা নম্বি মন্দিরের নিকটে যায়, তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী সেখানে দাঁড়ান, তিরুমালা নম্বিকে দর্শন করেন, তারপরই যাত্রা করেন।

শ্রী কাঞ্চীপূর্ণ (তিরুক্কাচ্চি নাম্বি)

কাঞ্চীপূর্ণ ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে কাঞ্চীপুরমের নিকটস্থ 'পূ ইরুন্ত ভাল্লি' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাঞ্চীপুরমের বরদরাজ স্বামীর পরম ভক্ত ছিলেন কাঞ্চীপূর্ণ। কাঞ্চীপূর্ণর এক সেবক ছিলেন, যার নাম বরদ। একবার বরদ কাঞ্চীপূর্ণকে প্রশ্ন করলেন, “স্বামী! আমি কি বা বৈকুণ্ঠে যেতে পারব?” কাঞ্চীপূর্ণ উত্তরে বললেন, “আমি বরদরাজ স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানাব।” কাঞ্চীপূর্ণ প্রতিদিন বরদরাজ স্বামীর কাছে চামরাসেবা করতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। সেই রাতেই কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ স্বামীর কাছে প্রশ্ন করলেন, “আমার সেবক বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে কি?” বরদরাজ স্বামী বললেন, “সে বৈকুণ্ঠে যাবে।” এই উত্তরের কথা কাঞ্চীপূর্ণ বরদকে বললে, বরদ খুব আনন্দিত হলেন।

কয়েকদিন পর আবার বরদ কাঞ্চীপূর্ণকে প্রশ্ন করলেন, “স্বামী! আপনি আগে বৈকুণ্ঠে যাবেন, না আমি?” কাঞ্চীপূর্ণ বললেন, “আমি বরদরাজ স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানাব।” রাতে একান্ত সেবার সময় কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ স্বামীকে বরদের প্রশ্নটি জানালেন। তখন

বরদরাজ স্বামী বললেন, “তোমার সেবক বৈকুণ্ঠে যাবে, কিন্তু তুমি যেতে পারবে না।” এই উত্তর শুনে কাঞ্চীপূর্ণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, “স্বামী! আমি তো নিয়মিত সেবা করছি এবং আপনার সঙ্গে কথাও বলছি। তাহলে আমি কেন বৈকুণ্ঠে যেতে পারব না?” তখন বরদরাজ স্বামী উত্তরে বললেন, “বৈকুণ্ঠে আমার দাসদের প্রবেশাধিকার নেই। কেবল আমার ভক্তদের দাসদের (যাঁরা আমার ভক্তদের সেবা করেন) সেখানে প্রবেশাধিকার আছে। যারা আমার ভক্তদের সেবা করে, তারাই কেবল বৈকুণ্ঠে যেতে পারে। কিন্তু তুমি আমার ভক্তদের সেবা করোনি এবং তোমার কোনো গুরু নেই। তাই তুমি বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে না।”

কাঞ্চীপূর্ণ তাঁর গৃহে ফিরে গিয়ে, বৈকুণ্ঠে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সন্ন্যাসীর রূপ ত্যাগ করে এক সেবকের রূপ ধারণ করে শ্রীরঙ্গমে গিয়ে, যামুনাচার্যের শিষ্য মহাপূর্ণ নামে রঙ্গনাথ ভক্তের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, “স্বামী! আমার কেউ নেই। আমি আপনার কাছে কাজ করতে এসেছি। আপনি যা খেয়ে ফেলে দেবেন, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।” মহাপূর্ণ তা মেনে নিয়ে তাঁকে গো সেবার কাজে নিয়োজিত করলেন। কাঞ্চীপূর্ণ গো সেবা করতে করতে মহাপূর্ণকে প্রতিদিন তিন বেলা বেলগাড়িতে করে কাবেরী নদীতে স্নানের জন্য নিয়ে যেতেন। মহাপূর্ণের বস্ত্রও তিনি নিজেই ধুতেন।

একদিন সন্ধ্যায় মহাপূর্ণকে কাবেরী নদীতে স্নান করিয়ে ফিরিয়ে আনার সময় বৃষ্টি হল। কাঞ্চীপূর্ণ ভিজে গেলেন। গোশালায় গিয়ে তাঁর ভেজা বস্ত্র খুলে ফেললেন। কাঞ্চীপূর্ণের কাছে কেবলমাত্র একজোড়া বস্ত্রই ছিল। রাতের সময়ে কেউ আসবে না ভেবে, তিনি তাঁর কাশায় বসন পরিধান করে, মস্তকে নামা (তিলক) ধারণ করে, হরিনাম জপ করতে লাগলেন। মহাপূর্ণ জানতেন কাঞ্চীপূর্ণের মাত্র একজোড়া বস্ত্র আছে। তাই তিনি তাঁর জন্য নতুন বস্ত্র আনতে গোশালায় গেলেন। সেখানে সন্ন্যাসী বস্ত্র বসনে, নামা ধারণ করে, হরিনাম জপরত তাঁর সেবককে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন এই সেবক আর কেউ নন বরদরাজ স্বামীর ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ।

মহাপূর্ণ কাঞ্চীপূর্ণকে প্রণাম করে বললেন, "আপনি কেন আমার সেবক হয়ে এলেন?" তখন কাঞ্চীপূর্ণ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, "বৈকুণ্ঠে যেতে হলে ভক্তদের সেবা করতে হবে এ কথা বরদরাজ স্বামী আমাকে জানিয়েছেন। তাই আমি আপনার সেবা করতে এসেছি।" মহাপূর্ণ বললেন, "আপনি আমার সেবা করবেন না। আমি এমন এক ভক্ত নই যে আমি আপনার সেবা গ্রহণ করতে পারি।" এই বলে তিনি তাঁকে রঙ্গনাথ স্বামীর কাছে চামরাসেবায় নিয়োগ করলেন।

কিছুদিন পরে রঙ্গনাথ স্বামী কাঞ্চীপূর্ণকে বললেন, "কাঞ্চীপূর্ণ! আমার মন্দির এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে গ্রীষ্মকালেও এটি শীতল থাকে। কাবেরী নদী আমার মন্দির ঘিরে প্রবাহিত হওয়ায় এই সমগ্র অঞ্চল ঠান্ডা থাকে। তাই তোমার চামরাসেবা আমার প্রয়োজন নেই। বরদরাজ স্বামী অগ্নিকুণ্ড থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং সেই স্থান অত্যন্ত উষ্ণ। সেজন্য তুমি বরদরাজ স্বামীর সেবা করাই উত্তম। আমার তোমার সেবার প্রয়োজন নেই।"

রঙ্গনাথ স্বামী তাঁর সেবা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায়, কাঞ্চীপূর্ণ তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করলেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ভক্তরা কাঞ্চীপূর্ণকে একটি চামর (পাখা) দিয়ে বললেন, "স্বামীকে চামরাসেবা করুন।" কাঞ্চীপূর্ণ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর চামরাসেবা করতে লাগলেন। তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীও কাঞ্চীপূর্ণকে বললেন, "কাঞ্চীপূর্ণ! আমার মন্দির পর্বতের মাঝে অবস্থিত। এই অঞ্চল ঠান্ডা। তাই তোমার চামরাসেবা আমার প্রয়োজন নেই। রঙ্গনাথ যে রূপে বলেছেন, তুমি বরদরাজ স্বামীর সেবাই কর।" ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীও তাঁর সেবা প্রত্যাখ্যান করায়, কাঞ্চীপূর্ণ কাঁচিপুরমে ফিরে গিয়ে বরদরাজ স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। বরদরাজ স্বামী আনন্দিত হয়ে কাঞ্চীপূর্ণকে বললেন, "এখন তুমি বৈকুণ্ঠে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছ।" এরপর কাঞ্চীপূর্ণ যামুনাচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্য হয়ে গেলেন।

শ্রী রামানুজাচার্য

রামানুজাচার্য ১০১৭ সালে মাদ্রাজের কাছাকাছি 'পেরাম্বুদুর' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির বিশুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে রামানুজাচার্য একজন। রামানুজাচার্যের গুরু হলেন ইয়ামুনাচার্য। এঁরা "শ্রী সম্প্রদায়"-এর অন্তর্গত। এই শ্রী সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থক্ষেত্র শ্রীরঙ্গম। রামানুজাচার্য শ্রীরঙ্গমে বসবাস করতেন, তীর্থযাত্রা করতেন, এবং শ্রী সম্প্রদায়ের প্রচার করতেন, যার কারণে তিনি শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামিকে সরাসরি সেবা করতে পারেননি। তাই, তিনি তাঁর শিষ্য অনন্তাচার্যকে ভেঙ্কটাচলমে পাঠিয়ে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির সেবা করালেন।

আজও রামানুজাচার্য পরম্পরার আচার্যগণ শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির পূজা করে আসছেন। রামানুজাচার্য তিনবার ভেঙ্কটাচলমে এসে, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামিকে সেবা করেছেন।

একদিন রামানুজাচার্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তিরুমালায় শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির দর্শনে যাবার জন্য রওনা হলেন। তিনি অষ্টসহস্র গ্রাম দিয়ে তিরুমালার দিকে যাত্রা করছিলেন। সেই গ্রামে 'যজ্ঞেশ' নামক এক ধনী ব্যক্তি এবং 'বরদাচার্য' নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। বরদাচার্যের বাড়িতে গেলে, তাঁর সঙ্গে থাকা বহু শিষ্যদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না এমনটাই মনে হল। তাই রামানুজাচার্য 'যজ্ঞেশুলু'র বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে, দুইজন শিষ্যকে পাঠালেন, এবং তাঁদের বললেন আমরা অষ্টসহস্র গ্রামে যেদিন পৌঁছব, সেই খবর যজ্ঞেশুলুকে জানিয়ে দাও।

যজ্ঞেশুলু এই তথ্য যারা জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের অতিথি সেবা না করেই বিদায় করে দিলেন। শিষ্যরা রামানুজাচার্যের কাছে ফিরে এসে বললেন, "যজ্ঞেশুলু আমাদের না জল দিলেন, না প্রসাদ দিলেন।" তখন রামানুজাচার্য সেই অপমানের কারণে যজ্ঞেশুলুর কাছে না গিয়ে, বরদাচার্যের বাড়িতে গেলেন। বরদাচার্য ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাই তিনি সেই সময় গ্রামে ভিক্ষার জন্য

গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কার্পার লক্ষ্মীদেবী তখন বাড়িতেই ছিলেন। রামানুজাচার্য সেই বাড়ির দরজা ঠকঠক করলেন, তখন ভিতর থেকে কার্পার লাক্ষ্মিদেবী বললেন, "আমার কাছে ঠিকঠাক পোশাক নেই।" রামানুজাচার্য তখন নিজের উত্তরীয় কাপড়টি জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে দিলেন। তা গায়ে দিয়ে কার্পার লক্ষ্মী দেবী দরজা খুলে দিলেন, অতিথিদের বসার জন্য চাটাই পেতে, ঠান্ডা জল পরিবেশন করলেন।

এরপর কার্পার লক্ষ্মীদেবী সেই গ্রামের এক দোকানদারের কাছে গিয়ে বললেন, "আমাদের গুরুদেব রামানুজাচার্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তাঁদের সকলের জন্য প্রসাদের রান্না করার উপকরণ চাই।" তখন দোকানদার বলল, "তুমি যদি আমার কামনা পূরণ কর, তবে রান্নার জিনিস দেব।" লক্ষ্মীদেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আগে তুমি যদি আমাকে রান্নার জিনিস দাও, আমি আমার গুরুকে ও তাঁর শিষ্যদের তৃপ্ত করব। তারপর তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।" দোকানদার রাজি হয়ে রান্নার জিনিস দিল। লক্ষ্মীদেবী রান্না করে, বাড়ির শালগ্রাম মূর্তিকে নৈবেদ্য দিলেন, তারপর সেই প্রসাদ রামানুজাচার্য ও তাঁর শিষ্যদের পরিবেশন করলেন। তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ শেষ করার পর বরদাচার্য বাড়িতে ফিরে এলেন। স্ত্রী তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললেন। তখন বরদাচার্য বললেন, "গুরুর জন্য তুমি এই নশ্বর শরীরের ত্যাগ করে চিরস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেছো।" এই বলে তিনি তাঁকে প্রশংসা করলেন।

রামানুজাচার্য তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে এই ঘটনা জানতে পারলেন এবং বরদাচার্যকে আদেশ দিলেন, "তুমি আমার উচ্ছিষ্ট (আমি যে প্রসাদ খেয়েছি তার অবশিষ্ট অংশ) দোকানদারকে দাও।" বরদাচার্য সেই উচ্ছিষ্ট তাঁর স্ত্রীকে দিলেন এবং তাঁকে দোকানদারের কাছে পাঠালেন। কার্পার লক্ষ্মীদেবী দোকানদারকে বললেন, "আপনি প্রথমে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।" দোকানদার সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার সাথে সাথেই, সেই প্রসাদের প্রভাবে তাঁর সমস্ত পাপ বিলীন হয়ে গেল, তাঁর ইন্দ্রিয় ও দেহ পবিত্র হয়ে গেল। তিনি লক্ষ্মীদেবীর পায়ে

পড়ে নিজের অপরাধ ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী দোকানদারকে নিয়ে রামানুজাচার্যের কাছে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা বললেন। দোকানদার রামানুজাচার্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে আপনার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করুন।" রামানুজাচার্য তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে, তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। এরপর রামানুজাচার্য দোকানদারকে বললেন, "বরদাচার্য খুব দরিদ্র অবস্থায় আছেন, তাই তুমি তাঁকে কিছু অর্থ দাও।" তখন বরদাচার্য বললেন, "স্বামী! ভক্তির জন্য জ্ঞান, ধন ও কুল এই তিনটি সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই আমি এই অর্থ গ্রহণ করব না।" রামানুজাচার্য এই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

রামানুজাচার্য নিজে তাঁর ঘরে না গিয়ে বরদাচার্যের বাড়িতে গিয়েছেন এই কথা জানতে পেরে যজ্ঞেশুলু রামানুজাচার্যের কাছে এসে দণ্ড প্রণাম করে বললেন, "গুরুদেব! আপনি আমার বাড়িতে কেন আসেননি?" রামানুজাচার্য উত্তরে বললেন, "আমার আগমনের সংবাদ নিয়ে যারা তোমার কাছে গিয়েছিল, তাদের তুমি অতিথিসেবা না করে ফিরিয়ে দিয়েছো। সেই কারণেই আমি তোমার বাড়িতে যাইনি।" তখন যজ্ঞেশুলু বললেন, "স্বামী! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আসছেন এই আনন্দেই আমি অন্যদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, অহংকারের কারণে নয়। আমি আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে এসে আমার সেবা গ্রহণ করুন।" রামানুজাচার্য বললেন, "আমি তিরুমলায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে, তারপর শ্রীরঙ্গমে ফেরার পথে তোমার সেবা গ্রহণ করব।" এই কথা বলে তিনি তিরুমলার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

রামানুজাচার্য তিরুমালায় আগমন করছেন এই খবর তিরুমলানম্বির কাছে পৌঁছাল। তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর তীর্থপ্রসাদ নিয়ে রামানুজাচার্যের অভ্যর্থনার জন্য বের হলেন। রামানুজাচার্য তাঁকে দেখে বললেন, "স্বামী! আপনি নিজে কেন এসেছেন? আপনি কাউকে, এমনকি একজন ছোট ভক্তকেও পাঠাতে পারতেন।" তখন তিরুমলানম্বি বললেন, "এই পাহাড়ে আমার থেকে ছোট কোনো ভক্ত

আমার চোখে পড়ে না। সেইজন্য আমি নিজেই স্বামীর তীর্থপ্রসাদ নিয়ে এসেছি।”

রামানুজাচার্য তিরুপতিতে এসে কপিলতীর্থে অবস্থিত নম্বি আলওয়ারের মন্দিরে অবস্থান করলেন। পুরাণে বলা হয়েছে যে তিরুমালার পাহাড় স্বয়ং আদিশেষ। সেই কারণে রামানুজাচার্য আদিশেষের উপর নিজের পদ রাখাকে পাপ মনে করে পাহাড়ে আরোহণ করেননি। এই কথা জেনে, অনন্তাচার্য পাহাড় থেকে নেমে এসে রামানুজাচার্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন “গুরুদেব! তিরুমালার পাহাড়ের উপরে অবস্থানরত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে শৈবরা শিব হিসেবে, শাক্তরা দুর্গা হিসেবে পূজা করছেন। কিন্তু আলওয়ারগণ তাঁকে বিষ্ণু স্বরূপে বহু কীর্তন রচনা করে স্তব করেছেন। তাঁদের সেই প্রার্থনাগুলি এখন যেন অরণ্যে কান্না হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে এই পাহাড়ে আরোহণ করে, শাস্ত্রের প্রমাণসহ প্রমাণ করুন যে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী স্বয়ং মহাবিষ্ণু। এতে করে আলওয়ারগণের কীর্তন ও প্রার্থনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। হে গুরুদেব! আপনি বলছেন এই তিরুমালা পাহাড় আদিশেষ, আর আপনি আদিশেষের উপর পা রাখাকে পাপ ভাবছেন। তবে, যদি আপনিই এই পাহাড়ে আরোহণের যোগ্য না হন, তাহলে আমি কীভাবে হবো? তাহলে কেন আপনি আমায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পূজার জন্য ফুল, তুলসী নিয়ে পাঠালেন?”

অনন্তাচার্যের অনুরোধ পূরণ করার জন্য, রামানুজাচার্য হাঁটুতে কাপড় বেঁধে হাঁটু দিয়ে চলতে চলতে তিরুমালা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তিনি স্বামী পুষ্করণীতে স্নান করে, তার পাশেই থাকা বরাহ স্বামীর দর্শন করলেন। তারপর তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে প্রণাম করে, প্রদক্ষিণা করে স্বামীর দর্শন লাভ করলেন। এরপর শৈব ও শক্তিদের ডেকে এনে শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্‌ধৃত করে বললেন “ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী দুর্গা দেবী নন, শিবও নন। অনেক পুরাণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তিনি মহাবিষ্ণু। তাই এখানে কেবলমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাই হওয়া উচিত।” তবুও তাঁরা প্রশ্ন করলেন, “যদি তিনি বিষ্ণু হন, তাহলে তাঁর শঙ্খ ও চক্র কোথায়?”

রামানুজাচার্য উত্তরে বললেন "তোন্ডমান ও বসুদাসের মধ্যে যুদ্ধে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী নিজের শঙ্খচক্র তোন্ডমানকে দিয়ে, স্বয়ং বসুদাসের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেইজন্য বর্তমানে তাঁর কাছে শঙ্খচক্র নেই।" তবুও তাঁরা একথা মেনে নিতে রাজি হলেন না। সেই রাতে, রামানুজাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মূর্তির সামনে দুর্গা দেবীর অস্ত্র খড়্গ, শিবের অস্ত্র ডমরু ও ত্রিশূল, এবং বিষ্ণুর অস্ত্র শঙ্খচক্র রেখে, মন্দিরের দরজায় তালা মেরে বললেন "আমরা সকলে এখানেই থাকি। যদি গর্ভগৃহের মূর্তি খড়্গ গ্রহণ করেন তবে তিনি দুর্গা, যদি ডমরু ও ত্রিশূল গ্রহণ করেন তবে তিনি শিব, আর যদি শঙ্খচক্র গ্রহণ করেন তবে তিনিই বিষ্ণু এইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক।" এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হলেন। সমস্ত অস্ত্র মন্দিরে রেখে দরজা তালাবন্ধ করা হল। সেই রাতে, রামানুজাচার্য আদিশেষের রূপ ধারণ করে মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র পরিয়ে দেন।

পরদিন ভোরে মন্দিরের দরজা খুলতেই দেখা গেল যে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেছেন। এই দৃশ্য দেখে, আর কিছু বলার বা করার উপায় না দেখে, শৈব ও শাক্তেরা তিরুমালা পর্বত ত্যাগ করে চলে গেলেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে শঙ্খচক্র পরিয়ে দিয়েছিলেন বলে, স্বামী রামানুজাচার্যকে নিজের গুরু হিসেবে গণ্য করেন। এই কারণেই, রামানুজাচার্যের সহস্রনাম (হাজার নাম)-এর মধ্যে একটি নাম ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর গুরু রূপে বিদ্যমান।

এক রাজা রামেশ্বরম যাওয়ার পথে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনে এলেন। তখন তিনি তার সেবকদের নির্দেশ দিলেন যে, মন্দিরের চারদিকে কয়েকটি মণ্ডপ (স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাঙ্গণ) নির্মাণ করতে হবে। এরপর তিনি নিজের যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। ফিরে আসার পথে, রাজা তিরুমালায় আবার এলেন, মণ্ডপগুলি কতদূর তৈরি হয়েছে তা দেখার জন্য। সেই রাত, রাজা এক স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্নে একটি সাপ (নাগ) দেখা দিল। পরদিন, রাজা যখন স্বামীর দর্শনে গেলেন, তখন

তিনি দেখলেন সেই সাপটি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাঁধে জড়িয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে, রাজা সোনায় একটি নাগাভরণ (সাপ-আকারের অলংকার) তৈরি করে, তা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাঁধে পরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোহিতকে দিলেন। কিন্তু পুরোহিত বললেন "নাগাভরণ তো শুধুই শিবের অলংকার। আমি তা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে পরাতে পারি না।" তাতে, সেই রাতে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী স্বপ্নে পুরোহিতের কাছে এসে বললেন "আমি আদিশেষের ওপর বাস করি। আদিশেষ আমার অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাই, রাজা যে নাগাভরণ বানিয়েছেন, তা আমাকে পরাও।" পরদিন, পুরোহিত ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর আদেশ অনুযায়ী, সেই সোনার নাগাভরণ স্বামীকে অলংকৃত করলেন।

যখন রামানুজাচার্য শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন, তিনি লক্ষ্য করেন যে তাঁর কেবল একটি বাহুতে নাগাভরণ (সাপের অলঙ্কার) আছে। তিনি পুরোহিতদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তারা ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেন। রামানুজাচার্য অনুভব করেন যে একটি বাহুতেই অলঙ্কার থাকলে তা সম্পূর্ণ দেখাবে না, তাই তিনি শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অন্য বাহুতেও নাগাভরণ তৈরি করিয়ে তাঁকে অলঙ্কৃত করেন। সেই থেকেই আজও শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নাগাভরণ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়।

রামানুজাচার্য তিরুচানুরের পদ্মাবতী দেবী (লক্ষ্মী দেবী) প্রতি বছর এক দিন শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে অর্পিত পুষ্পমালা, হলুদ ও কুঙ্কুম পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সংক্রান্তি উৎসবের পরদিন গোদা দেবীর পরিধান করা পুষ্পমালা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে নিবেদন করা হয় এবং এর মাধ্যমে গোদা দেবীর সঙ্গে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বিবাহ উৎসব উদযাপিত হয়। ধনুর্মাস (ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ধনুর্মাস হয়) সময়ে সুপ্রভাতমের পরিবর্তে গোদা দেবীর রচিত তিরুপ্পাভাই পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পুষ্প অলঙ্কার সময়ে দিব্যপ্রবন্ধ (বারোজন আল্বারদের রচিত চার হাজার গীতি) পাঠের ব্যবস্থাও করা হয়।

রামানুজাচার্য তিরুমালায় আগমনের পূর্বে, প্রতি বছর দশ দিনের ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত কিন্তু কেবল প্রথম দিনটি তিরুমালায় পালিত হত। বাকি নয় দিন উৎসব তিরুচানুর নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হত। এই বিষয়টি জানতে পেরে, রামানুজাচার্য ব্যবস্থা করলেন যাতে সমস্ত দশ দিনই তিরুমালায় ব্রহ্মোৎসব পালিত হয়।

তিরুমালার জঙ্গলে ছিল যোগ নরসিংহ স্বামী। রামানুজাচার্য এই নারসিংহ স্বামী-কে এনে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এবং প্রতিদিন এই দেবতাকে পূজা ও নৈবেদ্য প্রদান করার ব্যবস্থা করেন। এই নারসিংহ স্বামী যোগমুদ্রায় (ধ্যানমগ্ন আসনে) অবস্থান করতেন, সেইজন্য তাঁকে "যোগ নারসিংহ স্বামী" বলা হয়।

শ্রী অনন্তাচার্য

রামানুজাচার্যের প্রধান গৃহস্থ শিষ্যদের মধ্যে অনন্তাচার্য একজন। অনন্তাচার্য ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামানুজাচার্যের চেয়ে ৩৬ বছর ছোট। অনন্তাচার্য তিরুমলায় বসবাস করতেন। তাঁর বাড়ি, সেই বাড়ির পেছনে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবার জন্য তিনি নিজ হাতে খনন করা একটি কুয়া, একটি ফুলের বাগান, তাঁর প্রতিমূর্তি ও সমাধি সবই সেখানেই অবস্থিত। সংস্কৃত ভাষায় অনন্তাচার্য 'ভেঙ্কটাচল ইতিহাস মালা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি 'রামানুজ চতুঃশ্লোকী' এবং 'গোদা চতুঃশ্লোকী' নামে কিছু কীর্তন রচনা করেছেন।

একদিন রামানুজাচার্য শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বলেন, "ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ফুল খুবই পছন্দ করেন—এমন কথা নাম্মালবার তাঁর এক কীর্তনে লিখেছেন। তাই, তোমাদের মধ্যে কে তিরুমলায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে ফুলের সেবা করবে?" তখন অনন্তাচার্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গুরুদেব! আমি যাব এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে ফুলের সেবা করব।" রামানুজাচার্য আনন্দিত হয়ে অনুমতি দিলেন।

রামানুজাচার্যের অনুমতি নিয়ে অনন্তাচার্য তিরুমলায় এসে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা করার জন্য বসতি স্থাপন করেন। স্বামীর দর্শনের পরে তিনি একটি কুটির নির্মাণ করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ফুল ও তুলসী চাষের জন্য, তিনি ও তাঁর স্ত্রী একটি কুয়া খনন করতে শুরু করেন। তখন স্বয়ং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী একটি বালকের রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমি এই পর্বতের কূয়া জাতির এক বালক। আমি আপনার কথা শুনেছি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।" তখন অনন্তাচার্য বললেন, "এই কাজ তুমি করতে পারবে না। এটা আমার গুরুর আদেশে আমার দায়িত্ব। তুমি চলে যাও।" বালকের রূপে থাকা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তখন সেখান থেকে চলে গেলেন।

অনন্তাচার্য কূপ খনন শুরু করেন। তিনি খনন করা মাটি ঝুড়িতে ভরে তাঁর স্ত্রীর হাতে দিতেন। তাঁর স্ত্রী সেই মাটি দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতেন। এই দৃশ্য লক্ষ্য করেন শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী। তিনি অনন্তাচার্যের স্ত্রীর কাছে এসে বলেন, "আপনি গর্ভবতী। গর্ভবতীরা এত কষ্টের কাজ করা উচিত নয়। আপনি এই ঝুড়িটি আমাকে দিন, আমি এই মাটি দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলব।" তখন তিনি বললেন, "আমার স্বামী ইতিমধ্যেই আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন আমি যদি আপনার সাহায্য নিই, তবে আমাদের দু'জনকেই তিনি ভর্ৎসনা করবেন। তাই আপনি অনুগ্রহ করে চলে যান।" বালকের রূপে থাকা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তখন বলেন, "আপনার স্বামী এখন কূপের ভিতরে রয়েছেন, তিনি দেখতে পাবেন না আমি সাহায্য করছি। আপনি ভয় পাবেন না।" এইভাবে তিনি স্বামীর মহিমায় মোহিত হয়ে সাহায্য গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

বালকের রূপে থাকা স্বামী সাহায্য করতে থাকায় তাঁর কাজ দ্রুত শেষ হতে লাগল। অনন্তাচার্য লক্ষ্য করলেন, তিনি মাটি ভরার আগেই তাঁর স্ত্রী খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরে আসছেন। তখন তিনি স্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করলেন, "তুমি তো আগে দেরিতে আসতে। এখন আমি মাটি ভরার আগেই ফিরে আসছো এর কারণ কী?" স্ত্রী পতি-পরায়ণা নারী ছিলেন,

তাই তিনি মিথ্যে না বলে সব কিছু খুলে বললেন। এতে অনন্তাচার্য রাগে কূপ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখে বালকের রূপে থাকা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বুঝতে পারলেন যে তিনি ভর্ৎসনার সম্মুখীন হবেন, তাই তিনি পালাতে লাগলেন। অনন্তাচার্য তাঁকে ধরতে পেছনে ধাওয়া করলেন। পালাতে পালাতে একবার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী পিছনে তাকান। তখন অনন্তাচার্য তাঁর হাতে থাকা শাবল (খননের হাতিয়ার) দিয়ে তাঁকে আঘাত করেন।

সেই গুনপা বালকের রূপে থাকা স্বামীর নিচের ঠোঁটে লেগে যায় এবং রক্তপাত হতে শুরু হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় বালক মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই অদৃশ্য হয়ে যান। অনন্তাচার্য তাঁকে আর ধাওয়া করতে না পেরে ফিরে আসেন।

মন্দিরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মূর্তির নিচের হট হোট থেকে রক্তপাত শুরু হয়। এটি লক্ষ্য করে মন্দিরের পুরোহিত ভয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, “স্বামী! কেন এইভাবে রক্তপাত হচ্ছে?” ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তখন ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, “রক্ত থামাতে সবুজ কর্পূর (পচ্চ কাআর্পুর) লাগাও। অনন্তাচার্য যে লীলা করেছেন, তার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ প্রতিদিন একইভাবে সবুজ কর্পূর প্রয়োগ করো।” মন্দির পুরোহিত স্বামীর আদেশ অনুযায়ী সেবা করেন।
পুরোহিতের মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পেরে অনন্তাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে বলেন, “আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।”

একবার অনন্তাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য ফুলের মালা প্রস্তুত করছিলেন। সেই সময় স্বয়ং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরের পুরোহিতের মাধ্যমে বার্তা পাঠান“আমি অনন্তাচার্যর সঙ্গে দেখা করতে চাই।” পুরোহিত এই বার্তা পৌঁছে দিলে, অনন্তাচার্য বলেন, “আমি আসছি, আপনি যান।” তবে তিনি ফুলের মালা ও তুলসী মালা প্রস্তুত করতে কিছু সময় নিয়েছিলেন, তাই একটু দেরি হয়।

তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি এত দেরি করেছ কেন?” অনন্তাচার্য উত্তর দেন, “স্বামী! আমি ফুলের মালা ও তুলসীর মালা প্রস্তুত করছিলাম, তাই দেরি হয়েছে।” ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, “আমার চেয়ে তোমার কাছে ফুলের মালাই কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?” অনন্তাচার্য নম্রভাবে বলেন, “স্বামী! ফুল সম্পূর্ণ ফুটে গেলে তার সুবাস তাড়াতাড়ি চলে যায়। তাই, আমাদের গুরু রামানুজ আচার্য নির্দেশ দিয়েছেন ফুল সম্পূর্ণ ফুটে যাওয়ার আগে মালা তৈরি করে নিবেদন করতে। আপনি যখন আমাকে ডাকেন, তখন আমি সেই কাজ করছিলাম। মাঝপথে যদি চলে আসতাম, ফুল ফুটে যেতো আর সুবাস নষ্ট হয়ে যেতো। তাই আমি আগে মালা সম্পূর্ণ করে নিয়ে এসেছি।”

একদিন অনন্তাচার্য বাগানে ফুল তুলছিলেন। তখন একটি সাপ তাঁকে দংশন করল। তবুও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পুষ্পসেবা বিলম্ব না হয় , তিনি ফুল তুলে মালা প্রস্তুত করে মন্দিরে নিয়ে এলেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বলেন, “তোমাকে তো সাপ কামড়েছে! সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ গ্রহণ করো।” অনন্তাচার্য উত্তর দিলেন, “স্বামী! কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মত্স্যর্য এই সাপগুলো আমাকে প্রতি মুহূর্তে দংশন করছে। এই সাপের বিষ তার সামনে কীইবা বড় ব্যাপার? যদি এই বিষে আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমি বৈকুণ্ঠে গিয়ে আপনাকে সেবা করব। বেঁচে থাকলে এখানেই আপনাকে সেবা করে যাব।” আর একবার, অনন্তাচার্য শ্রীরঙ্গমে গিয়ে তাঁর গুরু ও শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর দর্শন করতে মনস্থির করেন।

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করা প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে, তিনি তিরুমালা থেকে যাত্রা করেন। পথের মধ্যে তিনি প্রসাদ যেখানে রাখা ছিল সেই বস্তা খুলে দেখেন প্রসাদের মধ্যে বহু পিঁপড়ে (চিঁটি) রয়েছে। তখন তিনি কুলশেখর মহারাজ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন তা স্মরণ করেন “স্বামী! আমি এই পর্বতের ওপর এক অকেজো প্রাণী হিসেবে জন্ম নিতে চাই।” তিনি চিন্তা করেন, হয়তো

সেই মহান ভক্তগণই এই পিঁপড়ে রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই, প্রসাদসহ সেই পিঁপড়েদের তিরুমালা পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে, সেই স্থানে প্রসাদ রেখে তারপর তিনি শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

একবার কিছু ভক্ত তিরুমালা পর্বতে আরোহন করছিলেন। চড়তে চড়তে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী একজন ভক্তের বেশ ধরে তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন, "আমি অনন্তাচার্যের শিষ্য। আপনারা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ক্লান্ত হচ্ছেন দেখে এক ভক্ত এই কথা অনন্তাচার্যকে জানিয়েছেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর জন্য নিবেদন করা লেবু ভাত প্রসাদ আপনাদের দেওয়ার জন্য অনন্তাচার্য আমাকে পাঠিয়েছেন।" এই বলে সেই ব্যক্তি প্রসাদ দিয়ে চলে গেলেন। ভক্তরা সেই লেবু ভাত প্রসাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তিরুমালায় পৌঁছে অনন্তাচার্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "আপনি পাঠানো লেবু ভাত খুবই সুস্বাদু ছিল।" তখন অনন্তাচার্য বললেন, "আমি কাউকে পাঠাইনি। স্বয়ং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীই আমার শিষ্যরূপে এসে আপনাদের নিজ প্রসাদ দিয়েছেন।"

একদিন পরাশরভট্টের এক শিষ্য তাঁর কাছে এসে বলল, "ভক্তদের লক্ষণগুলি কী, তা আমাকে বলুন।" পরাশরভট্ট বললেন, "তিরুমালায় অনন্তাচার্য রয়েছেন। তুমি তাঁর কাছেই গিয়ে জানো।" শিষ্য তিরুমালায় গিয়ে অনন্তাচার্যের দর্শন করল ও যা ঘটেছে সব বলল। তখন অনন্তাচার্য তাকে কয়েকদিন তিরুমালায় থাকার জন্য বললেন। একসময় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। অনেক ভক্ত ও সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উৎসব শেষ হলে সবাই প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসেন। পরাশরভট্ট প্রেরিত সেই শিষ্যও তাঁদের সঙ্গে বসেছিল। তখন অনন্তাচার্য তাকে উঠিয়ে প্রসাদ বিতরণ করতে বললেন। সে প্রসাদ বিতরণ করল এবং দ্বিতীয় দফার ভক্তদের সঙ্গে বসে প্রসাদ নিতে গেল।

আবার অনন্তাচার্য তাকে উঠিয়ে প্রসাদ বিতরণ করতে বললেন। সে আবার বিতরণ করে তৃতীয় দফার ভক্তদের সঙ্গে বসে। পুনরায় অনন্তাচার্য বললেনপ্রসাদ বিতরণ করো। সে তৃতীয়বার বিতরণ করল

এবং চতুর্থ দফার ভক্তদের সঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করল। উৎসব শেষে অনন্তাচার্য তাকে ডেকে বললেন, "তুমি জানতে চেয়েছিলে ভক্তদের লক্ষণ কী হওয়া উচিত আমি বলি। ভক্তদের উচিত লবণের মতো, বকপাখির মতো, মুরগির মতো এবং নীলকণ্ঠ পাখির মতো হওয়া।"

ভক্তটি অনন্তাচার্যের অনুমতি নিয়ে পরাশরভট্টের কাছে ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে, তিনি এই উত্তরগুলির অর্থ বুঝতে পারেননি। তখন পরাশরভট্ট তাঁর শিষ্যকে বললেন, "ছয়টি স্বাদের মধ্যে লবণ একটি। এই ছয়টি স্বাদ কখনো তাদের গুণ হারায় না। লবণ ছাড়া রান্না করা তরকারি কেউই খেতে পারে না। সবাই রান্না করা খাবারের প্রশংসা করে, কিন্তু কেউ লবণের প্রশংসা করে না। লবণ খাবারে স্বাদ এনে দেয়, কিন্তু নিজের মহিমা দাবি করে না। তেমনি একজন ভক্ত ভগবানের নববিধা ভক্তিতে পারদর্শী হওয়া উচিত, কিন্তু তার জন্য খ্যাতি বা প্রশংসা কামনা করা অনুচিত।

"সারস মাছ ধরার জন্য জলে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট মাছ খেলে বড় মাছ আসবে না ভেবে, সে ছোট মাছ খায় না। যখন বড় মাছ আসে, তখনই ধরে খায়। তেমনি, ভক্ত যখন সাধনায় থাকে, তখন পূজা, লোভ, খ্যাতি, অষ্টাঙ্গযোগ সিদ্ধি, স্বর্গ প্রাপ্তি, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার মত পদবিগুলি তার সামনে আসে। কিন্তু সাধক সেগুলিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বিষ্ণুলোক প্রাপ্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য করা উচিত। মুরগি ধুলো থেকে নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য বেছে নেয়। তেমনি, একজন ভক্ত সমস্ত শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য বুঝে তা অনুশীলন করা উচিত। এবং তুমি 'নীল' এর মত হওয়া উচিত—অর্থাৎ, বড়রা অবমাননা করলেও বা সম্মান দিলেও, তা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া উচিত।"

অষ্টদিন এমনভাবে কেটে গেল। নবম দিনে অনন্তাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে প্রার্থনা করলেন "আমার ফুলবাগানে যিনি রাতে আসছেন, তারা যেন আজ আমাকে দৃশ্যমান" সেই দিন ভেঙ্কটেশ্বর

স্বামী ও লক্ষ্মীদেবী একজন রাজা ও রানীর রূপে ঘোড়ায় চড়ে এসে ফুলবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যেন অনন্তাচার্য তাঁদের চিনতে পারেন। রাজাকে দেখে অনন্তাচার্য বললেন, "তোমাকে দেখলে সত্যিই রাজাদের মতোই লাগছে! ভগবানের জন্য আমি যত্ন করে ি য়ে রাখা ফুল নষ্ট করছ?" বলে তাঁকে ধমক দিলেন এবং বাঁধার চেষ্টা করলেন। তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন। স্বামী পালিয়ে যাওয়ার পর রানীর রূপে থাকা লক্ষ্মীদেবীকে অনন্তাচার্য গাছের লতা দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীকে বললেন, "তোমার স্বামী তোমার জন্য নিশ্চয়ই আসবেন! তখন আমি তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব।" লক্ষ্মীদেবী বিনীতভাবে বললেন, "আমার স্বামীর এমন বহু স্ত্রী আছেন। তিনি আমার জন্য আসবেন না। আমি তোমার কন্যার মতোই এক মহিলা। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও।" কিন্তু অনন্তাচার্য তবু তাঁকে মুক্ত করেননি।

পরদিন সকালে তিরুমালা মন্দির খুললে, ভিতরে প্রবেশ করা পুরোহিতেরা লক্ষ করলেন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বুকে লক্ষ্মীদেবী নেই। তাঁরা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, "স্বামী! লক্ষ্মীদেবী কোথায় গেলেন?" তখন স্বামী উত্তরে বললেন, "গতরাতে আমি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে অনন্তাচার্যের ফুলবাগানে বিহার করছিলাম। অনন্তাচার্য আমাকে বাঁধার চেষ্টা করলেন। আমি পালিয়ে এলাম, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সেখানে বন্দি হয়ে পড়লেন।" তখন পুরোহিতেরা অনন্তাচার্যের বাগানে ছুটে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন। ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীদেবী সেখানে একটি বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছেন। অনন্তাচার্য ভক্তিভরে লক্ষ্মীদেবী বিগ্রহকে একটি ঝুড়িতে রেখে মন্দিরে নিয়ে এলেন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বুকে স্থাপন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

এই লীলার স্মৃতিস্বরূপ, আজও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ও লক্ষ্মীদেবীকে অনন্তাচার্যের বাগানে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। তিরুমালায় অবস্থিত অনন্তাচার্যের সমাধিতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ফুলমালা নিবেদন করে, শঠগোপম্ দ্বারা অনন্তাচার্যকে আশীর্বাদ দেওয়া হয়। অনন্তাচার্যের

আবির্ভাব তিথিতেও একই রীতি অনুসরণ করে পূজা সম্পন্ন হয়। অনন্তাচার্যের সমাধি থেকে একটি তালগাছ জন্ম নিয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, অনন্তাচার্য সেই তালগাছ রূপে পুনর্জন্ম নিয়েছেন।

শ্রী বেদান্ত দেশিক

বেদান্ত দেশিক তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের নিকটে অবস্থিত 'থুপুল' নামক গ্রামে অনন্তসূরি ও তোতারাম্বা নামে এক দম্পতির ঘরে ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মনাম ছিল ‘ভেঙ্কটনাথন’। প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে বীররাঘবাচার্য গোবিন্দরাজ স্বামীর মন্দিরে বেদান্ত দেশিকের জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনন্তসূরি ও তোতারাম্বা নিঃসন্তান ছিলেন বলে তিরুমলার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে সর্বদা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতেন।

একদিন অনন্তসূরি স্বপ্নে দেখতে পেলেন ভেঙ্কটাচলপতি একজন বালকের রূপে দর্শন দিলেন এবং মন্দিরের একটি ঘণ্টা হাতে দিয়ে বললেন, "এই ঘণ্টাটি তোমার স্ত্রীর দ্বারা গিলাও। তোমাদের পুত্রসন্তান লাভ হবে।" এই বলে তিনি অদৃশ্য হলেন। সেই একই স্বপ্নে তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর পত্নী, একজন সতী নারী হিসেবে, সেই ঘণ্টাটি গিলেছেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর স্বপ্নের ঘটনা স্ত্রীকে বললে, স্ত্রীও জানালেন যে তিনি একই স্বপ্ন দেখেছেন। এই কথা শুনে দু’জনেই বিস্মিত হলেন।

মন্দিরের ঘণ্টাটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় পুরোহিতরা সেই খবর মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তাকে জানান। তখন স্বয়ং ভেঙ্কটাচলপতি রামানুজাচার্যের পরম্পরায় আসা সেই প্রধান কর্মকর্তার কাছে স্বপ্নে এসে ঘণ্টাটি কীভাবে অদৃশ্য হলো, কেন, তা ব্যাখ্যা করেন। প্রধানাধিকারিও ঐ পূণ্য দম্পতির কাছ থেকে সেই একই স্বপ্নের কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হন।
তোতারাম্বা সেই ঘণ্টাকে বারো বছর পর্যন্ত গর্ভে ধারণ করার পর বেদান্ত দেশিক জন্মগ্রহণ করেন।

বেদান্ত দেশিক পরবর্তীতে তিরুমালায় এসে বহু বছর ধরে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা করেন। তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর করুণার প্রশংসা করে "দয়া শতকম্" নামে ১০৮ শ্লোকবিশিষ্ট এক মহাগ্রন্থ রচনা করেন।

এই গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকের ভাবানুবাদ: "যেমন ইক্ষুরস (আখের রস) অত্যন্ত মিষ্ট হয়, সেই রস যখন সিদ্ধ হয়, তখন তা চিনিতে পরিণত হয়। তেমনি শ্রীনিবাসের করুণা গলে গিয়ে ভেঙ্কটগিরি পর্বতে পরিণত হয়েছে। আমি সেই ভেঙ্কটগিরিকে প্রণাম জানাই। শ্রীনিবাসের দয়া নামক হ্রদে স্নান করছেন সেই সহিষ্ণু ও করুণাময় শঠগোপ, নাথমুনি, যামুনাচার্য এবং তাঁদের বংশপরম্পরায় আসা অন্যান্য আচার্যরা। বেদগুলি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় কেবলমাত্র কিছু বিশেষ মানুষই তা থেকে উপকৃত হতে পেরেছেন।

কিন্তু সেই বেদের সারমর্মকে আল্বরগণ 'দিব্য প্রবন্ধ'-এর মাধ্যমে সবার জন্য উপলব্ধ করেছেন।
আল্বরগণ পরম পুরুষ ভগবানের করুণার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমি সেইসব আল্বরদের প্রতি প্রণতি নিবেদন করছি। যেমন ভাগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গা নিয়ে এসে কপিলমুনির ক্রোধে ভস্মীভূত হওয়া পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেন, তেমনিভাবে পরাশরমুনি প্রমুখ ঋষিরা বিষ্ণু পুরাণ, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে ঈশ্বরজ্ঞানের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত আমার মতো লোকদের শ্রীনিবাস, যিনি লক্ষ্মীকান্ত, তাঁর দয়া নামক ঐশ্বরিক গঙ্গায় স্নান করিয়ে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার উপযুক্ত করে তুলেছেন।"

যেমন একটি বড় জলাধার থেকে খালপথে জল প্রবাহিত হয়ে ফসলকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, তেমনি শ্রীনিবাসের "করুণা" নামক হ্রদ থেকে বিষ্বকসেন উদ্ভূত হয়ে সকল বাধা বিঘ্নসমূহকে দূর করে, সেই করুণাকে বিতরণ করে আমাদের রক্ষা করছেন। আমি সেই বিষ্বকসেনের প্রতি প্রণতি জানাই। যেমন একটি মা তার শিশুকে দুধ পান করিয়ে লালন পালন করে, তেমনি সমস্ত জীবজগতের জননী লক্ষ্মীদেবী "জ্ঞান" নামক দুধ পান করিয়ে

আমাদের সকলকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছেন। হে করুণাময়ী! তুমি অঞ্জনাদ্রি পর্বতের অধিপতি শ্রীনিবাসকে আনন্দিত করছো। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—আমার দ্বারা সংঘটিত পাপসমূহ থেকে আমাকে রক্ষা করো।
হে দয়াদেবী! তুমি শ্রীনিবাসের সহধর্মিণী! তুমি সেই মহাশক্তি, যাকে শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণ স্থিরভাবে বিশ্বাস করেন যে তুমি পাপী জীবদের পাপ থেকে উদ্ধার করো।

হে দয়াদেবী! শ্রীনিবাস "দয়ালু" (করুণাময়) নামে খ্যাত হলেন শুধু তোমার কারণে। তাই শ্রীনিবাসকে ছেড়ে সকলে তোমাকেই আশ্রয় করছেন। পাপসমূহ তোমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যখন জীবেরা শ্রীনিবাসের আদেশ ভুলে যায়, তখন তাঁর মধ্যে ক্রোধ উদিত হয়। সেই ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য শ্রীনিবাস তোমাকেই আশ্রয় করেন। হে দয়াদেবী! আমি এমন বিশাল পাপ করেছি যেন তোমার বিরাট পেট পূর্ণ হয়ে যাক। কিন্তু তুমি সেই পাপ খেয়ে তৃপ্ত না হয়ে, বরং ছোট ছোট পাপীদের খুঁজে বেড়াচ্ছো। তুমি যদি এভাবে ছোট পাপ খুঁজে বেড়াও, তাহলে বড় পাপী আমি কিভাবে বাঁচব? (অর্থাৎ হে দয়াদেবী! তুমি যে দয়ার সাগর, আমি যে অপার পাপী, তাই তুমি যদি আমার পাপ গ্রহণ করে আমাকে রক্ষা করো, তবে তুমিও সন্তুষ্ট হবে)। হে দয়াদেবী! আমি হলাম সমস্ত পাপীদের সম্রাট। আর তুমি হলে সমস্ত সদগুণের সম্রাজ্ঞী।.এক জায়গায় দুই সম্রাট থাকা বিপজ্জনক। তাই তুমি আমাকে পরাজিত করে তোমার পতিদেব শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের চরণে পৌঁছে দাও।

"হে দয়াদেবী! তোমার ইচ্ছাতেই ভগবান বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হয়ে জীবদের রক্ষা করছেন, যাতে তারা পাপের ফলে বহু জন্ম নিতে না হয়। বেদগুলি নানা পুণ্যকর্ম ও ভগবানের গুণাবলির কথা বলে। কম বুদ্ধির লোকেরা এই পুণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে সংসারের সাগরে ডুবে যাচ্ছে। হে দয়াময়ী! যাঁরা তোমার করুণাপ্রাপ্ত, তাঁরাই পুণ্যকর্ম পরিত্যাগ করে এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবানের সেবা করেন। যেমন মেঘগুলি সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করে, আবার

বৃষ্টিরূপে সেই জল দিয়ে সমস্ত প্রাণীদের আনন্দ দেয়, ঠিক তেমনই তুমি শ্রীনিবাস নামক সাগর থেকে সমস্ত সদগুণ আহরণ করে, তীর্থরূপে তিরুমালায় আগত সমস্ত ভক্তদের সেই গুণসমূহ দান করছো। হে দয়াদেবী! যেমন চাতক পাখি পুকুর, নদী কিংবা হ্রদের জল পান না করে শুধু বৃষ্টির জলে তৃষ্ণা মেটায়, তেমনই যাঁরা বেদের সারবত্তা বোঝেন, সেই জ্ঞানী ভক্তগণ দেবদেবীদের নয়—শুধুমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করে এবং তোমার দয়ায় শ্রীনিবাসের শরণাপন্ন হন।”

শ্রী প্রতিবাদী ভয়ংকর আন্নান

শ্রী প্রতিবাদী ভয়ংকর আন্নান ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে, তামিলনাড়ুর কাঞ্চীপুরমের নিকটে অবস্থিত ‘হস্তিগিরিনাথার আন্নান’ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীসাম্প্রদায়ের মহাচার্য “মণবালা মহামুনি”-র নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই মণবালা মহামুনি হলেন আদিশেষের অবতার স্বরূপ।

শ্রী আন্নান ২৯ শ্লোকে সমন্বিত "ভেঙ্কটেশ্বর সুপ্রভাত", ১১ শ্লোকে থাকা "ভেঙ্কটেশ্বর স্তোত্র", ১৬ শ্লোকে গঠিত "ভেঙ্কটেশ্বর প্রপত্তি", এবং ১৪ শ্লোকে পূর্ণ "ভেঙ্কটেশ্বর মঙ্গলাশাসন"-এর রচয়িতা। এই স্তোত্রসমূহ শ্রীভেঙ্কটেশ্বর স্বামিকে প্রভাতে জাগ্রত করার সময় পাঠ করা হয়।

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্তোত্রের কিছু শ্লোকে এরূপ ভক্তিভাব প্রকাশ পেয়েছে : “হে ভেঙ্কটেশ্বর তুমি যখন শ্রীদেবীকে আলিঙ্গন করছো, তখন তাঁর চরণে থাকা কুমকুম তোমার দেহে লেগে তোমার দেহ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তুমি এই জগতের নায়ক। জয় হোক তোমার! ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয় প্রভৃতি সকল দেবতারা তোমার অধীন। যাঁরা তোমার শরণাগত হন, তুমি করুণা করে তাঁদের রক্ষা করো। হে প্রভু! আমায় রক্ষা করো। হে শ্রীহরি! আমি বহুবার নানা পাপকর্ম করেছি। আমার সেই সমস্ত ভুল তুমি ক্ষমা করো ও এই মূর্খকে শীঘ্র রক্ষা করো। তুমি আমাদের যে বর চাই আমরা চাই না তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ

বর দান করো। তুমি শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের চেয়েও উচ্চতর বেদ এভাবেই তোমার স্তব করে।

হে গোপালস্বামী! তোমার মধুর বেণুবাদনে গোপীরা আকৃষ্ট হয়ে তোমার চারদিকে সমবেত হয়। তুমি কোটি কামদেবের সৌন্দর্যের অধিকারী, এবং সমস্ত গোপীদের আনন্দের উৎস। হে বাসুদেব! তোমার ছাড়া আমার আর কেউ নেই। হে দাশরথি! (শ্রীরামচন্দ্র), তুমি ভূদেবীর কন্যা সীতার প্রিয়তম। তুমি রাবণ নামক অন্ধকারের বিরুদ্ধে সূর্যস্বরূপ। হে রঘুরাম! মহাপুরুষ! আমি তোমার শরণাগত। আমায় রক্ষা করো। হে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী! আমি বহু দূর হতে এসেছি তোমার চরণে ভক্তিভরে সেবা করছি। আমি যদি একবারও তোমার সেবা করি, তুমি সেই সেবার জন্য এমন ফল দাও যা নিত্যসেবার ফলের সমান।”

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর প্রপত্তির কিছু শ্লোকের অর্থ : “এই জগতের আধিপত্য গৃহিনী, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রিয়ারূপী, অধৈর্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী, তার হাতে পদ্মবিহীত পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত লক্ষ্মীদেবীর কাছে আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। লক্ষ্মীদেবী তাঁর কচি পাতার মতো কোমল হাত দিয়ে প্রেম ও শ্রদ্ধায় মৃদু স্পর্শ করলেও ভগবানের চরন লাল লাল হয়ে যায়, সেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সুকুমার পদপদ্মে আমি শরণাগতি গ্রহণ করিতেছি।”

“তোমার চরণে লাগানো সুগন্ধি আবৃত মালার সুবাস যে কল্যাণময় ছিল, তা আরও ঘ্রাণবর্ধক হয়ে উঠেছে সেই সুন্দর পদগুলিতে আমি সর্বাঙ্গীন আশ্রয় গ্রহণ করছি। তোমার পদে স্থাপন প্রত্যেক ঐতিহ্যচিহ্ন ধ্বজা, ছাতা, অমৃত কলশ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম, কল্পবৃক্ষ, শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি অত্যন্ত পূর্ণতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে; আমি সেই সৌভাগ্যবান পদে শরণাগ্রহণ করছি। প্রতিদিন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ যখন নিজেদের মুকুট দ্বারা প্রণাম করেন, তখন সেই মুকুটে বিরাজমান রত্নসমূহের জ্যোতিতে যেন মঙ্গল আরতি সম্পন্ন হচ্ছে এরূপ ভগবানের পদপদ্মে আমি শরণাগতি গ্রহণ করিতেছি। হে

ভেঙ্কটেশ্বর! যেমন তুমি অর্জুনের রথচালক হয়ে তাঁকে বলেছিলে'আমার প্রতি শরণাগ্রহণ করো', এখন তুমি আমার জন্য এসব পদগুলি এই স্থলে বলছো 'আমার চরণে শরণ হোন'; তাই আমি সেই পদে বিনয়শীলভাবে আশ্রয় গ্রহণ করছি।"

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মঙ্গলাশাসন কিছু শ্লোকের ভাবার্থ :
"লক্ষ্মীদেবীর স্বামী, সকল কল্যাণের ধনাধার, যাঁর কাছে সকল ইচ্ছার ভাণ্ডার নিহিত তিনি করুণাময় ভেঙ্কটগিরির অধিবাসী শ্রীনিবাস মঙ্গল হো। লক্ষ্মীদেবীকে বিস্ময়ে দেখতে অভিষ্কৃত সুন্দর দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁর সৌন্দর্যে সমস্ত প্রাণকে মোহনীয় করছেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মঙ্গল হও, যিনি অবিনাশী, অপার দোষরহিত, সত্য চেতন আনন্দস্বরূপ, সদগুণে পূর্ণ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান তাঁকেই আমার অশেষ শুভাশিষ্!

"সমস্ত মানবজাতির জন্য নিজের পদপদ্মই আশ্রয় এইরূপ করিয়া যিনি ডান হাতে পদপদ্ম নির্দেশ করিতেছেন, যাঁহার পরিধেয় মালা, অলঙ্কার, পীতাম্বর ও অস্ত্রাদি সমস্তই সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, সেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মঙ্গল হউক। যিনি বৈকুণ্ঠে বাস করতে না পছন্দ করে পুষ্করিণীর তীরে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ বিহার করেন তাঁকেই শুভাশিষ্! মণবাল মহামুনির অন্তরে ও সমস্ত মহাজগতের চেতনায় অধিষ্ঠিত শ্রীনিবাস তাঁকেই শুভাশিষ্! নানাজাগতিক পূর্বাচার্যরা যাঁকে যজ্ঞ-গান করে পূজা করেছেন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রতি আমি জানাই অমোঘ শুভাশিষ্!"

সুপ্রভাতের জন্য শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের সেবা ও দর্শনীয় স্থানসমূহ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের দর্শনে দেখুন।

শ্রী অন্নামাচার্য

তাল্লাপাক নামে একটি গ্রামে জনমেজয় মহারাজ নির্মিত চেন্নকেশব স্বামীর মন্দির ছিল। চেন্নকেশব মন্দিরের পূজারী ছিলেন ভিত্তালাইয়া,

যিনি কৃষিকাজও করতেন। ভিত্তালাইয়া তার একমাত্র পুত্র নারায়ণাইয়্যাকে পড়াশোনার জন্য কাছের উটকুর গ্রামে পাঠালেন।

নারায়ণাইয়্যার গুরু ছিলেন দুর্বাসা মুনির মতো রাগী প্রকৃতির। নারায়ণাইয়্যর স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল। গুরুর কাছ থেকে নিরন্তর তিরস্কার ও নিপীড়নের ফলে নারায়ণাইয়্য আত্মহত্যা করতে চাইলেন। গ্রামবাসীরা বলছিলেন, গ্রাম সীমানার চিঁতলাম্মার মন্দিরের পাশে একটি গর্তে বিষধর সাপ আছে। এই কথা শুনে, একরাতে নারায়ণাইয়্য সেই গর্তে গিয়ে তার হাত ঢুকিয়ে দিলেন যাতে সাপে কামড়ায়। চিঁতলাম্মা দেবী স্বয়ং প্রকাশ পেয়ে বললেন, "তুমি কেন মরতে চাইছো?" তখন নারায়ণাইয়্য তার দুঃখের কাহিনী বললেন, গুরুর আচরণ নিয়ে সব কিছু খুলে বললেন। তখন চিঁতলাম্মা বললেন, "তুমি একদিন একজন মহান পণ্ডিত হবে, শুধু তাই নয় তোমার নাতি শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর একজন মহান ভক্ত হবেন।" দেবী এইভাবে আশীর্বাদ দিলেন। কালের পরিবর্তনে নারায়ণাইয়্য সত্যিই একজন পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। পরে তার বিবাহ হয় এবং এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় নারায়ণসুরি।

নারায়ণসুরির বিবাহ হয়েছিল লক্কাম্বার সঙ্গে। কিন্তু দম্পতির সন্তান ছিল না। তখন তাঁরা ভেঙ্কটাচলমে গিয়ে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে প্রার্থনা করেন “আমাদের এমন একটি সন্তান দিন, যিনি আপনার মহান ভক্ত হবেন।” ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায়, ১৪০৮ সালের ৯ই মে, বিষ্ণুর খড়্গ সদৃশ (নন্দক)নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। নারায়ণসূরি তাঁর নাম রাখলেন অন্নমাইয়া (অন্নামাচার্য)।

অন্নমাইয়ার মা লক্কাম্বা, এবং পরিবারের অন্যান্য বড়রা, অন্নমাইয়াকে মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, ও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মাহাত্ম্য সম্পর্কিত কাহিনিগুলি বলতেন। শৈশবে অন্নমাইয়া বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় কাটাতেন। একবার, যখন অন্নমাইয়ার বয়স আট বছর, তখন তাঁর বাবা-মা তাঁকে বললেন, "গিয়ে একটু ঘাস কেটে আনো," এবং একটি কুড়ুল (কোদালী) দিয়ে পাঠালেন। ঘাস

কাটতে গিয়ে তাঁর আঙুল কেটে যায়। সেই সময় কিছু ভক্তরা ভেঙ্কটাচলম (তিরুমলা) দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখে অন্নমাইয়া সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁদের সঙ্গে তিরুমলা যাত্রা করবেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে তীর্থস্নান করেন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন, ও ভক্তিভরে কীর্তন করতে থাকেন।

অন্নামাচার্য নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায়, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ভেঙ্কটাচল পর্বতে যান। সেখানে তাঁরা অন্নামাচার্যকে দেখে তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন, কিন্তু তিনি ফিরতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁর পিতা নারায়ণসূরি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে প্রার্থনা করেন যেন তাঁর পুত্র বাড়ি ফিরে আসেন। সেই রাতেই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী অন্নামাচার্যের স্বপ্নে এসে বলেন: "তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে বিবাহ করো এবং আমার গৌরব সর্বত্র প্রচার করো।" অন্নামাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর আদেশ অনুসারে বাড়ি ফিরে আসেন এবং কয়েক বছর পর অক্কালাম্মা ও তিরুমালাম্মা নামক দুইজনকে বিবাহ করেন।এরপর তিনি অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

অন্নামাচার্য আহোবিলম অঞ্চলের শ্রী শতগোপমুনি নামক এক শ্রীবৈষ্ণব আচার্যের কাছ থেকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত শিখে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর গুরু শতগোপমুনির গুণকীর্তন করে একটি কীর্তন এইভাবে রচনা করেন। “যিনি মোক্ষের পথ দেখান, যিনি সকল ভক্তদের জন্য সহজগম্য, যিনি হরির প্রিয় সেই শতগোপমুনিকে দর্শন করুন। যিনি শ্রীরঙ্গনাথ, বরদরাজ স্বামী, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী, এবং আহোবিলমের নরসিংহ স্বামীর সেবায় নিষ্ঠাবান সেই শতগোপমুনিকে সকলে দর্শন করুন ও প্রণাম করুন।”

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী কীর্তনাবলী : অন্নমাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উপর অনেক কীর্তন রচনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে কিছু কীর্তনের ভাবনা:

“পদ্মফুলের মতো সুন্দর চোখ, চির পারিপার্শ্বিক হাসি,

অসাধারণ শরীর ঐ পরমাধাম সেজে রয়েছেন। পাট্টু পোশাক জ্বলজ্বল, নন্দক ঝলমল করে, নাভিতে কমল ফুল, হাতে শঙ্খ-চক্র; বক্ষস্থলে দেখা দেয় কৌউস্তুভ রত্ন, গলায় রত্নমালা, স্বর্ণহার, ভরা বাহুতে আলোকিত "ভুজকীর্তি", সাদা মুক্তার মালা; শিরায় বজ্রমুকুট শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর সুন্দর সজ্জিত আছে"

"ও ভেঙ্কটেশ্বর! আমার ইচ্ছাগুলো পূরণের জন্য তোমার নাম যথেষ্ট; আমাকে পবিত্র করার জন্য তোমার তীর্থ (চরণামৃত) যথেষ্ট; আমার পাপ মুছে দিতে তোমার প্রসাদ যথেষ্ট। আমাকে মহান করে প্রতিষ্ঠা করতে তোমার সেবা যথেষ্ট; আমাকে রক্ষা করতে যে তিলকের স্মৃতি আছে আমার, সেটাই যথেষ্ট; সুখ পেতে তো শুধু তোমাকে স্মরণ করলেই আমি আর অন্য কোথাও যাব না, তোমারই করুণায় তো সবটুকুই যথেষ্ট।"

"ও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী! সকাল হচ্ছে আমাদের অনন্য আকাঙ্ক্ষাগুলো শুনতে হঠাৎ করেই জাগো, তোমাকে সেবা করতে দেবতা ও মুনি সবাই এসেছেন; তাদের সেবা আদান করতে তোমার পদ্মের মতো নীরব চোখ খুলে জাগো, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষরা তোমার মহিমা গাইছে তারা শুনে চলেছে জাগো! আদিশেষ, তুম্বুর, নারদ, ব্রহ্মা তোমার পায়ে প্রনাম দিতে অপেক্ষা করছে; জাগো, জগন্মাতা আলমেলুমঙ্গলময়ী– তোমায় চোখ দিয়ে দেখছে."

"ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর হাত অগণনকে আশীর্বাদ দিয়েছে:মৎসা অবতারে: ব্রহ্মদেবের জন্য বেদ উদ্ধার করেছে।কূর্ম অবতারে: মন্দার পর্বতকে কাঁধে তুলে রয়েছেন।বরাহ অবতারে: ভূ-মাতাকে কোলে পূর্ণ করেছেন।নরসিংহ অবতারে: শক্তিশালী কণ্ঠে ধ্বনিময় ও তাঁর হাত। বামন অবতারে: বলি চক্রবর্তীর কাছ থেকে দান গ্রহণ করেছে। পরশুরাম অবতারে: ভক্তদের দান দিয়েছেন। রাম অবতারে: সমুদ্রকে ধনু-শিখার কাছে এনেছেন। বলরাম অবতারে: হাল ধরে সহযোগীতা করেছেন। কৃষ্ণ অবতারে: গোপিকে স্পর্শ করেছেন। কল্কি অবতারে: তলোয়ার ধারণ করে চলেছেন।"

“ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী পাহাড়সম অনুগ্রহ বরদান করেন। পাত্র তৈরি করে জীবনযাপনকারী কুমার (ভক্ত ভীম) কে কাঙ্খিত মোক্ষ প্রদান করেন। তুণ্ডমান যেখানে যেতে বলেছিলেন সেখানে গিয়েছিলেন। অনন্তাচার্য খনন করা মাটি বহন করেছিলেন। তিরুমল নম্বি যেভাবে অনুরোধ করেছিলেন, সেইভাবে কথোপকথন করেছিলেন। কাঞ্চি বরদরাজ স্বামীর ভক্ত, তিরুক্কাচ্চি নম্বিকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। যাঁরা তাঁকে স্মরণ করেন, তাঁদের করুণায় রক্ষা করেন।”

“নারায়ণ! তোমায় প্রণাম। নারদ মুনি ও শিবের দ্বারা স্তুতিপ্রাপ্ত তোমায় প্রণাম। মুর নামে রাক্ষসকে বধকারী! মুকুন্দ নামক রত্ন ধারণকারী! শ্রীদেবীর স্বামী! গরুড় বাহন! পদ্ম সদৃশ নাভি বিশিষ্ট! পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! বন্ধনযুক্ত জীবদের সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দানকারী! তোমায় প্রণাম। সূর্য ও চন্দ্র যাঁর নেত্ররূপে বিদ্যমান! ব্রহ্মা দ্বারা স্তুতিপ্রাপ্ত! ক্ষীর সাগরে যিনি শয়ান! বলি চক্রবর্তিকে যিনি আবদ্ধ করেছিলেন! গোপীদের প্রিয়! দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা! চতুর্বেদ দ্বারা স্তুতিপ্রাপ্ত! আমার প্রতি করুণাময় হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় আমার প্রণাম।”

“ভেঙ্কটেশ্বরের পদধূলি ব্রহ্মা দ্বারা ধৌত (অভিষেক) হয়েছিল। বামন অবতারে যিনি পৃথিবী পরিমাপ করেছিলেন, সেই পাদ। বলি চক্রবর্তীর মাথায় স্থাপিত হয়েছিল সেই পাদ। আকাশ দখল করেছিল সেই পাদ। ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিল সেই পদযুগল। অহল্যার পাপ নাশ করেছিল সেই পাদ। কালীয় নাগের শিরে নৃত্য করেছিল সেই পাদ। লক্ষ্মীদেবী সেবা করেন সেই পাদ। যোগীদের রক্ষা করে সেই পাদ। শ্রেষ্ঠ তিরুমলা পর্বতে স্থায়ী সেই পাদ মোক্ষ প্রদান করে।”

শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনাবলী : অন্নমাচার্য শ্রীকৃষ্ণের উপর অনেক কীর্তন রচনা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি কীর্তনের ভাবনা নিম্নরূপ:

অর্ধরাত্রিতে যশোদা মাতার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন সেই শিশু, যিনি পুতনা রাক্ষসীর স্তনের দুধ পান করেছিলেন, গরু চরিয়েছিলেন, বেলগাড়ি ভেঙেছিলেন, যমল-অর্জুন গাছ উল্টে দিয়েছিলেন, কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন, গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুরলি ধারী, কালীয় নাগের অহংকার দমনকারী, কংসকে বধকারী, দেবতাদের শাসন করে নিজের শক্তি প্রদর্শনকারী, ষোলো হাজার রাণীদের পালনকারী।

"হে যশোদাম্মা! কৃষ্ণের শরীর দোলাতে যেও না, কারণ ওভাবে দোলালে ওঁর পেটে থাকা অসংখ্য জগত কেঁপে উঠবে। দুধ ফুটছে, দুধ উপচে পড়ছে – ঐ দুধের নিকটে থাকা কৃষ্ণকে দূরে সরিয়ে নিন। আমাদের বালক কৃষ্ণকে কোমর থেকে ধরে তুললে তাঁর উদরের জগতগুলি দমন হয়ে যাবে, সেজন্য ওভাবে তুলো না। হে মা! এইভাবে কৃষ্ণকে কষ্ট না দিয়ে তাঁকে দোলনায় আরামে শুইয়ে দাও।"

"ভেঙ্কটাচল পর্বতে অবস্থানরত ভেঙ্কটেশ্বর (কৃষ্ণ) কে কঠিন বাক্য দ্বারা তিরস্কার করোনা। তিনি শিশু হলেও সর্বশক্তিমান। তাঁর প্রতি সদয় হও, কারণ তিনি সকল জগতের ধারণকারী।"

"হে কৃষ্ণ! বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত তুমি কনিষ্ঠ আঙুলে তুলে ধরেছিলে, কিন্তু তোমার সেই অসীম শক্তিকে গোপীরা পুরোপুরি বুঝতে না পেরে তোমার সম্পর্কে নানা নিন্দা করত। এই ছোট্ট কৃষ্ণই দেবকীর গর্ভে জন্ম নিয়ে যশোদার ঘরে শিশু হয়ে বেড়ে উঠলেন। চতুর্দশ ভুবনের স্রষ্টা ব্রহ্মার জন্যও এই বাল কৃষ্ণ ছিলেন এক পিতার তুল্য। বহুবার কৃষ্ণ বাড়ির ছাদে উঠে মাখনের হাঁড়িগুলি ভেঙে দিতেন। এক গোপী যখন কৃষ্ণকে মারতে যাচ্ছিলেন, তখন আরেকজন বললেন 'হে মা! কৃষ্ণকে মারো না। এমন অপরূপ সুন্দর রূপকে দেখে তোমার কেমন করে রাগ হয়?' গ্রামের সব ঘরের মাখন খেয়ে কৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতেন। গোপীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন, সেইসব শুনে রাগ কৃষ্ণকে মারতে যেতেন, কিন্তু

কৃষ্ণ ‘মা! মা! আমায় মারো না, আমি কিছু ভুল করিনি’ বলে যশোদার পায়ে লুটিয়ে পড়তেন। অনেক সময় অনেক গোপী একসাথে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এলেও, কৃষ্ণ যেন নিরীহ শিশু হয়ে যশোদার কাছে বসে দুধ খেতেন। সমস্ত জগতের মূল কারণ সেই কৃষ্ণ, এখন ভেঙ্কটাচলে ভেঙ্কটেশ্বর স্বরূপে বিরাজ করছেন।”

“ঝুলনায় শুয়ে থাকা ছোট্ট কৃষ্ণকে দেখে গোপিনীরা কাছে এসে সেই ঝুলন দোলাতে লাগলেন। সদ্য যৌবনে পদার্পণ করা গোপিনীরা সোনার ঝুলনার কাছে এসে শিশুদের ঘুম পাড়ানোর গান গাইতে লাগলেন ‘লালি লালি লালাম্মা’। পদ্মফুলের পাঁপড়ির মতো নয়নবিশিষ্ট গোপিনীরা তাঁদের পায়ের নূপুরের ধ্বনি ‘ধিমি ধিমি’ তোলে বাজাতে বাজাতে ভেঙ্কটেশ্বরের (বাল কৃষ্ণের) কাছে এসে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।”

শ্রীরামের বন্দনা : আন্নামাচার্য বহু স্তোত্র রচনা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে, সেগুলির মধ্যে একটির ভাবার্থ:

“হে রাম! তুমি সেই মহাপুরুষ, যিনি বিশাল সমুদ্রকে পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে, ভ্রাতা লক্ষ্মণের হৃদয়ে আনন্দ ছড়িয়ে দিলে। তুমি শিবের ধনুক ভেঙে সীতাকে বিবাহ করলে। তুমি সুগ্রীবকে রক্ষা করে কৌশলের রাজ্য শাসন করলে। বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞকে রক্ষা করলে, কৌশল্যার পুত্র রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে। তোমার জয় হোক, হে রাম! তুমি রাবণ নামক দুষ্ট রাক্ষসকে ধ্বংস করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করলে। তুমি সূর্যবংশে জন্ম নিয়ে মুনিদের রক্ষার জন্য ধনুক ধারণ করলে। তুমি অহল্যাকে মুক্তি দিলে, এবং মহাদেবের পত্নী পার্বতীও তোমার গুণে মুগ্ধ হয়ে স্তব করলেন। তুমি তোমার বীরত্ব দিয়ে মায়াবিনী দানবকেও পরাজিত করলে।

তুমি সেই রাম, যিনি লাভ ও কুশের স্নেহভাজন। গুণে ভরপুর, আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছ। তুমি কামদেবের থেকেও অধিক মোহনীয়। ভক্তদের অন্তরে চিরকাল বাস করো। সুন্দর অযোধ্যা

নগরীতে তুমি বাস করছ। এখন সেই মহান রাম আমাদের সম্মুখে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর রূপে প্রকাশ হয়েছে। তাঁকে প্রণাম জানাও, সেবায় নিয়োজিত হও—এই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সেটিই।"

হরি নাম সম্পর্কে: অন্নমাচার্য বহু কীর্তন রচনা করেছেন হরি নাম নিয়ে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি কীর্তনের ভাবার্থ:

"ভেঙ্কটেশ্বর! তোমার নামই আমাদের ভরসা। সেটাই আমাদের সঞ্চিত ধন। তোমার নামই জীবের কাছে তোমার পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলে। ভেঙ্কটেশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীধর, পদ্মনাভ, দামোদর, কৃষ্ণ এইসব তোমার নামসমূহকে আমি প্রণাম জানাই।"

"সব মন্ত্রই ভেঙ্কটেশ্বর মন্ত্রের মধ্যেই বিদ্যমান। নারদ মুনি সদা নারায়ণ মন্ত্রই কীর্তন করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ নরসিংহ মন্ত্র লাভ করেছিলেন। বিভীষণ পেয়েছিলেন শ্রীরাম মন্ত্র। ধ্রুব পেয়েছিলেন বাসুদেব মন্ত্র। অর্জুন পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র জপ করতেন। আমার গুরুশ্রী শতগোপ স্বামীর মাধ্যমে আমি জ্যোৎস্নার মতো নির্মল ভেঙ্কটেশ্বর মন্ত্র লাভ করেছি।"

"ভক্তগণ! যখন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, অন্যেরা বেঁধে রেখেছে তখন দীপ্তিমান শ্রীহরি নামই একমাত্র গতি। অন্য কোনও পথ নেই। বিপদের সময়, অপমানিত হলে, পাপ করলে, ভয়ে পড়লে হরি নামই গতি। শ্রীহরি নাম ছেড়ে অন্য পথ খুঁজলেও অন্য কোনও গন্তব্য মেলে না। শৃখলে বাঁধা হলে, কেউ মারতে এলে, ঋণদাতারা কষ্ট দিলে ভেঙ্কটেশ্বর নামই তোমাকে সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করবে। তুমি যদি মূর্খ বুদ্ধি নিয়ে অন্য কোনও মন্ত্র খুঁজো বা জপ করো, তবুও তোমার জন্য আর কোনও পথ নেই।"

"ভক্তগণ! বেদনা, ক্রোধ এবং কষ্টকে বিনষ্টকারী ভেঙ্কটেশ্বরের নাম সকলকে আনন্দ দান করে। হরিনাম সমস্ত প্রাণীদের রক্ষা করে।

সেইজন্য বেদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হরিনাম সদা জপ করুন। হরিনাম সকলের নাগালের মধ্যে থাকে। এটি মোক্ষ প্রদান করে। ব্রহ্মা সর্বদা হরিনাম জপ করেন। হিমালয়রাজের কন্যা পার্বতী দেবীও মন দিয়ে এই হরিনাম চিন্তা করেন। হরিনাম নামক অমৃতই কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? এর চেয়ে রুচিকর আর কিছু কি আছে? জন্ম-মৃত্যুকে দূর করতে, দশ হাজার নরকের কূপ থেকে মুক্ত হতে, দারিদ্র্য ও দোষ থেকে মুক্ত হতে, পাপের অন্ধকার দূর করতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী কল্পবৃক্ষস্বরূপ হরিনামই যথেষ্ট।”

কলিযুগের বিদ্যা : কলিযুগের বিদ্যা সম্পর্কে অন্নমাচার্য এইরূপে একটি কীর্তন রচনা করেছিলেন।

“এই কলিযুগে যেই দিনের বিদ্যা, সেই দিনেই সীমাবদ্ধ। (এই জন্মে পড়া এই জন্মেই থাকে, পরের জন্মে পড়লে পরের জন্মেই থাকে)। ভগবন্তকে জানার উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা বিদ্যা অর্জন করতেন। কলিযুগে বিদ্যা হচ্ছে ভেঙ্কটেশ্বরকে ভুলে যাওয়ার জন্য। সৃষ্টিকর্তাকে (ভগবানকে) অস্বীকার করতেই এই কলিযুগের বিদ্যা ব্যবহৃত হচ্ছে। ভেঙ্কটেশ্বরের দর্শনের জন্যই ব্রাহ্মণরা বিদ্যা অর্জন করতেন। কিন্তু ধন-সম্পদ এবং ভোগ বিলাসের জন্য যেসব বিদ্যা রয়েছে, সেগুলো ভেঙ্কটেশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। যেই বিদ্যা বিষ্ণুকে হৃদয়ে স্থাপন করতে পারে না, সেই বিদ্যাই অকেজো বিদ্যা।”

আধ্যাত্মিক কীর্তনসমূহ: অন্নমাচার্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য বহু কীর্তন রচনা করিয়াছেন। সেই সকল কীর্তনের মধ্যে কয়েকটির ভাবার্থ নিম্নরূপঃ

জীবিত মানুষটি কার? সে কার কী হয়? এই জীবাত্মা (আত্মা) পূর্বজন্মে অনেকজনের সন্তান হয়েছে, অনেকের ভাই হয়েছে, অনেকের আত্মীয় হয়েছে। এই জন্মে সে অনেককে দুঃখ দিচ্ছে, ভবিষ্যত জন্মেও আরও অনেককে দুঃখ দেবে। এই আত্মা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? কত জায়গায় জন্ম নিয়ে কতজনকে আত্মীয়

করেছে? আগামী জন্মে এই আত্মা কোথায় যাবে? যদি গভীরভাবে ভাবি, আত্মার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। আত্মা ধারণ করা শরীরগুলো নশ্বর, কিন্তু আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না। এই আত্মা, যা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের মায়ায় আবদ্ধ, বহু জন্ম গ্রহণ করে কখনো পুত্র, কখনো ভাই, কখনো পিতা, কখনো পিতামহরূপে বিভিন্ন ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে।

জন্ম সত্য, মৃত্যু সত্য, এই দুইয়ের মাঝে জীবন এক নাটক। যে আহার আমরা করি তা ভাত, আর যে পরিধান করি তা বস্ত্র – এই দুইটির জন্য চালানো সংগ্রামও এক নাটক বৈ কিছু নয়। এই আত্মা কার? কাকে কী হবে? তাই আত্মা ও এই জগতের প্রকৃতি জানো এবং মোক্ষ লাভ করো।

স্বপ্নের মধ্যে দেখা স্বপ্নের মতোই সম্পদগুলো চিরস্থায়ী নয়। পারিবারিক ভালোবাসাগুলো আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণিক। ও মন! এই ক্ষণস্থায়ী সুখগুলোর দাস হয়ো না। এই জগত একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই পৃথিবী সবাইকে মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। শরীর বুড়ো হয়ে যায়, কিন্তু মনটি তরুণ থাকে ইচ্ছেগুলোকে জাগিয়ে তোলে। ও মন! (ও জীবাত্মা!) সন্ধ্যাগুলোই মৃত্যুর প্রতীক, প্রভাতগুলো জন্মের।ও জীবাত্মা! যদি তৃপ্তি থাকে, তাহলে অল্প পেলেও তৃপ্তি হয়। কিন্তু যদি তৃপ্তি না থাকে, তাহলে গোটা জগত পেলেও মন ভরে না। ও জীব! যৌবনের বাসনাগুলো পূরণ করা তোমার সাধ্যের বাইরে। পুকুরে যত জল থাকুক না কেন, পদ্মফুল সবসময় তার উপরে থাকে। তেমনই, তোমার শক্তি যতই থাকুক, তার চেয়ে বেশি বাসনা তোমার মনে জন্ম নেবে।সারা জীবন কাজ করলেও এই বাসনাগুলো ফুরাবে না। তাই, এই ভৌতিক বাসনাগুলো ত্যাগ করে, লক্ষ্মীপতি ভেঙ্কটেশ্বরের শরণ নাও।

ভেঙ্কটেশ্বর! জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রায় আমি ক্লান্ত। আর হাঁটার শক্তি নেই। এই মুহূর্তে, তুমিই আমাকে রক্ষা করো। আমি যে বাসনাগুলো পুষেছি, সেগুলো কেবল তোমার কৃপা দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে।পাপ ও

পূণ্যর শৃঙ্খল এই আত্মাকে বেঁধে রাখছে।তুমি এই বন্ধন ছিন্ন করে আমাকে মোক্ষ দান করো।

পেনুগোন্ডা রাজ্যের শাসক সালভ নরসিংহ রায় তার দরবারে আন্নামাচার্যকে গুরু হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। আন্নামাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ও পদ্মাবতী দেবীর গুণগান করে বহু কীর্তন রচনা ও গাইতেন। রাজা নরসিংহ রায়ালু সেই কীর্তনগুলি শুনে একদিন আন্নামাচার্যকে বললেন "আমার প্রশংসায়ও একটি কীর্তন গাও।" তখন আন্নামাচার্য "হরি! হরি!" বলে কানে আঙুল দিয়ে বললেন "আমার জিহ্বা নারায়ণের স্তব করার জন্য, কোন মানুষের প্রশংসার জন্য নয়।"

এই কথায় রাজার অহংকার আহত হয়। রাজা রাগে ফেটে পড়ে আন্নামাচার্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন।কারাগারে থেকেও আন্নামাচার্য ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বন্দনা করে কীর্তন গাইতে লাগলেন। কীর্তনের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাত-পায়ে বাঁধা শিকলগুলি ভেঙে পড়ে গেল। এই অলৌকিক ঘটনা সৈন্যরা রাজাকে জানালে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেননি। পরবর্তীতে রাজা নিজেই এসে দেখলেন যে শিকলগুলি মাটিতে পড়ে আছে। তারপর রাজা নিজ হাতে আবার শিকল দিয়ে আন্নামাচার্যকে বাঁধলেন।

তবে এবার রাজা নিজ চোখে দেখলেন শিকলগুলো স্বয়ং খুলে পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আন্নামাচার্যের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আন্নামাচার্য রাজাকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন "ভক্তদের এমন অসম্মান কক্ষনো করো না।" তারপর তিনি বুঝলেন যে রাজাদের কাছে থাকা শোভন নয়, তাই রাজসভা ছেড়ে তিরুমালায় চলে গেলেন, সেখানে ভক্তদের সঙ্গে থেকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা ও কীর্তনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

রাজারা এবং ধনীদের প্রয়োজন ভক্তদের নেই অন্নমাচার্যের কীর্তন : "আমরা (বিষ্ণুভক্তরা) বিষ্ণুমূর্তির দাস হিসেবে

জন্মগতভাবেই ঐশ্বর্যশালী। জন্মের পর পদমর্যাদা অর্জন করে প্রভু হয়ে ওঠা লোকদের ধন আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা লক্ষ্মীদেবীর স্বামীর শরণ গ্রহণ করেছি বলে অন্যদের ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আমাদের ধন দিক বা না দিক, আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত সম্পদ পাওয়া যায় তা ভূদেবী থেকে আসে।

ভূদেবী হলেন নারায়ণের পত্নী। আমরা নারায়ণের দাস। সেই কারণে নারায়ণ আমাদের রক্ষা করে সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করেন। এই কারণে অন্যদের সম্পদের আমাদের দরকার নেই। এই জগতের পদমর্যাদা ব্রহ্মা দেন। ব্রহ্মার পিতা হলেন নারায়ণ। নারায়ণই আমাদের প্রভু। ব্রহ্মা দ্বারা নিযুক্ত প্রভুদের সঙ্গে আমাদের কোনো কাজ নেই। হে ভক্তগণ! আপনারা যত পুরাণই পড়ুন না কেন, যত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুন না কেন কোথাও বলা হয়নি যে, কোনো বিষ্ণুভক্ত কখনো ধ্বংস হয়েছে।”

“অন্নমাচার্য রচনা করেছিলেন ৩২,০০০টি কীর্তন।
তাঁর পুত্ররা সেগুলিকে তালপাতার উপর লিখে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে সংরক্ষণ করেছিলেন।
এই কীর্তনগুলি সংরক্ষিত যে ঘরে রাখা হয়েছে, সেটিকে ‘সঙ্কীর্তন আর’ বলা হয়।”

“প্রাচীন কালে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর বিবাহ কেবল উৎসবের সময়েই অনুষ্ঠিত হতো। অন্নমাচার্য সেই বিবাহ অনুষ্ঠানকে দৈনন্দিন আচার হিসেবে স্থাপন করেন। এইভাবে 'নিত্য কল্যাণম্' শুরু হওয়ার ফলে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী অন্নমাচার্যকে ‘মামা’ বলে সম্বোধন করেন। অন্নমাচার্য ৯৫ বছর জীবিত ছিলেন এবং ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে শরীর ত্যাগ করে বিষ্ণুলোকে (বৈকুণ্ঠ) গমন করেন।”

শ্রীপাদরাজ তীর্থ (শ্রীপাদরায়ুলু)

মধ্ব সাম্প্রদায়ের শ্রীপাদরাজ তীর্থ ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে গিরিআম্মা এবং শেষগিরিআপ্পা নামক দম্পতির ঘরে বেঙ্গালুরুর 'অব্বূরু' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মনাম ছিল 'লক্ষ্মীনারায়ণ' এবং সন্ন্যাসনাম ছিল 'শ্রীপাদরাজ তীর্থ'।

চন্দ্রগিরি শাসক সালব নারসিংহ শ্রীপাদরাজ তীর্থকে তিরুমালার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলে, শ্রীপাদরাজ তীর্থ সম্মতি দেন এবং তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থকে তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন। শ্রীপাদরাজ তীর্থ বহুবার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে সেবা করেন এবং অনেক কীর্তন রচনা করেন। সেই কীর্তনগুলির মধ্যে কিছু ভাবার্থ এমন:

"শেষাচল পর্বতে বসবাসকারী এবং দর্শনদানকারী হে ভেঙ্কটেশ্বর! আমার জিভের জন্য তোমার হরিনামই অলংকার, আমার পায়ের জন্য তোমার ধামে হাঁটা-চলা করাই অলংকার, আমার কানের জন্য তোমার কথা শোনাই অলংকার, আমার হাতের জন্য তোমার সেবা করাই অলংকার। মানবদের জন্য সম্মানই অলংকার, ঋষিদের জন্য জ্ঞানই অলংকার,তোমার মন্দিরের জন্য তুলসী বনের অলংকার,একজন পতিব্রতার জন্য স্বামীর সেবাই অলংকার।"

"দোষগুলো দূরকারী হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় জয় হোক, জয় হোক। মহিমা প্রকাশকারী হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় জয় হোক, জয় হোক। লক্ষ্মীদেবীর সাথে বসবাসকারী হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় জয় হোক, জয় হোক। ব্রহ্মার পিতা হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় জয় হোক, জয় হোক। গজেন্দ্রকে রক্ষা করা হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় জয় হোক, জয় হোক। সবাইকে মোহিতকারী সুন্দর রূপধারী হে ভেঙ্কটেশ্বর! তোমায় জয় হোক, জয় হোক।"

"শ্রীনিবাস! তুমি জ্ঞানীদের (ভক্তদের) দর্শন দাও।
অজ্ঞানীদের (ভক্তিহীনদের) তুমি দর্শন দাও না।
তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে দীপ্তমান হও।
দীনদের উদ্ধারের জন্য তুমি অবতরণ করো।
বন্ধ জীবদের জন্য অসংখ্য অবতার গ্রহণ করেছ।
যারা তোমাকে স্মরণ করে, তাদের পাপ দূর করো
এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে রক্ষা করো।"

শ্রী ব্যাসতীর্থ

ব্যাসতীর্থ কর্ণাটকের বন্নূর গ্রামে ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে মল্লন্ন ও অক্কম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্ব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্য তীর্থের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল 'ব্যাসতীর্থ'।

চন্দ্রগিরির শাসক সালব নরসিংহ, মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীপাদরাজ তীর্থকে প্রার্থনা করেন যেন তিনি তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীপাদরাজ তীর্থ এই প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা শিষ্য ব্যাসতীর্থকে তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পাঠান। ব্যাসতীর্থ শ্রীপাদরাজ তীর্থের ইচ্ছানুযায়ী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করে বারো বছর ধরে স্বামীর সেবা করেন।

ব্যাস তীর্থ ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে এইভাবে স্তব করেছেন।: "ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির পবিত্র চরণদ্বয়ই আনন্দের আশ্রয়। সেই চরণগুলি সোনার পায়ের আলংকারে শোভিত। সেই চরণ সকলেই দর্শন করে পূজা করা উচিত।

"দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করে, তৃতীয় হাতে নিজের চরণ শরণ নিতে ইঙ্গিত করছেন। চতুর্থ হাতে আশীর্বাদ করছেন 'ভয় করো না।'

"মাণিক্যের মত দীপ্তিমান ভেঙ্কটেশ্বর স্বামির মস্তকে মুকুট, কপালে তিলক, কানে কুণ্ডল, গলায় শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ রত্ন, সোনার অলংকার ও রেশমের পীতাম্বর ধারণ করে আছেন। কোটি মনমথকেও মোহিত করে ফেলার মতো এমন এক মনোহর রূপধারী সেই স্বামিকে আমি ভজন করি।"

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু

ভগবান এই ভৌতিক জগতে প্রত্যেক যুগে অবতার নেন। কেউ তাঁকে অবতরণ করতে আদেশ করেন না। এই জগতে ক্লিষ্ট জীবদের প্রতি করুণা দেখানোর জন্য ভগবান অবতরণ করেন। পণ্ডিতরাও কখনো সন্দেহ করেন—ভগবান কিভাবে এই পৃথিবীতে অবতরণ করতে পারেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় স্পষ্টভাবে বলেন: "ধর্মের রক্ষা, সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টদের বিনাশের জন্য আমি প্রত্যেক যুগে অবতরণ করি।"ভগবানের অবতার সম্পর্কিত যেসব বিবরণ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল ব্যাখ্যাকে সমস্ত আচার্যগণ গ্রহণ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, এই কলিযুগে কিছু লোক নিজেদের "আমি ভগবান" বলে দাবি করছেন, যাতে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। যারা শাস্ত্রজ্ঞানে অজ্ঞ, তারা সেই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে প্রতারিত হচ্ছেন।

বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে: "ভগবানের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, ধনবান, খ্যাতিসম্পন্ন, সৌন্দর্যবান, জ্ঞানী কিংবা বৈরাগ্যশালী এমন কেউ নেই।" যারা নিজেদের ভগবান বলে দাবি করছেন, তাঁদের মধ্যে এই ছয়টি গুণ আছে কি নেই তা পরীক্ষা করা উচিত। এই গুণগুলি যদি না থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে একজন প্রতারক হিসাবে গণ্য করতে হবে। শাস্ত্রসম্মতভাবে যদি আমরা ভগবানের সত্য রূপকে উপলব্ধি না করি, তাহলে সেই মিথ্যাচারীর সঙ্গে আমরাও নরকে পতিত হবো।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভগবানরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তথাপি “আমি ভগবান” বলে দাবী করেননি। তিনি স্বয়ং ভগবান হলেও, তাঁর ভক্তিতে নিহিত আনন্দকে স্বয়ং অনুভব করার জন্য এবং সেই ভক্তিকে অপর ভক্তদের মাঝে বিতরণ করার জন্য একজন পরম ভক্তরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কারণেই তাঁকে ‘গুপ্ত অবতার’ বা ‘রহস্যময় অবতার’ বলা হয়, কারণ সাধারণত কেউ তাঁকে সহজে চিনতে পারে না।

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে সত্যযুগে ধ্যানযোগের মাধ্যমে, ত্রেতাযুগে বৃহৎ যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরযুগে ভগবানের মূর্তির উপাসনার মাধ্যমে যে ফল লাভ হয়, সেই একই ফল কলিযুগে কেবলমাত্র হরিনাম-সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে লাভ করা যায়।এই কলিযুগধর্মরূপ হরিনামসংকীর্তন “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে” এই মহান মন্ত্রসংকীর্তনের আন্দোলন শুরু করেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় আগত ভক্তবৃন্দ, সমগ্র ভারতে এই হরিনামসংকীর্তন আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এই একই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরায় আগত এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) প্রতিষ্ঠা করে, এই হরিনামসংকীর্তনের আন্দোলনকে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত করেন।

এই ভাবেই পুরাণগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয়ে বর্ণনা আছে:

গর্গ মুনি কৃষ্ণের নামকরণ করার সময় নন্দ মহারাজকে এইভাবে বলেছিলেন: "তোমার পুত্র প্রতি যুগে অবতার গ্রহণ করেন। প্রাচীন কালে তিনি কখনও সাদা, কখনও লাল, কখনও হলুদ, আবার কখনও সবুজ রঙে এখন কৃষ্ণ অবতরণ করেছেন।"(শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৮.১৩)

পৃথিবীর বিখ্যাত ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ, ভগবান নৃসিংহদেবকে স্তব করার সময় চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে এইভাবে বলেছিলেন:

"হে প্রভু! তুমি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মাছ, কাছিম ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে অবতার গ্রহণ করে সমস্ত জগতকে রক্ষা করছ এবং দানবদের ধ্বংস করছ। প্রভু! প্রতি যুগে তুমি ধর্মকে রক্ষা করছ। কিন্তু কলিযুগে তুমি নিজেকে ভগবান বলে প্রচার কর না, সেই কারণে তুমি 'ত্রিযুগী' (তিন যুগে প্রকাশিত) নামে পরিচিত হবে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭.৯.৩৮)

"কলিযুগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের গুণগান করেন। এই ভগবানের বর্ণ কৃষ্ণ নয়। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবানই, যিনি তাঁর ভক্তদের সহিত অবতীর্ণ হবেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.৫.৩২)

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নামগুলির অর্থ (মহাভারত – অনুশাসন পর্ব – বিষ্ণু সহস্রনাম):

সুবর্ণ রূপ – সোনা-সম, সবুজবর্ণধারী দেহবিশিষ্ট
হেমাংগ – সোনার মতো দীপ্তিমান ও সুন্দর শরীর
বরাংগ – শ্রেষ্ঠ শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমৃদ্ধ
সন্ন্যাসকৃষ্ণম – সন্ন্যাসতত্ত্ব পালনে আবদ্ধ
নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ – সকল জীবের প্রতি সমভাবে সম্মান দেখানো ও ভগবানের ভক্তিকে শিখানো
দেবতারা নারায়ণকে নিম্নরূপে স্তবস্ত করেন: "ওহো নারায়ণ! তুমি দীন-দরিদ্র জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে কলিযুগে স্বর্ণবর্ণে শচীদেবীর পুত্র-অবতারে অধিষ্ঠিত হয়েছো, নিজে ভক্তির সাধনা করছো এবং সেই ভক্তিকে সকলেরে শিখছো।" (ভবিষ্যোত্তর পুরাণ — প্রতিটি সর্গ ৪.৯.৩২)

পুরাণসমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নবদ্বীপে মায়াপুর গ্রামে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী নামক ব্রাহ্মণ দম্পতির ঘরে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মনাম ছিল "বিশ্বম্ভর"। তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেহ ত্যাগ করার পর তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন।

যেমনভাবে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনিকে আচার্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুও স্বয়ং ভগবান হয়েও লোকশিক্ষার জন্য মধ্বসম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে হরিনাম মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি চব্বিশ বছর বয়সে কেশব ভারতীর নিকট থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য”।

চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে বহু মায়াবাদীদের কৃষ্ণভক্তিতে রূপান্তরিত করেন। তিনি পুরীতে চব্বিশ বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর লীলাসমূহ 'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্য চরিতামৃত' এবং 'চৈতন্য মঙ্গল' নামক গ্রন্থসমূহে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীকে নিজের বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করে তীর্থযাত্রার জন্য যাত্রা করেন এবং বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের কুণ্ডগুলিতে স্নান করে, অর্চামূর্তিদের দর্শন করে, তিরুপতিতে কোদণ্ডরাম স্বামীর দর্শন করেন এবং তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনের পর শ্রীকালহস্তে গিয়ে সেখানকার কালহস্তীশ্বরেরও দর্শন করেন।

শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু

পাঁচ হাজার বছর আগে আদিশেষ বলরাম রূপে অবতরণ করেন। সেই বলরামই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলায়

একচক্রপুর নামক গ্রামে হদয় পণ্ডিত ও পদ্মাবতী দেবী নামক এক ব্রাহ্মণ দম্পতির ঘরে ১৪৭৩ সালে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু রূপে আবির্ভূত হন। পাণ্ডবরা এই একচক্রপুরে কয়েকদিন বাস করেছিলেন। সেই সময়েই ভীম বকাসুরকে বধ করেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মনাম ছিল ‘কুবের পণ্ডিত’। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সর্বদা রামায়ণ, ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয় করতেন। এই লীলা নিয়ত (সর্বদা) স্মরণ ও অভিনয় করার ফলে তিনি আনন্দে থাকতেন, এজন্যই তাঁর নাম রাখা হয় ‘নিত্যানন্দ’।

একজন সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রা করতে করতে একচক্রপুরের হদয় পণ্ডিতের বাড়িতে অতিথি হিসেবে আসেন। হদয় পণ্ডিত সেই সন্ন্যাসীকে যথাযথ অতিথি সেবা করেন। সেই সন্ন্যাসী ফিরে যাওয়ার সময় হদয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন, “আমার সঙ্গে তোমার পুত্রকে পাঠাতে পারো?” হদয় পণ্ডিত সন্ন্যাসীর কথাটি উপেক্ষা করতে না পেরে নিজের পুত্র নিত্যানন্দকে তাঁর সঙ্গে পাঠান। বারো বছর বয়সে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করে নিত্যানন্দ প্রভু বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করতে করতে পাণ্ডরীপুরে পৌঁছান। ঠিক সেই সময়েই মাধবেন্দ্র পুরী তীর্থযাত্রা করতে করতে সেখানে আসেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর নিত্যানন্দ প্রভু আরও তীর্থস্থান দর্শন করতে করতে ভেঙ্কটাচল পর্বতের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী দর্শন করেন।

পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধীন গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ করে কৃষ্ণভক্তির সাধনা করেন এবং কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রচার করতে থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা সমূহ চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থসমূহে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রী বল্লভাচার্য

বল্লভাচার্য ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার চম্পারণ্য নামক গ্রামে লক্ষ্মণ ভট্ট ও এল্লম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণ ভট্ট বল্লভাচার্যের জন্মের পর তাঁর স্বগ্রাম কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত 'কাঁকরাবাড়' গ্রামে ফিরে আসেন। বল্লভাচার্য যখন ১১ বছর বয়সের, তখন লক্ষ্মণ ভট্ট তাঁর স্ত্রী এল্লম্মা এবং বল্লভাচার্যকে নিয়ে তিরুমালার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনে যান। লক্ষ্মণ ভট্ট তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে সেখান থেকে ভগবদ্ধাম যান। বল্লভাচার্য তখন তাঁর মাতার সঙ্গে তিরুমালা থেকে স্বগ্রামে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে বল্লভাচার্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে করতে আবার তিরুমালায় আসেন এবং স্বামি পুষ্করিণীতে স্নান করে শ্রী বরাহ স্বামী ও শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন।

শ্রী বাদিরাজ তীর্থ

মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রী বাদিরাজ তীর্থ ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটকের উদুপি সংলগ্ন 'হূভিনেকেরে' গ্রামে গৌরী ও রামাচার্য নামক ব্রাহ্মণ দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগীশ তীর্থ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিরুমালায় দর্শনের সময় তিনি তিরুমালা পর্বতকে শালগ্রাম শিলারূপে অনুভব করেন এবং হাঁটু গেড়ে সেই পর্বত আরোহণ করে শ্রীনিবাসকে শালগ্রাম মালা অর্পণ করেন। শ্রীনিবাস দেবের প্রতি বহু কীর্তন রচনা করেন। সেই কীর্তনগুলির মধ্যে দুটি কীর্তনের ভাবার্থ এইরূপ:

"উজ্জ্বল ভেঙ্কট পর্বতের উপরে বিরাজমান শ্রীনিবাস সদা আমাকে রক্ষা করুন। সমস্ত দেবতা শ্রীনিবাসের সেবক। তিনি উচ্চ পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে ভক্তদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করছেন। দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করে, তৃতীয় হাতে নিজের পদ প্রদর্শন করছেন, চতুর্থ হাতে তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন 'যে আমার পদস্মরণ করে, তাকে আমি এই ভবসাগর পার করে দেব।'

"যিনি শেষনাগের উপরে শয়ন করেন সেই নারায়ণ এখন ভক্তদের রক্ষা করার জন্য শেষাচল পর্বতের উপরে দাঁড়িয়েছেন। রামাবতার কালে শ্রীলক্ষ্মণ (শেষের অবতার) এর সেবা গ্রহণ করেন, কৃষ্ণাবতারে বলরাম (শেষের আরেক অবতার) কে সম্মান প্রদান করেন। নারায়ণের ভক্তদের মধ্যে শেষ মহান। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ শ্রীনিবাসের সেবক। ভেঙ্কটগিরিনাথ হলেন সর্বকরণের মূল। তিনি সকল জীবের দুঃখ মোচনকারী। শ্রীনিবাসের সমতুল্য কেউ নেই। হে প্রভু শ্রীনিবাস! যেভাবে সেইদিন সভার মধ্যে দ্রৌপদীর প্রার্থনা শুনে আপনি রক্ষা করেছিলেন, আজ আমার প্রার্থনাও শুনে আমায় রক্ষা করুন।"

শ্রী পুরন্দর দাস

পুরন্দর দাস ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটকে বরদাপ্পা এবং রুক্মিণী নামক এক দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সন্তান না থাকায় তাঁরা তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে এক পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায় তাঁদের এক পুত্র সন্তান হয়। স্বামীর কৃপায় জন্মগ্রহণ করায় সেই পুত্রের নাম রাখা হয় 'শ্রীনিবাস' ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর নামে।

পুরন্দর দাস প্রায় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার কীর্তন রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় এক হাজার কীর্তন পাওয়া যায়। এই কীর্তনগুলির মধ্যে কিছু ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উপর লেখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে দুটি কীর্তনের ভাব এইরূপ:

"হে প্রভু! আপনি গরুড়ের উপর চড়ে দ্রুত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে আসেন। হে ভক্তবৎসল হরি! আমার সংসারজনিত ভয় ও বেদনা দূর করুন। আমি আপনার কৃপা ও দয়ার উপর নির্ভরশীল। হে সর্বশক্তিমান! আপনি এই সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক এবং লয়কারক। এই বিশ্বযাত্রার মূল কারণ আপনি এই সত্য অনুধাবন করা এবং আপনার অসীম, পবিত্র গুণাবলি নিয়ে গীত গাওয়া এক

অপূর্ব আনন্দ। আপনার সহস্রনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে যে আনন্দের অমৃত লাভ হয়, তাতে নিমজ্জিত দাসেরা সবকিছু ভুলে যান ও তাঁদের মন বৃথা বিষয়ে বিভ্রান্ত হয় না।”

“হে প্রভু! আপনি গরুড়বাহন, অসুরবিনাশকারী! হে কমলের মতো নয়নধারী! আপনি দুর্যোধনের সভায় গিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে বার্তা দিয়েছিলেন। হে করুণাময়! আপনার কৃপাভরা দৃষ্টিতে আমায় দেখুন ও রক্ষা করুন। হে শেশাদ্রি শিখরনিবাস! আপনি ভক্তদের রক্ষা করতে কখনো ব্যর্থ হন না। হে জগদীশ্বর! অনুগ্রহ করে আমাকে সৎপথে পরিচালিত করুন এবং এই ভয়ংকর অবস্থার থেকে মুক্ত করুন। আমাকে সংসার সাগর থেকে উদ্ধারের কৃপা করুন। ভেঙ্কটাচলস্থিত শ্রীনিবাস নিজ চৈতন্যানন্দ স্বরূপে শঙ্খ ও চক্রধারী অবস্থায়, পদ্মসম নয়নযুক্ত রূপে দর্শিত হন এবং নারদ, তুম্বুরু, ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার সংগীত ও স্তোত্র উপভোগ করেন।”

শ্রী হাথীরাম বাবাজী

‘হাথীরাম বাবাজী’ ছিলেন উত্তর ভারতের এক মহান ভক্ত, যিনি তীর্থযাত্রার অংশ হিসেবে তিরুমালায় আগমন করেন। 'ক্রীড়ল' নামক গ্রাম (যেটি দিল্লি শহর থেকে প্রায় ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) থেকে রামানন্দ মঠের অন্তর্গত নিজের গুরুজীর অনুমতিসহ তিনি যাত্রা শুরু করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে তিরুমালায় পৌঁছান। হাথীরাম বাবাজী শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতেন এবং পাশার খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। এই খেলায় স্বয়ং শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী হাথীরাম বাবাজীর সঙ্গে খেলতেন। সকলেই হাথীরাম বাবাজীকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর এক মহান ভক্ত বলে সম্মান করতেন। এই কথোপকথন অন্য কেউ শুনতে পেত নাশুধু বাবাজীর সঙ্গে স্বামীর কথাবার্তা চলত।

তবে কিছু লোক অভিযোগ করল, “হাথীরাম বাবাজী সকলের সম্মান পাওয়ার জন্য অভিনয় করছেন যে তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। পাশার খেলাও তিনি নিজেই খেলছেন, অথচ বলছেন

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সঙ্গে খেলছেন।" এই অভিযোগ তাঁরা চিত্তূর অঞ্চলের শাসক গিরিধর রাজার কাছে নিয়ে গেলেন।

গিরিধর রাজা হাথীরাম বাবাজীকে ডেকে এনে অভিযোগ সম্পর্কে জানিয়ে বললেন, "তুমি যদি সত্যিই ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ভক্ত হও, তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে। এই ঘরে যত খণ্ড আখ আছে, আগামী সকালের মধ্যে তা স্বামীর সাহায্যে খেয়ে শেষ করতে হবে। না হলে শাস্তি এড়াতে পারবে না।" এরপর রাজা সেই আখ-ভর্তি ঘরে হাথীরাম বাবাজীকে তালা মেরে রেখে দিলেন। সেই রাতে হাথীরাম বাবাজী প্রার্থনা করে বললেন, "স্বামী! আমি এত আখ খেতে পারব না। যদি না খেতে পারি তবে রাজা আমাকে শাস্তি দেবে। এতে রাজার পাপ হবে। আমি চাই না এমনটা হোক। লোকেরা যে দোষ আমার ওপর চাপিয়েছে তা মিথ্যা, তা আপনিই প্রমাণ করুন।" এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই রাতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী একটি হাতির রূপে এসে সমস্ত আখ খেয়ে নিয়ে গর্জন করলেন। সেই শব্দে হাথীরাম বাবাজী জেগে উঠে স্বামীর সেই হাতির রূপ দেখে স্তুতি করলেন।

যে সেবকরা ঘরের পাহারায় ছিল, তারা রাজা গিরিধরের কাছে গিয়ে জানাল, "যে ঘরে হাথীরাম বাবাজীকে আটকে রাখা হয়েছে, সেখানে একটি হাতি গর্জন করছে।" এই কথা শুনে রাজা নিজে এসে ঘরের দরজা খুলতেই, সেই হাতি সকলের সামনে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাথীরাম বাবাজী তখনও শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর স্তব করছিলেন। তখন গিরিধর রাজার উপলব্ধি হল যে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী স্বয়ং হাতির রূপ ধারণ করে এসেছিলেন এবং সেই আখ খেয়ে গেছেন।

গিরিধর রাজা হাথীরাম বাবাজীকে একজন বিশুদ্ধ ভক্ত হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। এরপর তিনি হাথীরাম বাবাজীকে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের একজন কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং নিজেও তাঁকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করলেন। পরে রাজা স্বয়ং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর অনেক সেবা করেন।

হাথীরাম বাবাজী প্রতিদিন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সুপ্রভাত সেবায় সদ্য দোহানো গরুর দুধ এবং মাখন নিবেদন করে আরতি প্রদান করতেন। আজও হাথীরাম বাবাজীর শিষ্যগণ তিরুমালায় হাথীরাম বাবাজী মঠ থেকে দুধ এবং মাখন সোনার থালায় নিয়ে এসে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সুপ্রভাত সেবায় অর্পণ করেন।মন্দিরের পুরোহিতরা সেই দুধ ও মাখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে নিবেদন করেন।

যখন মানুষ জানতে পারল যে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী স্বয়ং হাতির রূপে আবির্ভূত হয়ে হাথীরাম বাবাজীকে রক্ষা করেছেন, এবং রাজা গিরিধর স্বয়ং হাথীরাম বাবাজীর শিষ্য হয়েছেন তখন হাজার হাজার ভক্তগণ হাথীরাম বাবাজীকে দর্শন করতে আসতে লাগলেন। তাঁর মঠ, যা তিরুমালায় অবস্থিত, সেখানে ভক্তদের ভিড় ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায়, হাথীরাম বাবাজী "পাপনাশন" যাওয়ার পথে, গোগর্ভ তীর্থ এবং আকাশগঙ্গার মাঝখানে ভেণুগোপাল স্বামীর একটি মন্দির স্থাপন করলেন এবং সেখানেই ভেণুগোপাল স্বামীর সেবা শুরু করলেন। এই স্থানে হাথীরাম বাবাজী কেবলমাত্র 'রায়' গাছের পাতা খেতেন। আজও সেই গাছ সেখানে আছে। আমরাও সেই পাতাগুলি খেতে পারি। একটি দীপাবলির আগের দিন, হাথীরাম বাবাজী ভেণুগোপাল মন্দির প্রাঙ্গণেই জীব-সমাধিতে লীন হন।

প্রতি বছর, হাথীরাম বাবাজীর জীব-সমাধি দিবসে, তিরুমালায় অবস্থিত হাথীরাম বাবাজী মঠ থেকে লাড্ডু-গোপাল মূর্তি সমাধিস্থলে নিয়ে আসা হয়, সেখানে একটি উত্সব পালিত হয় এবং ভক্তিভরে পূজা হয়। প্রথমে তাঁকে শুধুমাত্র "বাবাজী" বলে সম্বোধন করা হত। কিন্তু যেহেতু ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী হাতির রূপে এসে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন,তাই তিনি পরিচিত হন "হাথীরাম বাবাজী" নামে।"হাথী" মানে হাতি, "রাম" মানে আনন্দদাতা। অতএব, হাথীরাম মানে সেই ব্যক্তি, যাঁকে ঈশ্বর হাতির রূপে এসে আনন্দে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

শ্রী কানকদাস

কানকদাস কর্ণাটকের কাগিনেলে নামক গ্রামে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন যখন তিনি ক্ষেত খুঁড়ছিলেন, তখন মাটির নিচে সোনার ধন লাভ করেন। সেই সোনা দিয়ে তিনি নিজ গ্রামেই একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং তাতে আদিকেশব মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরেই তিনি তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পুজারীতি অনুসরণ করে পূজা শুরু করেন। তিনি ছিলেন মহান সাধু ব্যাসরায়জীর শিষ্য।একসময় কানকদাস তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করার জন্য যাত্রা শুরু করেন।

তিনি যখন যাত্রা করছিলেন, তখন এক রাতে মন্দিরের পুরোহিতের স্বপ্নে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী আবির্ভূত হন। স্বামী বলেন "আমার এক প্রিয় ভক্ত কানকদাস আসছেন। তুমি পাহাড়ের নিচে গিয়ে তাঁকে তীর্থপ্রসাদ দিয়ে স্বাগত জানাও।" পরদিন সেই পুরোহিত তিরুমালা পাহাড় থেকে নিচে নেমে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক আগত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে লাগলেন "আপনিই কি কানকদাস?" ঠিক একইভাবে কানকদাসের কাছেও সেই প্রশ্ন করা হয়। তখন কানকদাস জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এভাবে সবাইকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?" পুরোহিত উত্তরে বলেন "গতরাতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী স্বপ্নে এসে বলেছেন, তাঁর ভক্ত কানকদাস আসবেন, তাঁকে তীর্থপ্রসাদ দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। তাই আমরা প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করছি।" এই কথায় কানকদাসের অন্তরে এক বিনীত ভাব আসে, তিনি বলেন "আমি সেই ব্যক্তি,
যিনি সম্মানের আশায় সামনের জনের পেছনে, আর পেছনের জনের সামনে হাঁটে।" এই কথা বলে তিনি চলে যান।

এরপর কানকদাস তিরুমালার বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে স্নান করেন। তিনি দর্শন করেন বরাহ স্বামী ও ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি পরম ভক্তিভরে প্রার্থনা করেন "হে শ্রীহরি! তুমি মুক্তিদাতা ও পরমাত্মা। আমি এক পাপী, এই মানবজন্মে জন্মানো এক ক্ষুদ্র কীটমাত্র। এই শরীর, এই জগতের সবই তোমারই সৃষ্টি। হে

ভেঙ্কটেশ্বর! তুমি এক স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। আমায় তোমার দাসের দাসের দাস করেএই জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করো।”

শ্রী রাঘবেন্দ্র স্বামী

রাঘবেন্দ্র স্বামী ১৫৯৫ সালে তামিলনাড়ুর ভূবনগিরি শহরে তিম্মান্নভট্ট ও গোপিকাম্বা নামক দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিম্মান্নভট্ট ও গোপিকাম্বার সন্তান না থাকায় তাঁরা তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কাছে সন্তান লাভের প্রার্থনা করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায় তাঁদের ঘরে ‘রাঘবেন্দ্র স্বামী’ জন্মগ্রহণ করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁরা তাঁদের পুত্রের নাম ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর নামে ‘ভেঙ্কটনাথ’ রাখেন।

এই ভেঙ্কটনাথ মধ্ব সাম্প্রদায়ের মধ্যে সুধীন্দ্র তীর্থের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম হয় ‘রাঘবেন্দ্র তীর্থ’। এই রাঘবেন্দ্র তীর্থকেই 'রাঘবেন্দ্র স্বামী' নামে খ্যাতি লাভ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানে স্নান ও মূর্তিদের দর্শন করেন। তিনি তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণদেবরায়

শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ালু ১৫০৯ সালে কর্ণাটকের হাম্পিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দু’বার তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ালু রত্নখচিত মুকুট, দুটি সোনার থালি, ২৫টি রুপোর থালি, সোনার অলঙ্কার, গবাদি পশু এবং অনেক গ্রাম দেন।

শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ালু

শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ালু ১৫০৯ সালে কর্ণাটকের হাম্পিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দু’বার তিরুমালায় গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন

করেন। শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ালু রত্নখচিত মুকুট, দুটি সোনার পালেরা, ২৫টি রুপোর পালেরা, সোনার অলঙ্কার, গবাদি পশু এবং কয়েকটি গ্রাম ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে দান হিসেবে প্রদান করেন।

ভক্ত শিরোমণি তারিগোণ্ডা ভেঙ্কমাম্বা

তিরুপতির থেকে আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ওয়ায়ালপাড়ু মন্ডলের তারিগোণ্ডা গ্রামে বাস করতেন মঙ্গম্মা ও কানালা কৃষ্ণাইয়া দম্পতি। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের কন্যা ভেঙ্কম্মার জন্ম হয়। পাঁচজন পুত্র সন্তানের পর কৃষ্ণাইয়া তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে তাঁর কাছে এক কন্যা সন্তান প্রার্থনা করেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর কৃপায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁর নাম রাখা হয় ভেঙ্কম্মা।

ভেঙ্কম্মা বাড়িতেই বড়দের কাছ থেকে ভাগবত, রামায়ণ এবং ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর লীলা শ্রবণ করতেন। ছোট বয়স থেকেই তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ধ্যান করতেন। তিনি কারো সাথে বেশি কথা বলতেন না। সেই কারণে অনেকে ভাবতেন তিনি ভূতের কবলে পড়েছেন। বারো বছর বয়সে ভেঙ্কম্মার বিয়ে হয় ভেঙ্কটাচলপতি নামক এক যুবকের সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর স্বামী মারা যান। ফলস্বরূপ ভেঙ্কম্মা নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

ভেঙ্কম্মা বাড়িতেই থেকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর ধ্যান করতেন। তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী সম্পর্কে কীর্তন রচনা করতেন এবং সেগুলি সুর করে গাইতেন। তাঁর এই ভক্তি দেখে সবাই তাঁকে ভক্তিভরে 'ভেঙ্কমাম্বা' বলে ডাকতেন। সেইভাবেই ভেঙ্কম্মা 'ভেঙ্কমাম্বা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ভেঙ্কমাম্বা প্রতিদিন তারিগোণ্ডা গ্রামের হনুমান মন্দিরে থাকা নরসিংহ স্বামীর পূজা করতেন। তিনি নরসিংহ স্বামীকে তুলসী ও ফুলের মালা অর্পণ করতেন এবং ধ্যান করতেন। হনুমান মন্দিরের পুরোহিত এই বিষয়টি সহ্য করতে পারতেন না। একদিন সেই

পুরোহিত ভেঙ্কমাম্বা ধ্যান করছিলেন, তখন ক্রোধে বলে উঠলেন, “তুমি কোন পুণ্যক্ষেত্রে চলে যেতে পারো না? সবসময় এখানে থেকেই আমাদের প্রাণ খেয়ে ফেলছো কেন?” এই বলে তিনি রেগে গিয়ে ভেঙ্কমাম্বার চুল ধরে টেনে বাইরে ফেলে দিলেন। ভেঙ্কমাম্বা ক্রোধে তাকাতেই, সেই পুরোহিত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেঙ্কমাম্বার পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন ভেঙ্কমাম্বা শান্ত হলেন। তিনি সেই পুরোহিতের কথা দেবতার ইচ্ছা বলে উপলব্ধি করে তিরুমলায় গিয়ে সেখানেই বাস করার সংকল্প নিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর।

তিরুমলায় পৌঁছেই ভেঙ্কমাম্বা, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করে, ধ্যান করে, কীর্তন গেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। ভেঙ্কমাম্বা তিরুমলায় বাস করার জন্য, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর আরাধক আত্মা রামদাসের মাধ্যমে একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করালেন। রামদাসই ব্যবস্থা করলেন যাতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর রান্নাঘর থেকে প্রয়োজনীয় রান্নার জিনিসপত্র ভেঙ্কমাম্বার কাছে পৌঁছে যায়।

ভেঙ্কমাম্বা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রতি ভক্তিভরে কীর্তন গাইতেন। ভেঙ্কমাম্বার ভক্তি দেখে, অন্নমাচার্যের বংশধরেরা তিরুমলা পাহাড়ের উপর তাঁদের ঘরের একটি কক্ষ ভেঙ্কমাম্বার থাকার জন্য দিয়ে দিলেন। ভেঙ্কমাম্বা তাতে সম্মত হলেন। তিনি সেই ঘরের পেছনে খালি জমিতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবার জন্য একটি তুলসী বাগান গড়ে তুললেন।

এই সময়েই ব্রিটিশ সরকার আক্কারাম দীক্ষিতকে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করে। আক্কারাম দীক্ষিতের বাড়ি ছিল ভেঙ্কমাম্বার গড়া তুলসী বাগানের পাশেই। ভক্তরা ভেঙ্কমাম্বাকে যে শ্রদ্ধা করতেন, সেই পরিমাণে নিজেকে কেউ সম্মান দিচ্ছে না বলে, আক্কারাম দীক্ষিত তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি প্রায়ই ভেঙ্কমাম্বার তুলসী বাগানে অপবিত্র পাতিলেবুর থালা ছুঁড়ে ফেলতেন। ভেঙ্কমাম্বা বহুবার নিষেধ করলেও, তিনি সেই

আচরণই চালিয়ে যেতেন। একদিন, ভেঙ্কমাম্বা তুলসী বাগানে ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন, আক্কারাম দীক্ষিত ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর উপর অপবিত্র থালা ছুঁড়ে দেন। তখন ভেঙ্কমাম্বা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন: "তুমি ও তোমার বংশের সকলে এই মুহূর্তে রক্ত কাশি দিয়ে মৃত্যু বরণ করবে।" সেই কথা উচ্চারণ করা মাত্রই আক্কারাম দীক্ষিত ও তাঁর পরিবারের সকলেই সেখানেই মারা যান।

এরপর ব্রিটিশ সরকার নতুন এক পুরোহিতকে নিযুক্ত করে। সেই নতুন পুরোহিতও ভেঙ্কমাম্বার প্রতি ঈর্ষাবশত আচরণ করতেন। একবার ব্রহ্মোৎসব চলাকালীন, সেই পুরোহিত ভেঙ্কমাম্বাকে দোষারোপ করেন। এতে ভেঙ্কমাম্বা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করে দেন। ব্রহ্মোৎসবের নবম দিনে, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর রথটি ভেঙ্কমাম্বার ঘরের সামনে এসে থেমে যায়। যত চেষ্টা করা হোক না কেন, রথ নড়লো না। নারকেল ফাটানো, কুমড়ো ছোঁড়া, লেবু কাটা – কিছুতেই রথ গড়ায় না। ভক্তরা বুঝলেন, নিশ্চয়ই কেউ ভেঙ্কমাম্বার প্রতি অপরাধ করেছে, তাই রথ থেমে গেছে। সবাই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি রথ চালু করতে সাহায্য করেন। ভেঙ্কমাম্বা রথের কাছে এসে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে প্রণাম করে আরতি দেন। এরপর রথটি আবার চলতে শুরু করে।

ভেঙ্কমাম্বার দর্শনে প্রতিদিন বহু ভক্ত আসতেন। এর ফলে তাঁর ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটত। তখন ভেঙ্কমাম্বা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রতি প্রার্থনা করে বললেন, "স্বামী! আমাকে তোমার ধামে নিয়ে চল।" ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বললেন, "তিরুমালার উপর থাকা তুম্বুরু তীর্থে একটি গুহা আছে। সেখানে গোপনে বাস করো। প্রতি রাতের সময় সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আমার মন্দিরে এসে আমাকে পূজা করো।" ভেঙ্কমাম্বা স্বামীর আদেশ মতো তুম্বুরু তীর্থের গুহায় বাস করতেন, আর প্রতিরাতে গোপনে মন্দিরে গিয়ে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর পূজা করতেন। এদিকে, মন্দিরের পুরোহিতেরা লক্ষ্য করেন, রাত্রিতে রাখা পূজার উপকরণ সকালবেলা জায়গায় থাকছে না। তাঁরা এই কথা মন্দির কর্তৃপক্ষকে জানান।

তখন মন্দির কর্মকর্তারা বলেন, “অনেকদিন হল ভেঙ্কমাম্বা দেখা দিচ্ছেন না। হয়তো তিনি কোথাও তিরুমালার মধ্যেই আছেন, এবং গোপনে এসে পূজা করছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।” একদিন, এক পুরোহিত রাতে মন্দিরে গোপনে লুকিয়ে থাকেন। তিনি দেখতে পান, ভেঙ্কমাম্বা স্বয়ং এসে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর সেবা করছেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সকালে অন্য পুরোহিতেরা এসে তাঁকে জাগিয়ে তোলেন, তখন তিনি যা দেখেছেন সব বর্ণনা করেন।

একদিন, এক ব্যক্তি গুরুতর কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ভাবলেন, ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন। কিন্তু তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। তখন তিনি আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে তুম্বুরু তীর্থে গেলেন। মৃত্যুর আগে তিনি গর্জন করে প্রার্থনা করলেন: “গোবিন্দ! ভেঙ্কটেশ! শ্রীনিবাস! বালাজি! আমাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করো স্বামী!” এই প্রার্থনা শুনে, গুহায় থাকা ভেঙ্কমাম্বা বেরিয়ে এসে তাঁর করুন অবস্থা দেখে বললেন, “তোমার কুষ্ঠরোগ সেরে যাবে। কিন্তু আমাকে এখানে দেখেছো – এটা কাউকে বলো না। যদি বলো, তবে তোমার মস্তক ফেটে যাবে এবং মৃত্যু হবে।” তিনি বললেন, “চোখ বন্ধ করো।”.যেই মাত্র তিনি চোখ বন্ধ করলেন, তিনি তিরুমালার স্বামী পুষ্করিণী থেকে নিজেকে বার হতে দেখলেন – সম্পূর্ণ নিরাময় অবস্থায়। কেউ জিজ্ঞেস করলেও, তিনি কিছুই বলেননি। তাঁর অলৌকিক নিরাময়ে সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে লাগল। কিছুদিন পর, একদিন তিনি অসাবধানতাবশত বলেন, “আমি তুম্বুরু তীর্থে ভেঙ্কমাম্বাকে দেখেছিলাম।” এই কথাটি বলার সাথে সাথেই তাঁর মস্তক ফেটে মৃত্যু হয়।

ভেঙ্কমাম্বা তুম্বুরু তীর্থে রয়েছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ায়, বিপুল সংখ্যক ভক্তরা সেখানে এসে তাঁকে দর্শন করতে লাগলেন। ভক্তদের ভীড় সামলাতে না পেরে ভেঙ্কমাম্বা আবার তিরুমলার মন্দিরের কাছে

ফিরে এলেন। কয়েকদিন পর তিনি ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রতি প্রার্থনা করে বললেন, "স্বামী! আমি ভক্তদের ভীড় সহ্য করতে পারছি না। আমাকে তোমার ধামে নিয়ে চল।" তখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী বললেন, "তুমি জীবসমাধিতে প্রবেশ করো।" তখন তিরুমলার বরাহ স্বামীর মন্দিরের পাশে, অন্নমাচার্যের বংশধরদের বাড়ির পেছনে থাকা তুলসী বাগানে এক সমাধি তৈরি করিয়ে, ভেঙ্কমাম্বা সেই জীবসমাধিতে প্রবেশ করেন। আজও সেই সমাধি দর্শন করা যায়।

শ্রী ত্যাগরাজু

শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত 'ত্যাগরাজু' ১৭৬৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার রামব্রহ্মম ও সীতাম্মা নামক দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। একবার ত্যাগরাজু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে করতে তিরুমালায় আসেন। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন নিতে গিয়ে মন্দিরের পুরোহিতরা পর্দা টানেন। ত্যাগরাজুর শিষ্যরা পুরোহিতদের অনুরোধ করেন যেন তারা পর্দা সরিয়ে দেন। কিন্তু পুরোহিতরা বলেন, "শাস্ত্র নিয়ম অনুযায়ী একবার টানা পর্দা আবার খোলা যায় না।"

তখন ত্যাগরাজু প্রার্থনা করেন "ওহ তিরুমলা ভেঙ্কটারমন! আমার মধ্যে থাকা অজ্ঞতার এই পর্দাটি সরিয়ে দাও, প্রভু! হে পরমপুরুষ! ধর্ম ও মোক্ষ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে এই অজ্ঞানতার পর্দাটি তুমি তা আমার হৃদয় থেকে সরিয়ে দাও।"

তিনি বলেন "এই অজ্ঞতা এমন, যেমন একটি ক্ষুধার্ত মাছ খাবারের লোভে ফাঁদে পড়ে মারা যায়, আমরা খেতে বসলে মাছি এসে বিরক্ত করে, হরি-ধ্যানে বসলে মন যায় নীচ প্রকৃতির লোকদের দিকে। যেমন বন্য পশুরা শিকারির ফাঁদ চিনতে না পেরে তাতে আটকে পড়ে ,আমিও তেমন অহংকার ও অজ্ঞতার ফাঁদে আটকে পড়েছি। ভেঙ্কটারমন! তুমি করুণা করে আমাকে কৃপা দৃষ্টি দাও, এই অহংকার ও অজ্ঞতার পর্দাটি সরিয়ে দাও, প্রভু!" এই কীর্তন গাইবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা আপনা থেকেই সরে যায়। তখন উপস্থিত সমস্ত

ভক্তেরা আনন্দের সঙ্গে ত্যাগরাজুর সঙ্গে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন লাভ করেন।

কৃষ্ণকৃপামূর্তি শ্রী শ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণকৃপামূর্তি শ্রী শ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় রজনী ও গৌর মোহন দে দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞ কেশব মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সংঘ (ইসকন) প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃতয়েধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈ: ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাত্ ॥

সত্যযুগে ধ্যানের মাধ্যমে বিষ্ণুর সাধনা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা পূজা, দ্বাপরযুগে পাদসেবা দ্বারা সেবা এই সব ফল এখন কলিযুগে কেবল "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র জপ করলেই লাভ করা যায়। (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২.৩.৫২)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

এই ষোড়শ-নামের মহামন্ত্র কলিযুগের সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করে। চারটি বেদ অনুসন্ধান করেও এর চেয়ে সহজতর উপায় আর দেখা যায় না। (কলিসন্তরণ উপনিষদ)

শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রের আলোকে এভাবে প্রচার করেছেন, “মানবজন্ম করা হয়েছে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য, মোড়লদের মতো নির্বিবাদ জীবনের জন্য নয়। ভক্তির মধ্যম দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে বুঝতে পারি।” বিশ্বজুড়ে ঘুরে তিনি এসব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রচার চালিয়ে ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪ সালে হায়দ্রাবাদ থেকে বিমানে তিরুমালায় যান। ‘তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম’ কর্তৃপক্ষ শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর অনুগামীদের সম্মানে স্বাগত জানান এবং তাদের থাকার সুবিধার্থে দুইটি কক্ষ বরাদ্দ করেন।

সেই সময়ে তিরুমালায় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনে প্রতিদিন প্রায় ১৫,০০০ জন ভক্ত আসতেন।
এই কারণে দর্শনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে সরাসরি দর্শনের সুযোগ দিলেন। দর্শনের অপেক্ষায় থাকা ভক্তেরা “গোবিন্দা গোবিন্দা” বলে ডাকছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যখন ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করলেন, তখন তিনি “গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহম ভজামি” এই কীর্তন গান করলেন।

পরে, ঘরে অবস্থানকালে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের বললেন, “সরকার বিরোধী প্রচার করলেও, কোটি কোটি মানুষ বলাজি দর্শনে আসছেন এটা সাধারণ মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রমাণ। অবশ্য লোকেরা তাঁদের পার্থিব দুঃখ লাঘব অথবা সম্পদের আশায় এসেছেন, তবুও তাঁরা সকলে ‘গোবিন্দ’ ঈশ্বরের এই মহাপবিত্র নামটি উচ্চারণ করছেন।” তিরুমালার আবাসনের ব্যবস্থা দেখে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বলেছিলেন “অদ্ভুত আবাস-সুবিধা প্রদান করে সোনার চূড়া দ্বারা আলোকিত যে ধরনের বালাজি (বেঙ্কটেশ্বর স্বামী) মন্দির আছে, সেরকম মন্দির আমাদেরও নির্মাণ করতে হবে।” শিষ্যরা শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন “বেঙ্কটেশ্বর স্বামীকে কেন বালাজি বলা হয়?” তখন শ্রীল প্রভুপাদ

বললেন “বালাজি মানে ছোট শিশু। এখানে যে বেঙ্কটেশ্বর স্বামী আছেন, তাঁকে কৃষ্ণভাবনায় ‘বালাজি’ বলা হয়।”

একদিন, তিরুপতি মন্দিরের এক কর্মকর্তা শ্রীল প্রভুপাদের সাথে দেখা করে বললেন, “প্রতি মাসে হুন্ডিতে চল্লিশ লক্ষ রুপি জমা পড়ে।” তখন প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করলেন, “এই টাকা কীভাবে ব্যয় হয়?” উত্তরে তিনি বললেন, “বেশিরভাগই ভবনের পুনর্নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।” তখন শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, “মন্দির পুনর্গঠন ভালো, কিন্তু কৃষ্ণের বাণী বিশ্বে প্রচার করা শ্রেষ্ঠ। বলাজি মানে কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বাণী ছড়াতে হবে। এই কৃষ্ণই চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে ভক্তি সাধনা করতে হয়। লন্ডনে প্রচার না থাকার কারণে অনেক গির্জা ধ্বংস হয়েছে। মন্দির নির্মাণ করতে হবে প্রচারের উদ্দেশ্যেই।” পাশেই থাকা এক পুরোহিত বললেন, “আমরা একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করছি যেখানে ‘পঞ্চোপাসনা’ (মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের নির্দেশিত পাঁচ দেবতার পূজা পদ্ধতি) চালু করব।”
এই কথা শুনে প্রভুপাদ বিস্ময়ে বললেন, “আপনাদের আচার্য রামানুজাচার্য তো কখনও পঞ্চোপাসনার প্রচলন করেননি!”

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তিরুমালায় অবস্থাকালীন দুই দিনেই প্রতিদিন তিন থেকে চারবার বলাজি দর্শনে যান। প্রত্যেকবার মন্দিরের পুরোহিতরা শ্রীল প্রভুপাদকে সরাসরি গর্ভগৃহের নিকটে নিয়ে গিয়ে বিকল্প কোনও নির্দিষ্ট সময়ে আটকে না রেখে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শনের সুযোগ করে দেন।

তিরুমালায় থেকে যাওয়ার প্রায় এক মাস পর শ্রীল প্রভুপাদ তৎকালীন তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমের আধিকারিককে একটি চিঠি প্রেরণ করেন:

সাম্প্রতিক দুই দিনের তিরুমালা সফরে আমার ও আমার শিষ্য এবং 'হরে কৃষ্ণ' আন্দোলনের সদস্যদের প্রতি আপনার প্রদত্ত আন্তরিক

আতিথেয়তার জন্য আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনি আমাদের বলাজি দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছেন তার প্রাপ্য আমরা অনন্তকাল ভুলব না। আমাদের আমেরিকা ও ইউরোপের শিষ্যগণ এ রকম দৃষ্টান্তমূলক আচরণ খুব কমই উপভোগ করেন, তারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও অনুপ্রাণিত। আবার সুযোগ পেলে আমরা আবার তিরুমালা এসে বলাজি দর্শন করব।

আমরা এই ট্রিপে আসা আমাদের সংঘের সদস্যদের জন্য একটি আলাদা কুটির নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করছি। যদি কেউ বিক্রয় বা দান হিসেবে কোনও জমি দিতে আগ্রহী হন, অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন। এ বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনা আমরা অভিলাষ করি। আপনার অমর্যাদিত আতিথেয়তার জন্য একবারে আবারও আমাদের কৃতজ্ঞতা।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী,
এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী।

জমি সংক্রান্ত বিষয়ে, পরবর্তী সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা যখন দেবস্থানমের আধিকারিকদের সাথে পরিচয় করান, ততক্ষণে দেবস্থানম 'আলিপিরি'তে একটি প্লট দান করে। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা সেখানে 'শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির' নির্মাণ করেন।

একবার শ্রীল প্রভুপাদ হায়দরাবাদে সাতজন মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তাদের বলেছিলেন:

মানবজন্মের উদ্দেশ্য হল যজ্ঞ অর্থাৎ কৃষ্ণ ভগবানকে উপলব্ধি করা। আপনাদের নিকটে তিরুমালায় বালাজি মন্দির আছে। বালাজির মন্দির বিপুল আয় করছে। এই আয় শুধুমাত্র বলাজির সন্তুষ্টির জন্যই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কোনও কাজে নয়। বহু মানুষ ভগবান জ্ঞানের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। তাই এই আয় ভগবানের জ্ঞান প্রচারের জন্য ব্যয় করতে হবে। মানুষ বালাজিকে

অনেক ধন দান করছেন। সেই ধন 'ভগবদ্গীতায়' বর্ণিত গূঢ় জ্ঞান বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে হবে। এই লক্ষ্যই ছিল 'শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর' উদ্দেশ্য।

চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন 'আমার আদেশে তোমরা সকলেই গুরু হয়ে অন্যদের শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রচার করো। এর মাধ্যমে প্রত্যেকে যেন ভগবদ্গীতা ও ভাগবত গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ করে। এইভাবে গুরু হয়ে সকলে মুক্তি লাভ করতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা ভগবদ্গীতা প্রচার করলে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি পাবে।' বালাজির ধন কেবল কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, অন্য কোনও পার্থিব স্বার্থে নয়। এই আমার নিবেদন।

শ্রীল প্রভুপাদ 'ভগবদ্গীতা' ১৩ অধ্যায় ১৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন: “মায়াবাদীরা ভাবে ঈশ্বরের কোন রূপ নেই। যদি ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় না থাকে, তবে তিনি নিরাকার হবেন। কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন ‘আমি সব কিছু শুনতে পারি, দেখতে পারি।’ অর্থাৎ তাঁর চোখ, কান, পা, হাত সব ইন্দ্রিয় রয়েছে। তবে ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের মত ভৌতিক নয়।

তিনি আমাদের মত বস্তুজগতের চোখে দেখা দেন না, তাই তিনি 'অর্চা রূপে' দেখা দেন। যিনি বলেন ‘এই মূর্তি তো পাথর’, বা ‘গুরু তো সাধারণ মানুষ’ তিনি শাস্ত্রমতে গাধার সমান। রামানুজাচার্য, মাধ্বাচার্যের মত মহান আচার্যগণ হাজার হাজার মন্দির স্থাপন করেছেন। আজও তিরুমালায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত বলাজির দর্শন করতে যান। এরা কি সবাই মূর্খ? তারা কি পাথর দেখতে যাচ্ছে? অর্চা রূপে থাকা ভগবানকে দেখতে হলে আমাদের প্রথমে ভক্ত হতে হবে। তখনই আমরা সেই 'পাথরে' ভগবানকে দর্শন করতে পারব।”

কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থের প্রকাশনা ও বিতরণের জন্য উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা প্রদানকারী আমার গুরুদেব, পরম পূজ্যপাদ শ্রী ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজকে
আমি হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ওয়ারাঙ্গলের ভক্ত নারায়ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ইসকন ভরুচ (গুজরাট)-এর ভক্তরা প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও সাহিত্য সরবরাহ করে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। মুদ্রণের জন্য সব্যসাচী প্রভু, অচ্যুত প্রভু, ভেণুগোপাল কৃষ্ণ প্রভু এবং পূর্ণব্রহ্ম প্রভু নানাভাবে ব্যবস্থা করেছেন। আমি পূর্ণব্রহ্ম প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি এই বইটি চৈতন্য পাবলিশিং হাউসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নরহরি নৃসিংহ প্রভু, বিষ্ণু স্বামী প্রভু, প্রভু কৃষ্ণ প্রভু, আদি কূর্ম প্রভু, বেদান্ত সূত্র প্রভু, সাকারি প্রভু, গোবিন্দ আনন্দ প্রভু, প্রেমানন্দ প্রভু, ভক্ত শিবপ্রসাদ, ভক্ত গণেশ, ভক্ত সন্তোষ এবং অন্যান্য ভক্তরা তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং যাচাইয়ে সাহায্য করেছেন। নিঃস্বার্থ ও ত্বরিত সহযোগিতার জন্য আমি এই সকল ভক্তদের প্রতি অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

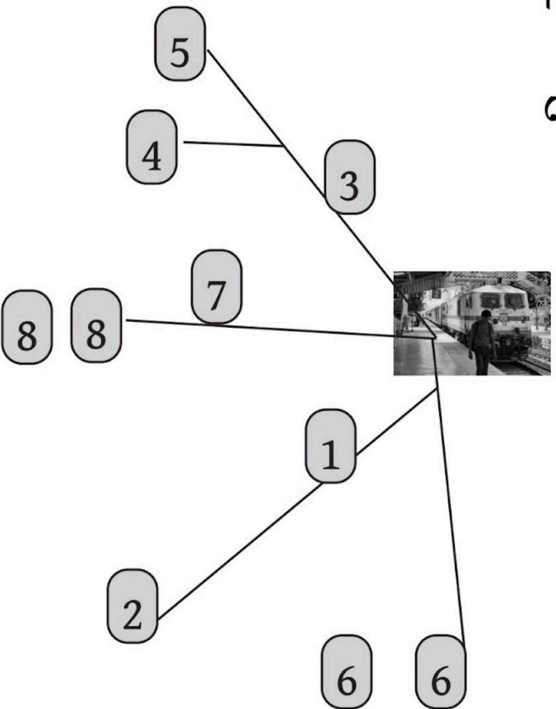
এই বইটি হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে সাহায্য করার জন্য বিশ্বামিত্র প্রভু, বিষ্বকসেন প্রভু, অনুপম প্রভু, কৈলাস চন্দ্র প্রভু, শ্বাসতকৃষ্ণ প্রভু, ভক্ত কৌশিক, ভক্ত ধবল ও ভক্ত সুদীপ্ত প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

লেখকের পরিচিতি

শ্রীনিবাস সেবানন্দ দাস ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিরুপতি ইসকন মন্দিরে এবং ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ভীমভারার ইসকন মন্দিরে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ২০১০ সালে পরম পূজ্যপাদ শ্রী ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তেলেঙ্গানা রাজ্যে "প্রত্যেক গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন" পদযাত্রায় ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন। উক্ত পদযাত্রা ২০২১ সালে তেলেঙ্গানা থেকে গুজরাটের ভরুচ ইসকন মন্দিরে পৌঁছায়। তিনি নিজেও পদযাত্রার সঙ্গে ভরুচে আগমন করে, বর্তমানে সেই পদযাত্রায় সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীনিবাস সেবানন্দ দাস
মোবাইল নম্বর: ৯৫৪২২০৯৫৯৩

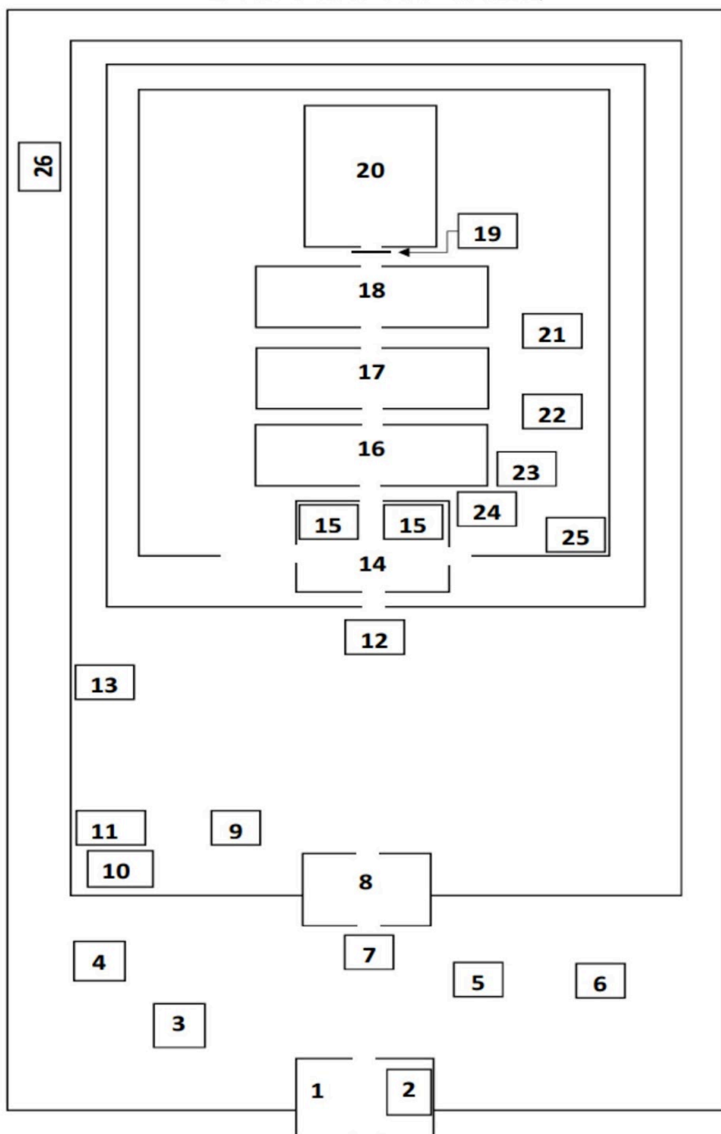
তিরুপতিতে প্রসিদ্ধ স্থানগুলির নির্দেশিকা চিত্র



রেলস্টেশন থেকে:

1. গোবিন্দ রাজা স্বামী মন্দির (¼ কিমি)
2. কোদন্ড রাম স্বামী মন্দির (1 কিমি)
3. কপিল তীর্থ (3 কিমি)
4. ইস্কন রাধা-গোবিন্দ মন্দির (4 কিমি)
5. অলিপিরিতে শ্রীভারি পাদ (ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর চরণের চিহ্ন) (4 কিমি)
6. পদ্মাবতী দেবীর মন্দির – পদ্ম সরোবর (6 কিমি)
7. শ্রীনিবাস মঙ্গাপুর (12 কিমি)
8. সুবর্ণ মুখারী (স্বর্ণমুখী) নদী ও অগস্ত্যেশ্বরালয় (14 কিমি)

ভগবান শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর টেম্পের বিশিষ্ট স্থানগুলির একটি নির্দেশিকা মানচিত্র

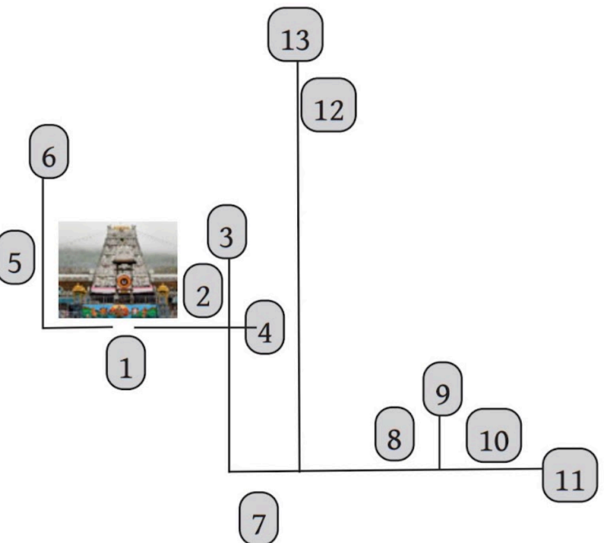


শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে দর্শনীয় স্থানের তালিকা

1. মুখ্য গোপুর
2. অনন্তাচার্য শাবল
3. শ্রীরঙ্গ মণ্ডপ
4. তিরুমলারায় মণ্ডপ
5. আয়নার মণ্ডপ (আদালা মন্ডপ)
6. ফুলবাবি (ফুলকূপ)
7. ধ্বজস্তম্ভ
8. রেন্ডব গোপুরম (দ্বিতীয় গোপুর)
9. বরদরাজ স্বামী মন্দির
10. রান্নাঘর (রসয়ে ঘর)
11. ফুলঘর (ফুলগদি)
12. গরুড় মন্দির
13. রান্নার কূপ (বন্টোবাবি)
14. ঘণ্টা মণ্ডপ
15. জয়–বিজয় দ্বারপাল
16. অভিষেক মণ্ডপ (স্নপন মন্ডল)
17. রামের মণ্ডপ (রামুল বারী মেড়া)
18. শয়ন মণ্ডপ
19. কুলশেখর পড়ি (দেহলি)
20. গর্ভগৃহ
21. সংকীর্তন ঘর (অন্নমাচার্য সংকীর্তন সংগ্রহ কক্ষ)
22. ভাষ্যকার (রামানুজাচার্যের মূর্তি)
23. বিশ্বক্ষেণ মন্দির
24. হুণ্ডি (দানপাত্র)
25. যোগ নরসিংহ স্বামী
26. কল্যাণ মণ্ডপ

তিরুমলা থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি চিত্র

ভগবান শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির থেকে:



1. গোল্লা মণ্ডপ
2. স্বামী পুষ্করণী
3. বরাহ স্বামী মন্দির (100 মিটার)
4. তরিগোণ্ডা ভেঙ্কটাম্বা বৃন্দাবন (সমাধি) (250 মিটার))
5. তিরুমলানম্বি মন্দির (বাড়ি) (100 মিটার)
6. অনন্তাচার্য বৃন্দাবন (সমাধি) (250 মিটার)
7. তরিগোণ্ডা ভেঙ্কটাম্বার পুষ্প উদ্যান– কুয়া (1 কিমি)
8. হাতীরাম বাবাজী বৃন্দাবন (সমাধি) (4 কিমি)
9. জাবালি তীর্থ (5 কিমি)
10. আকাশগঙ্গা তীর্থ (6 কিমি)
11. পাপনাশন তীর্থ (7 কিমি)
12. চক্র তীর্থ (4 কিমি)
13. শ্রীভারি পাদ (6 কিমি)